গল্পসংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমকাল প্রকাশনী
[illegible]/২৩, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু,
৮ ২ এ, গোয়াবাগান লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ ১৩৭১

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শংকর প্রেস,
৪১, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচী

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট গল্প-লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তাঁর গল্পসঙ্কলনের কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই। তবে পূর্বে-পঠিত অনেকগুলি গল্প আবার পড়বার সুযোগ পাওয়া গেল এবং আর একবার তাঁর ছোট গল্পের বিচিত্র রসসম্ভোগ করা গেল ; সেই আনন্দ পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করবার জন্যই এই ভূমিকা লেখবার পুলকিত তাগিদ অনুভব করেছি। সুতরাং যাঁরা শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে পূর্বপরিচিত তাঁরা আমার এ-সমস্ত কেজো কথা স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারেন ; আর যাঁরা তাঁর গল্প এখনো পড়েন নি (যদিও তা সম্ভব নয়), তাঁরাও এ ভূমিকা এড়িয়ে যেতে পারেন। কারণ রসসাহিত্য ভূমিকা-নিরপেক্ষ। মোদকের মিষ্টত্বের স্বাদ যেমন রসনায়, তেমনি রসসাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ণ হয় রসসম্ভোগে—সমালোচকের লেখনীচালনায় নয়।

শচীন্দ্রনাথ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ লিখে চলেছেন নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৯ সালে 'মানসী' পত্রিকায় তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পের ('বুভুক্ষা') প্রথম প্রকাশ ঘটে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ('এ জন্মের ইতিহাস') ১৯৪৪-৪৫ সালে রচিত হয়, 'বর্তমান' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা 'উত্তরাধিকার' নামে একখানি নাটকও এক সময়ে অভিনীত হয়ে সুনাম অর্জন করেছিল। ১৯৩৯ সাল থেকে শুরু করে এতাবৎকাল পর্যন্ত লেখা তাঁর গল্পগুলিই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় করেছে। আরও একটা সংবাদ উর্দু, হিন্দী ও ইংরেজীতেও তাঁর কয়েকটি গল্প অনূদিত হয়ে বাংলার বাইরেও তাঁকে পরিচায়িত করেছে। এই সঙ্কলনে ১৯৫৮ সালের মধ্যে লেখা তাঁর কয়েকটি নির্বাচিত গল্প প্রকাশিত হল ; প্রকাশক আশা করেন যে, এই সঙ্কলনের পরবর্তী খণ্ডে ১৯৫৮ সালের পরে লেখা তাঁর নির্বাচিত গল্প গৃহীত হবে। আমরাও তার প্রত্যাশায় রইলাম।

তাঁর গল্পগুলি একদা নবীন পাঠকদের চমক দিয়েছিল একাধিক

কারণে। গল্পগুলি প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে নানা পত্র-পত্রিকায় তার অকুণ্ঠ আলোচনা ও প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল! সমালোচকেরা লেখকের মৌলিক প্রতিভা বিশ্লেষণ করে তাঁকে একবাক্যে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁর গল্পের রসিক পাঠক সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তাঁর প্রতিভার অনন্য মৌলিকতা বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর কারণগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য সমালোচকের তুলাদণ্ডে ওজন করার ইচ্ছা নিয়ে এ-আলোচনায় নামা হচ্ছে না। আমি এই গল্পগুলি থেকে যে আনন্দ পেয়েছি, পাঠকও সেই আনন্দ ভোগ করুন—এইটুকু এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প একটা বিশেষ ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, যদিও এর বয়স এখনও একশ বছর হয় নি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও একালের ছোট গল্পের বিশেষ জনপ্রিয়তা দেখা গেছে, আঞ্চলিক ভাষায় এই শাখাটির উন্নতিও দৃষ্টিগোচর হবে। কিন্তু একটু Chauviristic হলেও একথা সগর্বে স্বীকার করতে হবে যে, বাংলা ছোট গল্পই বিদেশী ছোট গল্পের সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে। বাঙালীর ঋতুপ্রকৃতি ছোটর মধ্যেই বড়োকে সৃষ্টি করতে সক্ষম, সীমার বাঁধনে অসীমকে, বাঁধতেও পারে। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন এ-জাতির সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ দেখা গেছে। তাই মহাকাব্যের চেয়ে গীতিকাব্য, উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্প, বড়োমাপের পঞ্চাঙ্ক নাটকের চেয়ে একাঙ্ক নাটক এবং বিশাল কলেবর প্রবন্ধ-নিবন্ধের চেয়ে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ রম্যরচনায় বাঙালী লেখক ও পাঠক অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকেন। আবেগ প্রাধান্যই হোক, বা অন্য কোনো কারণেই হোক, বাংলা সাহিত্যে 'War and peace'-এর মতো বিশাল গ্রন্থের প্রাচুর্য নেই। মহাকাব্যোচিত দীর্ঘায়িত দেশ-কাল গীতিকবিতা ও ছোট গল্পের মধ্যেই সঙ্কুচিত হয়ে রসরূপ সৃষ্টি করে, তা একালের বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় খোঁজখবর করলেই জানা যাবে।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বাংলা গল্প লিখে চলেছেন এবং বলাই বাহুল্য, এই শাখায় তাঁর প্রতিভা

একটা বিশেষ খাত খনন করে চলেছে। ছোট গল্পের রূপ-রীতি ধরে বিচার করলে তাঁর গল্পগুলিকে ঠিক মাপের শিল্পবস্তু বলে মনে হবে। অবশ্য একালের ছোট গল্পের প্রকৃতি ও আকৃতির কোনো স্থায়ী ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কোথাও আখ্যান, কোথাও চরিত্র, কোথাও সঙ্কেত, কোথাও নাটকীয়তা, কোথাও গীতিরসের অশরীরী মূর্চ্ছনা, কোথাও-বা কিছুই নয়—শুধু লেখকের এক-মুহূর্তের মানসিক প্রচ্ছায়া যা সদ্যঃপাতী বুদবুদের মতো অস্তি-নাস্তির দোলায় আন্দোলিত। সেদিন থেকে শচীন্দ্রনাথের গল্পগুলি কেবলমাত্র চৈতন্য প্রবাহের অবচেতন ছায়াভাসে পরিণত হয়নি। তার মধ্যে একটা কাহিনী ও চরিত্র আছে, এবং চরিত্রগুলিই প্রধান হয়েছে কাহিনীর ঘনবিন্যস্ত বুননে, নানা বিচিত্র পটভূমিকা ও পরিবেশে। অনেক গল্পের প্রবক্তা স্বয়ং চরিত্র, তার অভিজ্ঞতা দিয়েই আমরা তার জীবনকে জানতে পারি। লোকগুলি রহস্যময় ও দুজ্ঞেয় বলে মনে হলেও, তারা আমাদের প্রবাসী আত্মীয়-জনের মতোই পরিচয়-অপরিচয়ের মধ্য দিয়েই কাছে আসে। তাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার জন্য যে বিচিত্র পরিবেশের দরকার, সৌভাগ্যক্রমে লেখক বৃত্তি ও জীবিকার তাড়নায় সে জীবনের বন্য স্বাদ কিছু কিছু পেয়েছেন। ফলে গল্পগুলিতে অরণ্য, সমুদ্র, দ্বীপ, বন্দর, জাহাজ মাঝিমাল্লা—তাদের বিচিত্র জীবন ও জীবিকার পটে অতিশয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জোসেফ কনর্যাড্ যেমন সমুদ্র-নাবিকের জীবন-যাপন করে লবণাম্বুধির সঙ্গে মানুষের বিষণ্ণ-মধুর সম্পর্ক ফুটিয়েছেন, সে বৃদ্ধ নাবিক, মার্লো যার নাম, তার মুখ দিয়ে, তার দৃষ্টি দিয়ে সমুদ্র-জীবনের বিভীষিকা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন, শচীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর গল্পে ('মাটি') নাবিকজীবনের মর্মন্তুদ ঘটনার দুঃখ-বেদনা-অনুতাপ সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্রে, অরণ্যে, দ্বীপে কত মানুষ কত অদ্ভুত জীবন-যাপন করে, জীবিকার সন্ধানে বিচিত্র কর্মে নিযুক্ত থাকে ; তাদের জীবনে কত সুখ-দুঃখ-স্বপ্ন, কত নির্মমতা-বর্বরতা-পাশবপ্রবৃত্তির বল্গা-হীন প্রকাশ ঘটে, তারই অদ্ভুত রহস্য তাঁর গল্পে নানা ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলে তাঁর চরিত্রগুলি শুধু বলিষ্ঠ জীবধর্মী প্রাণীমাত্র নয়, তাদের সমস্ত আচরণের অন্তরালে দুঃখ বেদনার যে

অভিঘাত চলেছে, তার দ্বারাই তারা আমাদের সহানুভূতির পাত্র হয়ে উঠেছে। বাংলা গল্পের পটভূমিকা সম্প্রসারণে শচীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবে। ড্রয়িংরুমের সীমাবদ্ধতা ও পল্লীবাংলার রোমান্টিক পরিবেশ থেকে উদ্ধার করে বাংলা গল্পকে তিনি বিষুব-রৈখিক অঞ্চলে, ট্রপিক অরণ্য-কান্তারে, অমিষগন্ধেভরা সাত সাগরের তীরে তীরে, কখনও বন্দরে, কখনও মধ্যসমুদ্রে, কখনও দ্বীপে দ্বীপান্তরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। সেখানে জীবন বিষাক্ত। হিংসা-প্রতিহিংসা, লোভ ও কাম মানুষের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। মনে হয়, এরা যেন দেহধারী একপাল অরণ্যচর জন্তু মাত্র। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, এরা তারও অতিরিক্ত। সহসা কোনো একটি মানসিক আঘাতে, অপ্রাপ্তির বেদনায়, নৈরাশ্যের পীড়নে এদের বর্বর দেহে-মনে মানবিক বোধ আবার ফিরে আসে। অবশ্য লেখক শুধু প্রাগৈতিহাসিক চরিত্র নয়, আধুনিক নর-নারীর চরিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তাদের জীবনেও সেই চিরকালীন সমস্যা বড়ো হয়ে উঠেছে। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তির সেতুরচনা সম্ভব হল না বলে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের তৈরি জালের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল। জীবনের এই বিষণ্ণতা, অবক্ষয় ও নির্বেদ তাঁর এই ধরণের গল্পগুলির উপরে একটা কন্দন সান্ত্বনাহীন মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। বস্তুতঃ বাংলা গল্পের পালাবদলের ইতিহাসে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হবে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। গল্পগুলির রস এখন পাঠকেরাই উপভোগ করুন, অধিক ব্যাখ্যার তরল জল মিশিয়ে তাঁদের উপলব্ধির গাঢ়তা দূর করতে চাই না।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরী

বিষ নেই, তবু কুলোপানা 'চক্কর' তুলে ফোঁস ফোঁস করে। কখনো বা নিরীহ কেন্নোর মত সুরসুর করে টেশনে এসে থামে, তারপর ধড়টা টেশনেই রেখে মুণ্ডুটা এগিয়ে আসে পাখা ফেলবার দোতলা গুমটিটার কাছে। হাঁই হাঁই ক'রে গোগ্রাসে যেন জল খায় পেট ভ'রে। আর জল যখন খায়, তখন আর কেন্নো থাকে না, তখন ওকে মনে হয়, যেন বিষহীন একটা সাপের মাথা চক্কর তুলে ফোঁস ফোঁস করছে।

পাখা ফেলবার দোতলা গুমটির ঠিক সামনে একটা শ-চার ফুট উঁচু পাহাড়। একটা কেন? টেশন ছাড়িয়ে বিপরীত দিকে যদি বেশ খানিকটা হেঁটে যাওয়া যায় হাট-ফেরৎ মুণ্ডাদের পিছন-পিছন, তাহলে দেখা যাবে, পাশাপাশি দুটো পাহাড়। মা বসুমতীর নিটোল দুটি বুক-এর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এরই একটি পাহাড়, যেটি পাখা-ফেলার গুমটির মুখোমুখি, সেটির ঠিক নিচেই গাছপালা-ঘেরা বড়ো একটি কুয়ো আছে, কুয়োর বেড় পর্যন্ত সান বাঁধানো এবং বেশ চওড়া। সেই চওড়া গোলাকার বেদীর ওপর বসে দাঁড়িয়ে পাড়ার বউ-ঝিরা চান করে। কুয়োতলার কাছ ঘেঁষেই গায়ে গায়ে লাগা সার-দেওয়া মাথা-নিচু মাটির ঘর, কুয়োর দিকে কোনো জানালা-দরজা নেই, মাটির নিরেট দেওয়াল শোভা পাচ্ছে।

কুয়োতলার যেদিকে ঘরগুলো, তার বিপরীত দিকে পাহাড়টা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, অর্ধেক তাদের দিকে, আর অর্ধেক গুমটির দিকে। পাহাড়ের একটা বড়ো অংশ একেবারে নেড়া,—প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই যেন ঘাস-লতা-পাতার শাসন-মুক্ত হয়ে একচোখে দেখছে গুমটিটাকে, আরেক চোখে তাকিয়ে আছে তাদের ঘর ঘেঁষা কুয়োতলার দিকে।

সকাল দুপুর বিকেল,—এই তিনবেলা যেন নিয়তির মতো ওদের ডাকতো কুয়োতলাটা। সব বউ-ঝিদেরই ডাকতো, কিন্তু সোনা বৌ আর তার ঠাকুরঝির বুকে বুঝি রক্ত তোলপাড় ক'রে তুলতো সেই ডাক।

ওরা দুজনে এমন একটা সময় বেছে নিতো, যখন কুয়োতলাটা থাকতো নির্জন, ওরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। সকাল বিকেল সেটি হবার জো নেই,

তখন ভীড় বেশি। দুপুরে ওরা একটু দেরি ক'রে যেতো বলে সুযোগের অভাব হয়নি কোনোদিন।

একদিকে একটা বকফুলের গাছ, অন্যদিকে জাম গাছ, মাঝখানে কয়েকটি কলাগাছের জটলা। এর মধ্যে বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে মনের আনন্দে ঘটি-ঘটি জল ঢেলে চান করলে চোখ চেয়ে দেখছেই বা কে ?

লক্ষ্মীর তবু বুক ধড়ফড়ানি যায় না। সোনা বউয়ের উদ্দেশে বলে—অ বউদি, আসমানে লোক দেখা যায় যে !

সোনা বউ ভিজে পড়ন্ত আঁচলটা বুকের কাছে টেনে দিতে-দিতে সেই হুমড়ি খাওয়া ন্যাড়া পাহাডটার দিকে তাকায়, তারপর একটু হেসে জল ভর্তি বালতি থেকে ঘটি-ঘটি জল ঢালতে থাকে গায়ে মাথায়।

লক্ষ্মী বলে,—অ বউদি, আশমানে কাপড় শুকায়, দেখছ না কেনে ?

ওরা ন্যাড়া পাহাড়টাকে নিয়ে যখন এই ধরনের কথা তোলে, তখন পাহাড় বলে না, বলে,—আশমান। চান করার পর আশমানে উঠে ভিজে কাপড় শুকোতে দেয় অনেক সময় মরদগুলান, এমন কি, মাঝে মাঝে বিটিছাওয়া বা মেয়েরাও উঠে যায় শাড়ি মেলে শুকোতে দিতে।

ঠাকুরঝির কথার উত্তরে সোনাবউ মুচকি মুচকি হাসে, বলে,—মরদের সাদা ধুতি শুকোচ্ছে গো ঠাকুরঝি।

—তবে !

সোনাবউয়ের হাসি আরো বেড়ে যায়, বলে—আমি কি চোখের মাথা খেয়ে ফেলাঞিছি ? তুয়ার দাদা।

—অয়, মা !—বলে লজ্জায় জিভ কাটে লক্ষ্মী।

সোনাবউ মাথায় আরেক ঘটি জল ঢেলে বলে—আশমানে নাই বটে, নিচে নামছেক।

লক্ষ্মী একটু বুঝি আশ্বস্ত হয়, তারপরে, দড়ি-বাঁধা বড়ো বালতিটা কপিকলের মধ্য দিয়ে ঘর্ঘর করে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দিতে থাকে।

সোনাবউ বড়ো বড়ো দুটো বালতি নিয়ে এসেছিল চান করবার জন্য। সেই দুটি বালতির জল ঘটি ঢেলে ঢেলে চান করে শেষ করেছে।

এবারে বালতি দুটি ভর্তি করার পালা লক্ষ্মীর। সোনাবউ মাথার চুলের গোছায় গামছাটা পাকিয়ে নেয় ভালো করে, তারপরে মোচড় দিয়ে দিয়ে জল নিংড়ে দিতে দিতে আড়চোখে লক্ষ্মীর দিকে তাকায়, কী মনে করে হঠাৎ বলে ওঠে—কীলো, আমার মত বাঁজা হবি নি তো ?

দুরন্ত লজ্জায় লক্ষ্মীর শ্যামল মুখখানা আরক্ত হয়ে যায়, কান দুটো গরম হয়ে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে চাপা ত্রস্ত গলায় বলে—অসভ্যটা !

—অসভ্যটা কী হলাম!—সোনাবউ বলে, কুঁড়ি ছুটো ত ফোটো ফোটো হঞ্ছিছে, ইবার ভোমরা আসবেক নাই? বিহা হবেক নাই?

লক্ষ্মী অস্ফুটকণ্ঠে বলে,—হোক ত বিহা।

খিলখিল করে হেসে উঠলো সোনাবউ, বললো,—বিহা হবেক গো, বুকের সাধ যখন ফুল হয়ে ফুইট্যাছে।

লক্ষ্মী রাগ করে বলে ওঠে—ই দেখ বউদি, ভালো হইছে নাই।

বলতে বলতে হঠাৎ আশমান-এর দিকে চোখ পড়ে যায় লক্ষ্মীর। কী যেন নিবিষ্ট মনে দেখতে থাকে।

সোনাবউ চুল মোছা শেষ করে এবার গায়ে হাতে গামছা বুলোতে শুরু করে। বলে,—কী লো ঠাকুরঝি?

জল তোলা মাঝপথেই ফেলে রেঁখে ওর কাছে সরে আসে লক্ষ্মী, বলে,—অ বউদি, হাই দেখ, সুন্দরী যাইছে।

ওর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে আশমানের দিকে তাকায় সোনাবউ, তারপর বলে,—হাঁ. সুন্দরীইত বটেক। মুখপুড়ীর তোরে ভালো লাইগছে। তুই কুয়োতলায় আ.সিছিস, উটিই বা ইখন আসবেক নাই কেনে? নে, দুই সখীতে কথা ক, আমি চললাম, তুয়ার দাদা খুঁজবেক।

সেইসব সোনার দিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে যায় লক্ষ্মীর। বয়ঃসন্ধিকালের সেইসব অকারণে ভয় ভয় করা দিনগুলোর কথা। ষ্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়ালে ঘন গাছপালার আড়াল থেকে দেখা যেতো না, কিন্তু এঞ্জিনটা ধড় ছেড়ে বেরিয়ে এসে দোতলায় গুমটির কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁই হাঁই করে জল খেতো আর সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতো। ইঞ্জিনটা চোখে পড়তো, আর চোখে পড়তো গুমটি ঘরের দোতলায় একখানা মুখ। সে নিজে কুলোপানা চক্করের ফোঁস-ফোঁসানি দেখতে কখন যে পায়ে পায়ে বালি বিছানো সরু পথটা ধরে এগিয়ে এসেছে তার খেয়ালই নেই। সামনে দাঁড়াস সাপের মতো রেল লাইনগুলো পড়ে আছে। ওপারে গুমটি আর এঞ্জিন, আর সেই লোকটা!

তাড়াতাড়ি গায়ের ওপর কাপড়টা ভাল করে টেনে টুনে দিয়ে লক্ষ্মী দে ছুট। আকাশ ভেঙে ঢল নামলে এ পথে কেউ চলতে পারে না। তাদের ঐ আশমানটা হয়ে দাঁড়ায় তখন শিবঠাকুরের মতো, মাথায় মেয়েরা জল ঢালছে ত ঢালছেই, আর মসৃণ পাথরের গা বেয়ে জল নেমে আসছে উথালপাথাল তোড় নিয়ে,—যেটা এখন বালিপথ, সেটা হয়ে দাঁড়াবে বেগবতী নদী বিশেষ।

বউদির ঠাট্টার অন্ত থাকতো না এই নদী নিয়েও। বলতো,—নদী নয় গো যৈবন। ঠাকুরঝির ঢল নামা যৈবন নদীর রূপ নিয়ে গুমটির দিকে

ছুট্যাছে, কলঙ্কের বাঁধ রেলের বাঁধ হইয়ে সামনে না দাঁড়ালে বুকে গিয়ে লুটাই পড়তো!

—এই বৌদি, ভালো হইছে নাই! —লক্ষ্মী অমনি কাছ থেকে ছুটে পালাতো!

সেই সব দিনের একটি দিনের কথা বুঝি ঐ ন্যাড়া পাহাড়টার গায়ে চিরকালের জন্য খোদাই হয়ে আছে। হঠাৎ ঢল নামা হু হু হাওয়া ঘেরা মন কেমন করা এক বাদলার দিনে কুয়োতলায় একা একা জল আনতে গেছে লক্ষ্মী শুধু জল আনা নয়, চান করাও উদ্দেশ্য। টুপ করে চানটাও সেরে নেবে, আর অমনি এক কলসী জলও ভরে আনবে। দড়ি নামিয়ে প্রথম বালতিটা সবে উঠিয়েছে, এমন সময়, অবাক কাণ্ড, কলবল করা জলের তোড় পেরিয়ে কে একটি লোক এগিয়ে আসছে। এক পা তুলে আরেক পা ফেলছে, ছাইরঙের প্যান্টটা গুটিয়ে গুটিয়ে তুলে দিয়েছে ফরসা রোমশ দুটি হাঁটুর ওপর। হাঁটুর চাকি দুটি ভেঙে ফেলতে না পেরে নিস্ফল নাগিনীর মতো জলের সোঁতা মুখ লুকিয়ে রেলের বাঁধে এসে ছলাৎ ছলাৎ করে পড়ছে। লক্ষ্মী জাম গাছের ডাল পালার আড়াল দিয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলো,—কী সব্বনেশে লোক বটে গো! ঠিক পা ফেলে ফেলে নাগিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ন্যাড়া পাহাড়ের নিচের চ্যাঙাড়ে উঠে এলো! শিবঠাকুরের মাথা ধুইয়ে তখন বলক বলক করে জল উবছে পড়ছে। লোকটার গায়ের পিরেনটা চওড়া বুকের সঙ্গে সেঁটে বসে গেছে। মাথার লম্বা চুলগুলো ভিজে টইটম্বুর হয়ে কপাল ঢেকে চোখের উপর পড়েছে। লোকটা হাত দিয়ে দিয়ে চুলের গোছা সরাচ্ছে, আর জল চোয়ানো ভিজে পাথরে পা রেখে রেখে পাহাড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে!

অয় মাগো! কী ডাকাবুকো লোক গো! মাথায় আকাশ ভেঙে জল ঝরছে, একটা ছাতাও সঙ্গে নেই, মিছিমিছি পাহাড়ে উঠবার ক্ষ্যাপানী কেন বাপু! লোকটি চুড়ায় উঠলো না, যেখানে তারা কাপড় শুকুতে দেয়, তার খানিকটা ওপরে একটা খাঁজ মতন আছে, মাথায় অ আ লেখবার সেলেটের মতো একটা চটালো পাথর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—সেখানে এসে চুপ করে বসলো।

হাঁই দেখ—কী হবে! কুয়োতলায় জনটি নেই প্রাণীটি নেই, আছে শুধু বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া শাড়ী-লেপটানো লক্ষ্মীর শরীলটা। সেই শরীল, বউদি যাকে বলতো কুঁড়ি ফোটো ফোটো অবস্থা! গায়ে জামা নেই কোমরে সায়া নেই, শুধু ভিজে শাড়ীটা আগাগোড়া জড়ানো। কিন্তু হায় গো হায়, কুমারী মেয়ের এতেই কি সরম যায়? ভয় আর লজ্জা যেন সারা অঙ্গ বেষ্টন করে ধরে।

কী করবে লক্ষ্মী, ছুটে পালিয়ে যাবে? কী মুশকিল, আশমানের ঐখান থেকে যে কুয়োতলার সবটুকুই দেখা যায়।

ঠিক এই সময় লোকটা মুখ তুললো, দিশাহারার মতো তাকাতে লাগলো কুয়োতলার দিকে। লক্ষ্মী যে জামগাছের আড়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে সে অত সহজে দেখবে কেমন করে? লক্ষ্মী বরং বুক ধড়ফানিটা কমলে পর গাছের চটালো গুঁড়ির পাশ থেকে দেখতে চেষ্টা করতে লাগলো লোকটাকে। হাঁই দেখ—লোকটা কে? এ যে সেই মানুষটা! সেই যে গুমটির দোতলা থেকে মুখ বার করে তার দিকে রাক্ষসের মতো তাকিয়ে থাকতো!

মাগো! উপঝরণ বৃষ্টিরও দেখি শেষ নেই! চান করবার আর বাকি রইলো কী! এখন কলসীটা নিয়ে ঘরে ফিরলেই ত চলে। তবু লক্ষ্মীর যে সেদিন কী মরণদশা ধরলো, বাদলী দিনের নেশা সারা শরীরটাকে রিমঝিম রিমঝিম করে বাজিয়ে তুললো। নিজের অজান্তেই বুঝি একপা একপা করে বেরিয়ে পডলো জামগাছেব আড়াল থেকে।

লোকটা এবাব দেখতে পেলে, চোখে চোখ পডে যেতে একটু বুঝি হাসলো। তাবপবে, ও মাগো, কী কুলনাশা মানুষ গো, সড়াৎ করে আসমান থেকে পবি কি মরি করে বেডার ধারে নেমে এলো। ওর কাণ্ড দেখে লক্ষ্মী আঁতকে ওঠে আর কী! লোকটা পা হড়কে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল, এবার উঠে দাঁডালো। শিবঠাকুরের নাওরা কী এখনো শেষ হলো না? আকাশ ভেঙে জল ঝরছে না ত, যেন কালো মেঘের কাজল মুছে চোখের জল উবঝে পড়ছে!

কিন্তু লোকটার হলো কী গো! কপাল কেটে গিয়ে যে রক্ত পড়ছে! মুখে তবু হাসির ঝিলিক, বৃষ্টির জল মুছে ফেলার মতো কপাল থেকে রক্ত মুছে ফেলছে হাত দিয়ে। বাঁ-কনুইটাতে ব্যথা পেয়েছে বুঝি, বাঁহাত বাঁকিয়ে কোমরের সামনে ধরা, সোজা নামাতে পারছে না। কী মানুষ গো! হাত ভেঙে কপাল কেটে—বৃষ্টিতে কইমাছের মতো টইটম্বুর হয়ে—খাণ্ডারণী জলের সোঁতা পেরিয়ে তবু আসতে হয়? পুরুষের যৈবন জ্বালা এমনি ধারা নাকি গো?

লোকটা বলে, গুমটি থেকে রোজ দেখি। রোজ কেন, অনন্তকাল ধরে দেখি। গত জনমেও দেখেছিলাম, এ জন্মেও দেখি। বিদেশী মানুষ বলে মুখ ফিরিও না। খোঁজখবর নিয়েই জেনেছি, বেজাতের মানুষ নই গো তোমাদের। দামোদরের নাম শুনেছো? আমি সেই দামোদরের তীরের নেতুরের লোক। তোমাদের এই ঝালদায় আছি কয়েকবছর। চিনবে কী

করে ? চেনার চেষ্টা না করলে চেনা যায় ? সাঁঝের পিদীম জ্বললে পর গুমটি ঘরে চলে এসো, একাই থাকবো। শিবঠাকুরের নদী ? এ দিগের নদীর জল কতক্ষণ থাকে ? হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। জল শুকোলেই এসো, ভিজে বালির ওপর লক্ষ্মীপুজোর দিনের মতো লক্ষ্মী পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে।

ডাকাবুকো মানুষটি আবার সেই রাক্ষুসী সোঁতার জল পেরিয়ে রেললাইনে উঠে গেল। ওকে আর দেখা গেল না, কিন্তু লক্ষ্মীর বুকে একী দাপাদাপি রেখে গেল সে ? মানুষটি সা'জোয়ান, ফরসা রঙ, টিকলো নাক, পাতলা ঠোঁটের হাসিটাও মিষ্টি ; হাসলে, সামনের ওপরকার দুটি দাঁতে আলো পড়ে ঝিলিক খায়। চোখ দুটিতেও আলো ঝলমল করে। বউদি গো, মানুষটি সব মিলিয়ে অপছন্দের নয়, কিন্তু সাঁঝের পিদীম জ্বললে পর থেকে বেরিয়ে আমি যাই কী করে গুমটি ঘরে ? সামনে দাঁড়াস সাপের মতো লাইনগুলো পড়ে রয়েছে না ?—সাপের মতো। সাপ ত আর নয়। তোর ভয় কী ?

সত্যিকার বউদিকে যদি এ সব কথা সেদিন লক্ষ্মী খুলে বলতে পারতো, তাহলে আজ যা ঘটেছে তা ঘটতে পারতো না। সেদিন সে একা নিজের মনে উত্তর-প্রত্যুত্তর করতো কাল্পনিক সোনাবউকে সামনে রেখে।

বাদ্‌লার বিষ কী অনন্তকাল থাকে ? আকাশ আবার হেঁসে ওঠে, বালি পথটা আবার জেগে ওঠে, জামগাছের ডালে ডালে পাখ পাখালী এসে আবার কলরব জুড়ে দেয়। সেদিন কিন্তু ছাতারে পাখীরা ঝগড়া করতে আসেনি, আসেনি শালিখেরা সালিশী করতে। কোথা থেকে এক সোনাপাখী উড়ে এসে গাছের মগডালে বসে একমনে বলে চলেছে—খোকা হোক—সোনাবউয়ের খোকা হোক্ ! রান্নাঘরে ব'সে ভাতের ফ্যান্ গালছিল সোনাবউ, শুনতে পেয়ে আহ্লাদে যেন গলে গেল। সোহাগ কাঁপা কোমল কণ্ঠে সে বলে উঠলো,—অ ঠাকুরঝি, দুটি চাল ছড়িয়ে দাও না কেনে উঠানে, আমার হাত জোড়া। অন্যদিন হলে এ নিয়েই ঠাট্টায় মুখর হয়ে উঠতো লক্ষ্মী, কিন্তু আজ তা সে করলো না, নীরবে এসে গোবর মাটি দিয়ে লেপা ঝকঝক উনোনটার এক পাশে দুটি চাল এনে ছড়িয়ে দিলো। কিন্তু চাল ছড়ালেই কি পাখী আসে ?

তিনটি প্রাণীর ত সংসার। লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর দাদা আর লক্ষ্মীর বউদি। দাদা বাড়ি নেই, মাইন্দার নিয়ে বলদ নিয়ে মাঠে চলে গেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় দুটি প্রাণী নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ! আর আশ্চর্য, কিছুক্ষণ পরেই পাখীটা কথা বন্ধ করলো আর ঝুপ করে এসে উড়ে পড়লো উঠানের শেষ প্রান্তে, যেখানে চাল ছড়িয়ে দিয়েছে লক্ষ্মী।

পাখীটা ঠুকরে ঠুকরে কয়েকটা চাল খেতেই মুখ রাঙা করে যুগপৎ আহ্লাদে

আর লজ্জায় ঠাকুরঝিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো সোনাবউ। তেমনি সোহাগ মাখা গলায় বলতে লাগলো—চালে মুখ দিয়েছে। কী হবেক গো ঠাকুরঝি! লক্ষ্মী বলে,—পাখীটা কি মিছা বলেছে ঠাকরুণ? খোকা হবেক।

—মিছা যে বলে নাই, সিটা ত চালের কণায় ঠোঁট রাখতেই বুঝতে পারলাম ঠাকুরঝি!—সোনাবউ তাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ের কাছটায় মুখ ঘষতে লাগলো।

—ই দেখ করিস কী বউদি! গাটা শিরশিরায় না?

মুখ তোলে সোনাবউ, বলে,—তু কী চাস বল? তু যা চাইবি তাই দিব। পরাণটা চাস ত উপড়ে দিব।

মুখে কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে তার সেই কাল্পনিক সোনাবউকে বলে,—আমারে গুম্‌টি ঘরে পাঠাঞ্চি দিবে? লোকজন জানবে না—পাড়াপড়শী জানবে না—পাখপাখালী জানবে না! আমার পরাণটা পুড়ে যায় সোনাবউ —সেই গোরাপানা মানুষটা আমারে তুক্ কর‍্যাছে—আমি শুতে বসতে তারে ভুলতে পারি না!—বর্ষা গেছে কিন্তু বর্ষার বিষ যে আমার সর্বাঙ্গ নীল ক'রে দিয়েছে গো সোনাবউ। তোর যদি খোকা আসে, ত আমারেও সোয়ামী দে না কেনে?

বর্ষা গেল শীত গেল খরার দিন যায় যায়, আবার আকাশ জুড়ে মেঘেরা কালো হয়ে আসছে! শিবঠাকুর আবার চান করবে, আবার বালি পথে রাক্ষুসী সোঁতা বইবে, কিন্তু সেই গুমটির সুজন আর আসবে না। আর সোঁতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পাহাড়ে এসে উঠবে না, ঐ যে সুন্দরী এসে যেখানে বসেছে সেখানে সেই অ আ লেখবার স্লেটের মতো হুম্‌ড়িখাওয়া পাথরের নিচে এসে সে পা ছড়িয়ে বসবে না!

তার ঘরের জানালা পর্যন্ত একদিন খুঁজে বার করেছিল সেই গুম্‌টি ঘরের গোরা মানুষটি। ফিসফিস ক'রে বলেছিল, এলে না ত?

তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে আসে লক্ষ্মী। তারপরে জানালার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে—ক্যামন মানুষ আপনি? লোকজন দেখে ফেলায় যদি?

—কেউ দেখবে না। এদিকে এখন কেউ নেই।

—এসে পড়বে না লোক?

—সে রকম দেখলে সরে যাবো।

—আপনি যান, আমার ডর লাগে।

—আমার নাম সুজন। আমাবে দুর্জন লোক ভাবলে কেনে?

—আমি কিছুই ভাবি নাই।

—কিন্তুক আমি যে ভাবনায়-ভাবনায় মরে যাইছি।

—কেনে? এতো ভাবনা কেনে?

—ভাবনা হবেক নাই? দিনরাত একজনের ভাবন যে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। কাজেরও ভুল হয়। কোন গাড়ির পাখা ফেলতে কোন গাড়ির পাখা যে ফেলে দিব, কে জানে! ছিঃ! মেয়্যামানুষ হয়ে এমন নিষ্ঠুর হলে ক্যামনে?

—আমি নিষ্ঠুর!

—লয়? রূপের তীর দিয়ে বুকটি যে বিঁধে ফেল্যাছ গো। আমি না পারি উপড়াতে না পারি রাখতে! আমার গতি কী হবে?

—দাদার সঙ্গে দেখা করলেই ত হয়।

—কী জন্য? বিহা ত? হ' তো—যাবইত দাদার কাছে। কিন্তুক তার আগে—

—তার আগে?

—তার আগে জানতে কী সাধ হয় না, আমার মতন দশা অন্যের হঞিছে কিনা।

লক্ষ্মীর চোখে জল দেখা দেয়, ধরা গলায় বলে,—আমি জানি না আমার কী হঞিছে! কিন্তুক আপনি যান, আমারে পাগল কর‍্যা তুলবেন না।

লোকটি তবু যায় না। বলে,—সাঁঝের বেলা আসো না কেনে একদিন—গুম্‌টিতে? আমি তোমারে রেলের পাখা ফেলার কলকব্জা দেখাব। বিশ্বাস কর আমার কোনো কু-মতলব নাই।

সোনাবউগো, দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, এক বর্ষা গিয়ে আরেক বর্ষা আসে। তোমার কোলে খোকা এলো না, কিন্তু পাখীর ডাক কী মিছা হবার? এই দেখ আমার হাল, ঘরবার করতে পারি না, দাদার সামনে যেতে পারি না। অথচ গুম্‌টির সেই মানুষটি উধাও। লয় গো ঠিক্ সে লয়। এক রাতের বেলা আমারই কাছে আসবার জন্য সে লাইন পার হচ্ছিল, এমন সময় দাঁড়াস সাপ লোহার রূপ ছেড়ে জ্যান্ত হয়ে উঠলো, পায়ে দিল ছোবল্! লোকজন ছুটে গেল লণ্ঠন হাতে করে। সে বল্লে, কিছু নয়, দাঁড়াস সাপ, ওর কামড়ে কিছু হয় না। সোনাবউদি গো, সে ছিল পাহাড়ী চিতি। সেজন্য সে গুম্‌টি ঘরে পাখা ফেলতে ফেলতে চোখ বুজলো আর চোখ খুললো না। নাগিনীর বিষ চড়াৎ করে মাথায় ওঠে, রক্তে আগুন ছড়ায়। আর চিতির বিষ তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে।

তুমিই ত খবরটা এসে দিলে সোনাবউ। সকালবেলা। রোদ্দুরটাকে মেঘেরা ঢেকে আছে। তারে পাখীরা আসেনি, শালিকেরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমিই দাদার কাছ থেকে কথাটা শুনে আমাকে বললে। বললে— অ ঠাকুরঝি! শুনেছিস? সাপের কামড়ে একটা লোক মারা পইড়াছে। রোজা আইল ডাগদার আইল লোকটার হুঁশ হইলো নাই। বাঁশে বাঁইধে শ্মশান-পানে যাইছে গো।

মনে হচ্ছিল মাথাটা ঘুরে আমি পড়ে যাবো। আমার চোখের সামনে থেকে অকালে সূয্যিঠাকুর ডুবে যাবে। তুমি ত জানো না বউদি, তুমি কিছুই জানো না। শিবঠাকুর এটুকু দয়া করেছিলেন শরীলটাকে, বেশী দুখ দেন নাই, কতো কী হয় মেয়্যাদের, আমার হয় নাই। এমন কি কাপড় চোপড সামলে পরার দরুণ তোমার চোখেও আমার শরীলের অবস্থাটা ধরা পডে না। তোমার সঙ্গে চানে যেতাম কুয়োতলায়, কিন্তু তুমি থাকতে নিজেরে নিয়ে মশগুল, আমার দিকে চোখ পডতো কী? শুধু বলতে,—তোর শরীলে যে ভরা ভাদরের ঢল নামলো আর, ত ঘরে রাখা যায় না!

সোনাবউদি, তুমি গুম্‌টি ঘর নিয়ে ঠাট্টা করেছো, রস-রসিকতাও করেছো, লোকটাকে একদিন দুপুর বেলায় বেডার ধাবে দেখে ফেলাইয়াছিলে ব'লে। কিন্তুক তার বেশি কথাটা জানতে পেরেছিলে কী?

তাই শ্মশানের কথাটা শুনে আমি যখন আঁতকে উঠেছিলাম, তুমি অবাক হয়ে গিইছিলে নয় কী?

আমি শুনেছিলাম সাঁঝরাতের কথাটা। তাকে যে সাঁঝবেলায় দাঁডাসে পা জডিয়ে ধরে রাগে দুটো ছোবল মেরেছে, এ কথাটা কানে এসেছিল। কিন্তু ভোরবেলায় চিতির বিষে যে গেল, সে কী সেই মানুষ? অ-বউদি আমার মাথা খাও শীগগির বল।

সব শুনে সোনা বউয়ের মুখখানা সিটিয়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে এমন তার রাগ হলো যে লক্ষ্মীর চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে বার কতক ঠুকে দিলো, চাপা গলায় সাপিনীর মতোই হিস্ হিস্ ক'রে বললে, লক্ষ্মীছাড়ী, গুম্‌টির সামনে নাইনে গিয়ে মাথা দ।

—তাই দুবো গো বউদি তাই দুবো। সিটা ছাড়া আর আমার গতি নাই! লক্ষ্মী সত্যিই পাগলের মতো ঘরের ব্যার হয়ে আসছিল, সোনাবউ তার হাত টেনে ধরলো। বললো,—সব্বনাশী, মুখপুডী, কুলখাগী, লোক জানাজানি না ক'রে তুই বুঝি ক্ষান্ত হবি নে?

—আমারে ছেড়ে দাও!

সোনাবউ বললে,—আসুক, তোর দাদা আসুক।

দাদা ত মাঠ থেকে ফিরে আসবে সেই সূয্যি মাথায় উঠলে পর। ততক্ষণে সব রাগ জল হয়ে যায় সোনাবউয়ের। ঠাকুরঝিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। তারপর, চোখ মুছে দুজনে সলা পরামর্শ করতে বসে।

—অ বউদি, তুমি আমারে বিষ আইনে দাও।

বউদি বলে,—নতুন করে আর কী বিষ খাব গো আমরা, ঠাকুরঝি। পাড়াপড়শীরা জানতে পারলে বিষের জ্বালায় জেবন অতিষ্ঠ করে তুইলবে। উয়াদের চক্ষুর আড়ালে আড়ালে তোরে রাখতে হবে। ঘর থিকা বার হবি না তুই। পড়শীরা দুপহরে গাল-গল্প করতে আইলে অছিলা তুলে কোঁদল জুড়ে দুবো। তখন আর বসবে না, আমারে শাপশাপান্ত করতে করতে বাড়ি ফিরে যাবে।

লক্ষ্মীর দাদা মাথা-ঠাণ্ডা মানুষ। সব শুনে সে-ও হাত পা ছুঁড়লো প্রথমটায় কিন্তু পরে নিজেই ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা হয়ে এলো। তখন নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে সলা করতে লাগলো স্বামী স্ত্রীতে মিলে। অনেক বাদানুবাদের পর স্বামী বললে,—এই কথাই রইল। বুড়ো ধাইকে হাত করতে হবেক। তা বুড়ী খুব সেয়ানা আছে, এককুড়ি পাঁচ টাকা হাতে ধরিয়ে দিলে আর টুঁ শব্দটি করবেক্ নাহ্।

বুড়ী ধাহ্ এলো। জড়িবুটি অনেক ব্যাপারই তার আছে। ক্রোশ দুই দূর থেকে হেঁটে এসেছে। শুধু ছেলেপিলের ব্যাপারই নয়। নানান্ মেয়েলী রোগে বুড়ীর জড়ীবুটি কাজে লাগে বলে এ-সব অঞ্চলে প্রসিদ্ধি আছে।

বুড়ীকে পথে দেখেই এক পড়শী বউয়ের টনক নড়লো, বললে,—কী গো? কোন্ বাড়ি যাও? ঝুলি হাতে?

বুড়ী বয়সের ভারে একটু হেঁট হয়ে চলে। মুখ তুলে বললে, —হাঁই দেখ, লক্ষণ মাঝির বউ না?

হুঁ!

বুড়ি বললে, চোখে ঠাহর দেয় না।

—চললে কুথাকে? সিটা বল?

বুড়ী বললে,—যাইছি মাহাতো-বাড়ি।

কোন্ মাহাতো?

বুড়ী লক্ষ্মীর দাদার নাম করলো। বউটি চোখ বড়ো-বড়ো করে বললে,—কী হইলো গো? বাঁজা বউটার কিছু হইল টইল নাকি?

বুড়ী চোখ মটকে বললে,—না, হবে আবার কী? ফিট হঞিছে মাঝে মাঝে, সিটা দেখবার জন্য যাইছি।

বউটি বললে.—ফিট উয়ার হবে না ত কার হবে! রাজ্যের বিষ আইস্তে জড়ো হঞিছে উয়ার জিভের ডগায়, দিন রাত লক লক কইরছে সাপিনীর মতন, বাসায় কাকচিল বসবার জো নাই গো।

বুড়ী আর কথা না বলে চলে আসে লক্ষ্মীদের বাড়ি। আগে ঢক ঢক করে জল খায় এক ঘটি। তারপর বলে,—অ সোনা বউ ইবার বিত্তান্ত বল।

ঘরের ভিতরটিতে এসো আগে?

বুড়ী আসে,—এলাম, ইবার বল।

বলার আর কী আছে নতুন করে? দেখাশুনা শেষ করে বাইরে এসে লক্ষ্মীর দাদার কাছে ব'সে গুজগুজ ফিসফাস সুরু করে দেয়। পায়ে পায়ে সোনাবউও এগিয়ে যায়. কাছে গিয়ে বসে।

বুড়ী বলে—বাড়ন্ত মাস, নষ্ট করা চলবেক নাই। নষ্ট করতে গেলে মেয়্যাটিও মরবে। সিটি কী চাও তোমরা?

লক্ষ্মীর দাদা বলে,—ই দেখ, সিটি চাইব কেন? শত হলেও মায়ের পেটের বুন। বাপ নাই মা নাই--আমি ত আছি। কথায় বলে,—দাদা হঞিছে মাত্তিরি-পিত্তিরি সমান। না কি, বল?

হঁ তো।

দাদা বলে,—তবে?

বুড়ী বলে.—শহুরে মনিষরা আইস্তে ভাষা শিখাঞিছে বটে! ঐ যে বুললি —তবে? কানে শুনাইল বটে ভালো। তো, ইবার করবি কী?

সোনাবউ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবার কথা বললো,—আমি তুয়ারে একটা কথা বুলব, মাসী?

—হঁ বল?

সোনাবউ ধীরে ধীরে বললে মুখ নিচু করে,—মনে কর না কেন ওটি আমার কোলে আসছে। আমি উয়ারে মানুষ করব।

দাদা বলে ওঠে,—তা'কর না কেনে? কিন্তু তুয়ার ছেলে বলে লোকে মানবেক নাই। আর দু'তিন মাস পরে ছেলে হবেক বলে মাসী বুলছে, ক্যামন? তু তুয়ার বাপ-মায়ের একটি মাত্তর মেইয়ে, তুয়ার বাপ-মা খবর পাইল নাই, পাড়াপড়শী খবর পাইল নাই, জ্ঞাতি-কুটুম জানতে পারল নাই, আর বাঁজাবউএর ছেলে হইল? লোকে চালাক-চতুর হঞেছে বটে, তুয়ার কথা মানবেক নাই! আর ইখন জানান দিলে সবাই আইস্যা পড়বে, আর সব বিত্তান্ত ফাঁস হঞিয়ে যাবে। না, সিটি হয় না।

—তবে ?

মাসী কী বুলছে শোন।

বুড়ী বলে,—টাকা ছাড়া আমায় একখান কাপড় আর একধামা চাল দিবি বাপ। ইখন লয়, সি আঘনে, লক্ষ্মী ঠাকরুণ মাঠ থিকা ঘরকে উঠবার পর।

—হঁ মানলম।

বুড়ী বলে,—ছেইলে হোক, কাক কোকিলে টের পাবে নাই। যদি তোমরা বল ত ছেইলেটা ভুঁই ছুঁয়ে ওঁয়া করবার আগেই শেষ করতে পারি।

সোনাবউয়ের সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে, বলে,—না-না।

বুড়ী সোনাবউয়ের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসে, বলে,—বেশ কথা সবাই যিটি করে, সিটি কর। আমি ঠিক পাচার কইরে জঙ্গলের ধারটিতে ফেইল্যে দিয়ে আসব। রাস্তার লোক ট্যাঁ ট্যাঁ শুনবেক নাই? একটা-কেউ এসে সোনা উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তুরা ভাবিস না।

সোনাবউ বলে,—না-না সিটিও হবেক নাই। সোনা আমার চাই, আর কাউকে নিতে দুব না।

বুড়ী বলে,—বেশ গো তাই হবেক। লক্ষ্মীর দাদা বাইরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসবেক। ট্যাঁ ট্যাঁ শুইন্যে লোক জড়ো হবে! ও-ও জুটবে সেখানে। আহা ভারী সোন্দর ত বটে!—বলে, ছেলেটারে কোলে কইরে ঘরে ফিরবেক। ব্যাস আর কী. তুয়ারা বউ-ঠাকুরঝি মিলে সোনার খোকারে সোনা কইরে তুল। অ্যাঁ? কী বলিস?

দিন যায়। লক্ষ্মী লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়ন্ত দুপুরে কুয়োতলায় যায়! চান করতে নয়, চুপচাপ একটু জামতলাটায় বসে থাকতে। চান-এর ব্যবস্থা ওর বউদিই করে দিয়েছে বাড়ির ভিতরে। বালতি-বালতি জল তুলে ঘড়া ভর্তি করে নিজেই নিয়ে যায় তার ঠাকুরঝির চানের জন্য। সে কথা নয়। কথা অন্য। কুয়োতলায় এসে অন্য একজনের কথা ভেবে চোখের জল ফেলে।

এক-একদিন মুখ তুলে সেই অ-আ লেখবার স্লেটের মতো হুমড়ি-খাওয়া পাথরটার নিচেকার ছায়ার দিকে তাকায়, সেখানে দলছুট সেই প্রাণীটি এসে ঠিক বসে আছে, যার নাম ওরা রেখেছিল,—সুন্দরী। একটা হাত বোধহয় ভাঙা, পা-ও একটু খোড়া—চলন দেখলেই বোঝা যায়, ও আর কেউ নয়, সেই সুন্দরী। তার সেই বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম অধ্যায় থেকেই সে দেখে আসছে চতুষ্পদ এই প্রাণীটিকে। বুকের দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায়, ওটি স্ত্রী প্রাণী। সোনা বউদি ঠাট্টা করে বলত,—তুয়ার সখী আইছে লো, কথা বল।

আশমান-এ মাঝে মাঝে শাখামৃগের দল দেখা যায়। শাখামৃগ কথাটা লক্ষ্মীর পক্ষে জানবার বিষয় নয়, সে বলে,—মুখপুড়ী আইছে।

অর্থাৎ ওর সখী, যার নাম সুন্দরী রেখেছে ওরা, সে বানরীও নয়, হনুমতী। মুখ তার নিকষ কালো, গায়ের লোম সাদাটে।

প্রথম যৌবন থেকেই ওকে চিনতো লক্ষ্মী! তারপরে, যেদিন থেকে বাধা-নিষেধের প্রাচীর উঠলো তার চারপাশে, যেদিন থেকে চোরের মতো তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র আসতে হয় কুয়োতলায়, সেদিন থেকে ওর প্রতি সত্যিই একটা টান অনুভব করতে লাগলো লক্ষ্মী। তার একটা কারণও ছিল। সুন্দরী আগে ঐ ছায়ায় এসে বসতো একা একা, ইদানীং দুটো বাচ্চা হয়েছে তার। বাচ্চা দুটো তার পেটের সঙ্গে মিশিয়ে থাকতো, এইখানে এসে মা সোজা হয়ে বসতেই ছুটোছুটি শুরু করে দিতো তারা। লক্ষ্মী একদিন সোনাবউকেও ডেকে নিয়ে এলো চুপি চুপি, বললে,—হাঁই দেখ, সুন্দরীর বাচ্চা হঞিছে।

সেই বাচ্চা দুটির একটি কী করে যেন পড়ে যায়। অসীম সাহসে লক্ষ্মী সেই বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে কুয়োর পাশে শুইয়ে দেয়। সুন্দরী নেমে আসে, অন্য বাচ্চাটাও নেমে আসে, কিন্তু লক্ষ্মীকে ওরা কিছু বলে না। সুন্দরীর চোখ দিয়ে মানবীর মতো জল পড়তে থাকে।

লক্ষ্মী বালতি দিয়ে অতি কষ্টে কিছু জল তুলে বাচ্চাটার চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে থাকে, মুখেও দেয় কয়েক ফোঁটা। আর আশ্চর্য, বাচ্চাটাও চোখ মেলে তাকায়, আস্তে আস্তে উঠে বসে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছোঁ মারবার মতো করে কোলে তুলে নেয় সুন্দরী এবং নিয়ে আর দাঁড়ায় না, তরতর উঠে যায় ওপরে।

কয়েক মিনিটের ঘটনা মাত্র। ভেবে দেখতে গেলে সাংঘাতিক সাহসের কাজই করেছিল লক্ষ্মী। কিসের প্রেরণায় যে করেছিল, সে-কথা কে বলবে? ওরা যদি দলে-দলে এসে তাকে আঁচড়ে কামড়ে দিতো, তার করবার ছিল কী? সে একেবারে একা, পাড়ার বেটাছেলেরা মাঠে, মেয়েরা যে যার ঘরে ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন কি, আসবার সময় সোনাবউকেও সে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে আসেনি সেদিন।

বউদি গো, সুন্দরীর সঙ্গে কিন্তুক ভাব আমার অনেক দিনের। ঐ যে হুমড়িখাওয়া সেলেটের মতো পাথরটির ছায়া, যেখানে সেই উপঝ্‌রণ বাদলার দিনে সেই মানুষটি এসে বসেছিল, ঠিক সেখানটিতে এসে বসতো সুন্দরী, তাকে চোখ চেয়ে দেখতো, কখনো ভয় দেখাতো না। কথা বললে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তুক ভেংচি কাটেনি বা ভয় দেখায়নি। বউদি,

সুন্দরীর কোলে বাচ্চা দেখে আমার মনটাও যেন সেই বাদলা দিনের মতোই নেচে উঠেছিল। আমার পেটেরটা নড়ে চড়ে, আর ওরটা কোলে এসেছে। বিচার করে দেখলে আমরা দুজনেই ত মা। মায়ে মায়ে মু:খর কথা নেই, কিন্তু মনের কথা আছে। সুন্দরী, আমার মরদ বেঁচে নেই, সে মানুষটি আমার জন্য পাগল হঞিছিল গো সুন্দরী, আমিও হঞিছিলাম। যে বানের জলে মানুষ ভেসে যায়, সেই সব্বনাশা বানের জলের তোড় ঠেলে মানুষটা একদিন আশমানে উঠেছিল; তুমি যেখানটিতে বসেছ, ঠিক সিথানটিতে বসেছিল। আমার কাছে আসতে গিয়ে পা হড়কে কপাল ফাটিয়ে ফেলেছিল। আমার শাড়ীর আচল ছিঁড়ে সেই রক্ত আমি কেন মুছিয়ে দিইনি সেদিন? কেন লজ্জা এসে আমার হাতে পায়ে শিকল জড়িয়ে দিয়েছিল? কেন? কেন?

বছর ঘুরে আবার ঘুরে এসেছে সেই বাদলার দিন। বউদি গো, সোনাবউদি শীগগির ওঠো। আমার শরীরটাতে কে যেন কামারের সেই প্রচণ্ড হাতুড়িটা দিয়ে ঘা মারছে। আমি বাঁচব না, আমি মলাম। উই গো! আমার ভিতরটা যেন কোন রাক্কুসী ঝকঝকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কুটে খাচ্ছে। একী, আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমাকে তোমরা কোন ঘরে শোয়াচ্ছো? আমার কাপড়, আমার জামা,—। উই গো, অ'মাকে ধরো বউদি, আমাকে পাথরের ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। আমার একী হচ্ছে গো বউদি, আমার একী হচ্ছে! আমার হাত ধরো, আমাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে আঁধারে ডুবিয়ে মারবে বুঝি।

বউদি, অ সোনাবউদি? বাদলা থেমে গেছে, না? বাতাস একদম পড়ে গেছে, না? দুটো কানের মধ্যে যেন বাঁশীর সুর বাজছে, বুঝলে বউদি? উঠানে দাঁড়িয়ে দাদা কার সঙ্গে কথা বলছে, বউদি? দাদার গলার স্বর শুনলাম না? গোয়াল থিক্যা ধবলী আর তার বাছুরটারে বার করেছে ত মাহিন্দাররা?

লক্ষ্মী যে এতো কথা বলছে, সোনাবউ কি তার একবর্ণও শুনতে পেলো? লক্ষ্মীর কণ্ঠেও কথাগুলো সোচ্চার হলো না, সোনাবউয়েরও কানে গেল না সে একটা ধলা কাপড়ের পুঁটলিতে একরাশ নরম সোনা নিয়ে দোল দিচ্ছে। দোল দিতে দিতে এক সময় লক্ষ্মীর কাছে এলো, বললে,—অ ঠাকুরঝি,. চোখ চাও, দেখ, কী ফুটফুইট্যা ছেলে হঞিছে তুমার।

লক্ষ্মী চোখ চেয়ে অবাক হয়ে গেল। বললে,—আমার!

—হুঁ। তুমারই ত!

অবসন্ন হাত দুটো বাড়িয়ে লক্ষ্মী বললে, দাও, আমার কোলে দাও?

কিন্তু ওর কোলে দেবার আগেই হা হা করে ছুটে এল বুড়ী দাই। বললে,—ছেলেটাকে নিয়ে হাই দিক পানে যাও দেখি, আমার কাজটি করতে দাও।

বুড়ী দাই লক্ষ্মীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ওকে এখন সুস্থ করে তুলে ধবধবে একখানা কাপড় পরিয়ে দিলো, বুকে পেটে পটি বেঁধে দিলো। তারপর, গরম দুধ খাইয়ে দিলে ওকে।

ঘণ্টা খানেক লাগলো এইসব কাজে। তারপর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ভালো করে কাপড়-চোপড় দিয়ে ঢেকে বুড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো। সময়টাও পড়ন্ত বিকেল, গাছে গাছে ফিরে আসা পাখীর দল জটলা করছে।

সোনাবউ পিছন পিছন বেরিয়ে পড়েছে, বললে,—ছেলেটাকে ফিরে পাবো ত বটে?

বুড়ী উত্তর দেয় না, উত্তর দেয় লক্ষ্মীর দাদা, বলে,—তুই চুপ দে। এখন ভালোয় ভালোয়—

বুড়ী বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। সোনাবউ স্বামীকে তাড়া দেয়, বলে,—তুমিও ইখন যাও না কেনে? ছেলেটাকে পথের ধার থেকে কুড়াই আনবে বটে!

সোনাবউয়ের তাড়া খেয়ে অবশেষে পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসে বটে লক্ষ্মীর দাদা। কিন্তু সোনাবউ কি জানে, তার মনের মধ্যে তখন কী কুটিল আবর্ত পাক খেয়ে ঘুরছে?

বুড়ীই তাকে বুঝিয়েছে। বুঝিয়েছে যে, যতই ছেলে ফিরিয়ে নাও, সমাজকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। আর ধর না কেনে, ছেলে যদি বড়ও হয়, তখন কী পরিচয়টা তুমি দিবে হে? পাড়া গাঁ বুলে কথা? সাত সতেরো রকম ঝঞ্ঝাটে পড়বে। তার থিক্যা, যে কাজটা সহজ, সিটা করি, কী বুলিস? আমি জঙ্গলের মধ্যে ফেইলে দিয়ে আসি, সাঁঝের আঁধার ঘোর হয়ে আসছে, শেয়াল কেয়াল আছে, ঠিক কাজটি হয়ে যাবে। না হলে বিচের কর, লোকজন আছে, থানা-পুলিশ আছে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরইতে পারে হে!

লক্ষ্মীর দাদা তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিন্ন দিকে অযথা ঘুরতে গেল। ওদিকে ধীরে ধীরে সাঁঝও হয়ে আসতে লাগলো। কোথায় কারা শাঁখ বাজাচ্ছে, তার শব্দও শোনা গেল। দূরে—বহুদূরে—কে যেন কার নাম ধরে ডাকছে। নাম বোঝা যায় না,—একটানা একটা 'উ-উ-উ' শব্দ কানে এসে বাজছে।

সোনাবউ ঘর থেকে উঠোনে নামলো, তারপরে উঠোন থেকে বাইরের দরজায়। এখনো আসছে না কেন? সে কি পথ ধরে আর একটু এগিয়ে যাবে নাকি?

হঠাৎ যেন ঘোরটা কেটে গেল লক্ষ্মীর। ঘরে আলো নেই কেন?

অ-বউদি ? বউদি বা কোথায় ? কোথায় বুড়ী দাই ? কোথায় তার ছেলে ?

ভার ভার দেহটা টেনে সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করলো লক্ষ্মী। অ-বউদি আমার ছেলে আমার কোলে দিচ্ছ না কেনে তোমরা ? অ আমার সোনা— আমার কোলে আয় না কেনে ?

কিন্তু কোথায় কে ? লক্ষ্মীর বুকের ভিতরটা কিসের এক অজানা আশঙ্কায় ছ্যাঁৎ করে উঠলো। আমার ছেলেকে কি কোথাও নিয়ে গেল ? কিংবা আমার ছেলেকে কি ওরা শেষ পর্যন্ত—

আর ভাবতে পারে না লক্ষ্মী, বউদি বলে চিৎকার করে ডেকে ওঠে। সাড়া পায় না। সাড়া না পেয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠে মায়ের হৃদয়, মরীয়া হয়ে ওঠে সে। নিজেকে টেনে হিঁচড়ে দুটি হাতে ভর দিয়ে ঘর পেরিয়ে দাওয়ায় আসে। ওদের বাড়ির দাওয়া উঠোন থেকে হাত খানেকের বেশি উঁচু নয়। দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে পড়তে যায় লক্ষ্মী। সহজে কী পারে ? চোখে আঁধার দেখে।

অ-বউদি ! আমার ছেলেকে নিয়ে তুমরা কুথাকে গেলে ? কী করবে তুমরা আমার ছেলেকে নিয়ে ? না-না, আমার সোনা—আমাকে দাও। আমি উয়ারে নিয়া ভিন দ্যাশে চলে যাবো। তুয়াদের জ্বালাবো না। কথা দিচ্ছি বউদি, আমি ঠিক চলে যাবো।

কিন্তু কোথায় বউদি ? হঠাৎ একটা ক্ষীণ স্বরে কে যেন ডেকে ওঠে। বাচ্চা ছেলের ওঁয়া ওঁয়া কান্নার মতো। চোখ ফিরিয়ে যা দেখে, তাতে বিস্ময়ে আর আনন্দে একসঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠে লক্ষ্মীর অন্তরে। সেই খোঁড়া চতুষ্পদ প্রাণীটি—সেই সুন্দরী—তার ছেলেকে মানুষের মতো দুটি হাতে করে বুকের উপর চেপে ধরেছে। ধরে, সন্তর্পণে ওর দিকে এগিয়ে নিয়ে আসছে।

সারা পল্লীর লোক ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের বাড়িতে। লক্ষ্মীর দাদা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, লক্ষ্মীর কাছে সোনাবউ বসে আছে চোখে জল নিয়ে। আর লক্ষ্মী তার ছেলেকে বুকের কাছে চেপে ধরে পাগলের মতো বলছে—আমার ছেলে ! তুমরা সব শুনে যাও, ই ছেলে আমার। আমার নাড়ি ছেঁড়া ধন—আমার সাত রাজার ধন এক মানিক ! তুমরা মারতে চাইলে কি হবে ? উয়াকে মার'ত পারো না, আমি উয়াকে বাঁচিয়ে তুলবোই।

সোনাবউর মুখে হাসি কান্নার সংমিশ্রণ। বললে, উয়াকে পালি কুথাকে ! আশে পাশে চোখ তুলে তাকায় লক্ষ্মী, সারি সারি সব পুতুলের মুখ, এদের মধ্যে সুন্দরীর স্থান হবে কী করে ? সে তার কাজ ক'রে সবার অলক্ষ্যে কখন চলে গেল কে জানে !

একটি নয়ানজুলির উপাখ্যান

পিচ-মোড়া কালো রাস্তাটা কালনাগিনীর মতোই এঁকে বেঁকে বিশাল প্রান্তরটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। নাগিনীর লেজটা গেছে অম্বিকা-কালনা আর ফণাটা শহর বর্ধমান। মেয়েগুলো সার দিয়ে মাঠে কাজ করছে, পায়ের পাতা জলে ডোবা, হেঁট হয়ে 'রোয়া' ধানের কাজে তারা ব্যস্ত। বর্ষাকাল, কিন্তু কিছু জল দিয়েই মেঘগুলো 'ঘুষ-না-পাওয়া দারোগার মতো' মুখ ভার করে অন্যদিকে চলে গেছে। সুয্যিঠাকুরের 'খরা' দৃষ্টি কাপড় ভেদ ক'রে 'শরীলে' জ্বালা ধরায়। মেয়েগুলো নানান বয়সী, তবে সব কটিই বিবাহিতা, কুমারী দলের মধ্যে একটিও নেই, তারা গামছা প'রে হাত জাল-টাল দিয়ে কোথায় কোন্ নয়ানজুলিতে মাছ ধরতে নেমে প'ড়ছে। তাদের সঙ্গে গ্রামের 'কুচো-কাচারা'ও ছুটোপাটিতে মেতে গেছে নিশ্চয়। বড়োরা আজ মাঠের দিকে আসেনি, কেউ ঝাঁকা মাথায় হাটে গেছে, কেউ কোর্ট কাছারীতে, কেউ গাড়িতে বলদ জুড়ে 'কালনাগিনী'র দেহের ওপর দিয়ে বাঁক ঘুরে ঘুরে ভিন গাঁয়ে বা শহরে গেছে 'সওদা' নিয়ে আসতে।

মাঠের মেয়েগুলো বেশিক্ষণ নিশ্চুপে কাজ করতে পারে না। ধান রুইতে রুইতে একজন আরেক জনকে বলে—এই মাঠখানার রকম দেখেছো দিদি? কোলে ছেলে নিতে চায় না! গা-গতর শক্ত করে সিঁটিয়ে বসে আছে।

অপরজন ততোধিক সুরসিকা, বলে,—গতরে আর কত সয় লো! ভাদরে 'আঁতুড়' উঠতে না-উঠতেই অমনি ভরা পেটের ব্যবস্থা!

—যা বলেছিস। 'ভাদর' যেতে-না যেতেই মাঠের মাটি গুঁড়িয়ে মাটি 'তৈরি' করে বীজ ছিটিয়ে দিয়ে যায়।

অন্য মেয়েরাও যোগ দেয় এই সরস আলোচনায়। ও-পাশ থেকে একজন বলে,—অমনি আকাশ থেকে এলেন 'কালো মাণিক,' মাটির আর সুখ সয়না, জল পড়তে-না পড়তেই 'ছ-মাসের খোকার মতো' ছলবলিয়ে উঠেছে চারাগুলো।

প্রথম মেয়েটি বলে,—চারাগুলো নিয়ে আমরা ত 'চষামাঠে' সার দিয়ে দিয়ে রুয়ে দিচ্ছি, কিন্তু কালো মাণিকের দেখা নেই যে?

দ্বিতীয়া বললে,—দেবকীর কোল থেকে যশোদার কোলে আনলাম, এবার যশোদার হাতযশ !

তৃতীয়া পায়ের পাতা-ডোবা জলে পা নাড়িয়ে একটি 'খলবল' ঝংক'র তুলে বলে উঠলো,—মায়ের বুকে তুধ আছে লো, ভয় নেই।

তার ওপাশের মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দেয়। হেঁট হয়ে কাজ করতে করতে কোমরটা টন্‌টন্ করছে। রোয়া ধানের কাজ কম শ্রমসাধ্য নয়, সেই শ্রমের কঠোরতাকে ভুলবার জন্যই ওরা রঙ্গ-পরিহাস করে থাকে নিজেদের মধ্যে। মেয়েটি বললে,– এই নাও, হচ্ছিল 'বিন্দাবন-লীলা',—অমনি মাঝপথে থামিয়ে তুললে কিনা—গোষ্ঠের কথা ! কী রকম 'গোপিনী' হে তোমরা ?

মেয়েদের মধ্যে অমনি একটি হাসির হিল্লোল ব'য়ে যায়। প্রায় সব মেয়েগুলো উঠে দাঁড়িয়ে কোমরটা 'টান' করে নেয়। একজন বলে,—নাগর থাকলে ত কথা উঠবে ? আকাশের দিকে চোখ পাড়ো, 'কালো নাগরের' লেখাযোখা'ও নেই, 'নীলযমুনা' খিল্‌খিল্ করে হাসছে খালি।

ওদের মধ্যে যে সব থেকে বর্ষিয়সী সে এবার ধমক দিয়ে ওঠে,– ছুঁড়ীর দল কি রঙ্গ-রসে কাল কাটাবি ? এত বড়ো 'মাঠখান' পড়ে আছে না ? 'কাজ' শেষ না হলে বিশ্বেশ মশাই পয়সা দেবে ? উল্‌টে মুখ-ঝামটার একশেষ হবে। শেষপর্যন্ত দেখতে পাবি, ভিন গাঁয়ের গতর-সোহাগীরা আমাদের বদলে মাঠে নেমে পড়েছে।

যাকে বলে একেবারে 'মোক্ষম' কথা, মুহূর্তে হাস্যপরিহাসের সুর শূন্যে মিলিয়ে যায়। যে যার হেঁট হয়ে কাজে মন দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

এরা সব গাঁয়ের গরীব 'ভাগ-চাষী'দের ঝি-বউ। নিজেদের ক্ষেত নেই, পরের 'ক্ষেতে' মজুরী ক'রে এদের পেট চলে। দিন গেলে কাজ-হিসেব ক'রে হয়ত বা একটা গোটা দু'টাকার নোটই বিশ্বেসমশাই তুলে দেবে এদের এক-একজনের হাতে। এখন সারা প্রান্তর জুড়ে 'রোয়া'র কাজ চ'লেছে, পরে চারাগুলো আরও পুরুষ্টু হলে নিড়ুনীর কাজ আরম্ভ হবে। চারাগুলোর আশ পাশ থেকে আগাছার জঙ্গল নির্মূল না করলে, চারাগুলো বাড়তে পারবে না, নিজেদের ছড়াতে পারবে না।

এরপর, বেশ কিছুক্ষণ ওদের কাজ চলতে থাকে নিশ্চুপে। ওদের মধ্যে যারা সন্তানের জননী, তারাও ছেলে মেয়েদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে 'রোয়া'র কাজ করছে। অসীম মমতায় চারাগুলো রুয়ে দিচ্ছে তারা, যেন বাচ্চাদের 'চান' করিয়ে গা মুছিয়ে দাওয়ায় বসিয়ে দিচ্ছে মায়েরা।

আর, এইসব জননীদের যারা সত্যিকার 'গুঁড়োগাড়া,'—তারা একেবারে

নিরাবরণ হয়ে সেই 'কালনাগিনী'-পথটার পাশের 'নয়ানজুলি'তে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে প'ড়েছে। প্রায় আট দশটি ছেলেমেয়ে, চার থেকে 'আট-ন' পর্যন্ত বয়েস। আর আছে দুটি মেয়ে, দুটিই কিশোরী, একটি বারো, অপরটি চৌদ্দ পনেরো হবে। কিশোরী দুটির পরনে গামছা, হাতে 'টুকো জাল',— একটা সাধারণ চুবড়ির মতো দেখতে,—বেড়্টা বাঁখারির, নীচে ঝুলে আছে জাল। 'টুকো জাল' এধারে ওধারে বসিয়েও দু'টো একটা কুচো মাছ ছাড়া আর কিছুই পেলো না ওরা। ওরা জলে নেমে জাল ডোবায় আর গুঁড়োগাড়ারা খানিকটা জলে নেমে এসে ব্যাপারটা লক্ষ করে। খুব ছোটরা সাহস পায় না, পাড়ে ছুটোছুটি করেই তাদের উল্লাস প্রকাশ করে। কিশোরী দুটির মধ্যে বড়োটাই নেত্রী, সে এক সময় হাতের 'টুকো জাল'টা ডাঙায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ছোট-টি শুধোয়, এটা কী করলি ?

বড়োটার নাম রাইমণি, বলে,—জালটা তুই-ও ফেলে দে।

—কেন ?

—ফেলে দে না ? ও-জালে হবে না। আয় গামছা টানি।

বড়োটা করেছে কী, একটা গামছা প'রেছে, আরেকটা গাম্ছা বুকের ওপর জড়িয়েছে বেশ ক'রে। বড়োটা বুকে, আর খাটো গাম্ছাটা কোমরে। কোমরের গামছাটার বহর হাঁটু পর্যন্তও আসেনি।

ছোট-টির নাম,—নিম্মলা। নিম্মলার পরনে একটাই গাম্ছা, এবং সেটি বড়ো গাম্ছা। রাইমণি পাশের রাস্তাটার দিকে তাকায়। রাস্তায় জনপ্রাণীও নেই, দু-একটা ছাগল এদিক-ওদিক চরছে শুধু। শহরের বাসটা এই খানিক আগে হুস্ করে ছুটে চলে গেল। পরের বাসটি আসতে, সেই যাকে বলে, দুপহর। তবে আর লজ্জাটা কী ? রাইমণি নিম্নকণ্ঠে বলে,—জলে ত নেমেছিস, তোর গামছাটা খোল্ না ?

—ছিঃ !

—'ছিঃ' কী রে ? কে দেখবে ? তুই ত জলে ঢাকা থাকবি। তা' ছাড়া, তুই ত ছোট মেয়ে, তোর অত ভাবনা কী ?

নিম্মলা মুখ ঘুরিয়ে বলে,—তুমিই কী বা বড়ো ? আমার থেকে দু'বছরের ত মোটে। তুমিই খোলো না ?

রাগ ক'রে রাইমণি বলে,—ঠিক আছে, তাই খুলবো।

বলতে বলতে, আরও একটু জলে নেমে বুকের বড়ো গাম্ছাটা খোলে, তারপর নিম্মলার হাতে ধরিয়ে দেয় এক প্রান্ত, বলে,—টান ?

দুজনে গাম্ছাটার দু প্রান্ত ধরে, জল ছেঁচে কিনারের দিকে নিয়ে আসে।

কিনারের দিকে আসবার সময় রাইমণি জলে কাত হয়ে থাকা সত্ত্বেও বর্তুলাকার দুটি কদম্ব-পুষ্প জলরেখার বাইরে ভেসে ওঠে। কিন্তু সেদিকে মন রাখতে পারে সে কতক্ষণ? গামছায় পুঁটিমাছের ঝাঁক পড়েছে, বেশ বড়ো পুঁটি। গামছা কিনারে আনতেই 'গুঁড়োগাড়া'র দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রাই চিৎকার করে—এই হটো সব। নিম্মলা মাছগুলো তোল, খালুইতে ভর্।

নিম্মলা জল ছেড়ে উঠে মাছগুলোর তদারক করে। রাইমণি মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকায়, বলে,—চিল চক্কর দিচ্ছে রে, সাবধান, ছোঁ না মারে।

'বাখারী-চাঁছা' দিয়ে তৈরি গোলাকার খালুইতে মাছ রেখে খালুইয়ের মুখের ওপর ইঁট চাপা দেয় নিম্মলা। তারপর হাঁক দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাচ্চাদের। বলে,—এই খবরদার, এটার ওপর পড়িস না। নজর রাখিস শুধু।

'নয়নাজুলি'র একদিকে ওরা গামছা দিয়ে জল ছেঁচে মাছ ধরতে ব্যস্ত, অন্যদিকে জল কিন্তু প্রায় স্থির। শুভ্র স্ফটিকের মতো 'শালুকফুল' গুলো ফুটে আছে, গোলাকার সবুজ শালুক পাতা জলের ঠিক ওপরটিতে ভেসে আছে। রোদ্দুর বাড়ছে, আর 'কুমুদিনী' নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে ফেলছে। সূর্য মাথার ওপরে আসবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে, ফুলগুলো ছোট হয়ে আবার 'অস্ফুট কুঁড়ি'র মতো আকার ধারণ করেছে। 'কুমুদিনী'র সঙ্গে সম্পর্ক চাঁদের, চাঁদের আলোয় দল খোলে, আহ্লাদে হেসে ওঠে সুশুভ্র কুমুদ কহ্লার!

'কালনাগিনী-রাস্তা'টা যখন বছর তিনেক আগে চওড়া করবার দরকার হয়েছিল, তখন মাটি কেটে নেবার জন্য তৈরি হয়েছিল এই গ্রাম-পার্শ্বের নয়ানজুলিটি। বর্ষার জল জমতে লাগলো, ফুটে উঠলো শালুক-ফুল।

তিন বছর আগে মাটি কাটতে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে সেই মানুষটাও ছিল। ছফুটেরও ওপর লম্বা, চওড়া বুকের ছাতি, মাথায় বাবরী চুল, মিশকালো গায়ের রঙ। লোকটা কাজও করতো যেমন অসুরের মতো, তেমনি আবার 'রসিক'-ও ছিল। পাড়ার বৌ-ঝিদের দেখলে সুর ভাঁজতো, 'ফষ্টিনষ্টি' করবার সুযোগ খুঁজতো। এবং, এই নিয়েই গ্রামের লোকেদের সঙ্গে একদিন লাগলো ঝগড়া, কথাকাটাকাটি, চিৎকার। লোকটাও সাংঘাতিক, যাকে বলে, 'ডাকাবুকো'। হাতের লাঠি বসিয়ে দিলে ও-পাড়ার 'পাখিরা'-বাড়ির মেজো ছেলে 'কানাই পাখিরা'র মাথায়। ব্যস্ আর যাবে কোথায়? লেগে গেল হুটোপাটি। এলো চৌকিদার, এলো 'দারোগা'—কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল লোকটাকে। 'কানাই পাখিরা' পরে 'হাসপাতাল' থেকে ভালো হয়ে ফিরে এলো, কিন্তু ঐ লোকটার হয়ে গেল তিন বছরের জেল। লোকে বললে, পুলিশ বলেছে, লোকট নাকি দাগী আসামী, মারামারি, কাজিয়া, সিঁধেল-

চুরি—কোনটাই নাকি বাকি নেই। আবার পরে এ-ও শোনা গেল, পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে রেখে লোকটিকে যখন সবাই কাবু করে ফেলে রেখেছিল রাস্তার পাশে পুলিশ আসার অপেক্ষায়,—তখন নাকি লোকটি বলেছিল,—সিঁদকাটি ছুঁড়ে ফেলে মাটি কাটতে এলাম চরিত্তির শোধরাবো বলে, কিন্তু, তোমরা তা' হতে দিলে না।

কে যেন 'খেঁকিয়ে উঠে' বলছিল,—চরিত্তির শোধরাবার ঝোঁক, ত' বৌ-ঝিদের দিকে নজর দিতে কেন?

লোকটা নাকি বলেছিল—কী করব মাশায়, ওটা আমার স্বভাব। আগে-আগে বৌ-ঝিদের দিকে চোরা নজর দিতাম গয়না গাঁটি গায়ে কী আছে দেখবার জন্য; আবার এখন দেখতাম, কোন্ মেয়েটার মধ্যে কী আছে, লোকে মেয়েছেলের লেগে পাগল হয় কেন, এইসব জানবার জন্য।

লোকে পরিহাস করে নাকি বলেছিল,—ঈস, একেবারে ফকির দরবেশ!

লোকটির তবু লজ্জা নেই, বলেছিল,—তা বলতে পারো। আমার নামটাও ফকির বটে।

রাইমণি আর নির্মলা গামছা দিয়ে মাছ ধরতে ব্যস্ত, আর ওদিকে মাঠের মধ্যে তাদের মায়ের দল ক্ষিপ্র হাতে তাদের কাজ করে চলেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হ'য়ে যাচ্ছে, কারুর সেদিকে দৃষ্টিও নেই, ধীরে ধীরে কুমুদ ফুল তার পাপ্‌ড়ি বুজিয়ে ফেলতে লাগলো, সূর্য উঠে এলো প্রায় মাথার ওপর, আর ঠিক সেই সময় আকাশের কোণ থেকে উঠে এলো 'কালো মানিক'। একটি মেয়ের গায়ে লাগলো ঠাণ্ডা একটা বাতাস, মেয়েটি মুখ তুলতেই দেখতে পেলো, আকাশ দিয়ে 'কালো মানিক' আসছে 'হাই-হুই' করে। মেয়েটি বললে,—আসছে গো!

—তাই নাকি?—সবাই মুখ তুললো।

একজন বললে,—বাঁশিতে কি ফুঁ দিয়েছে?

—কই, শোনা ত যায় না।

অপর জন বললে,—ঐ দেখ, বাঁশিটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু।

—হ্যাঁ, তাই ত।

কালো মেঘের কোলে ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিদ্যুৎ রেখা। অন্য একটি মেয়ে বললে,—এখনো ফুঁক দেয়নি।

বর্ষিয়সী বললে,—হাত চালাও, বিশ্বেস মশাইয়ের কথা মনে আছে ত?

হেঁট হয়ে আবার ওরা কাজে হাত দেয়। একজন তখনো বলে—আসুক কালো মানিক, সারা গায়ে হাত বুলিয়ে 'শরীল'টাকে শীতল ক'রে দিয়ে যাক্।

ওরা কথা বল্ছে, আর নয়ানজুলিতে বেঁধেছে এক বিভ্রাট। মাছ ধরবার নেশায় মেতে একটু বেশি জলে হড়কে, গিয়ে পড়েছিল রাইমণি। তাতে কিছু হতো না, ওরা সাঁতরায় পানকৌড়ির মতো, কিন্তু হঠাৎ কী করে যেন জলের ভিতরকার শ্যাওলা আর শালুক-ডাঁটায় আটকে গেল পা। নিম্মলা কিম্বা ডাঙার ছেলে-মেয়েরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না।

নিম্মলা চেঁচিয়ে বললে,—এই দেখ, গামছা ছেড়ে দিলি কেন রাইমণি ?

রাইমণি তখন প্রাণপণে জল ঠেলে মুখ তুলবার চেষ্টা করতে লাগলো, নিঃশ্বাস নেবার প্রয়াস করতে লাগলো। তার হাতের গামছা কোথায় হারিয়ে গেল, বা কী হলো—সে সম্বন্ধে তার চেতনাই বা থাকবে কী করে ?

ওরা জানে না, একটা মানুষ কিছুক্ষণ ধরে ওদের সবকিছু লক্ষ করছিল রাস্তার ধারের জামগাছটার আড়াল থেকে। মাঠে মেয়েরা যখন বলছিল,—'কালো মাণিক' আসছে,—তখন, কালনাগিনী-পথ দিয়ে ছোট একখানা লাঠি হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে হেঁটে আসছিল সেই ছ-ফুট লম্বা মানুষটি, যার নাম ফকির।

ফকির জামগাছের আড়ালে খানিকক্ষণ থম্‌কে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। রাইমণি মেয়েটার ভিজে চুল কোমর ছাপিয়ে গেছে, পরনে মাত্র গামছা, মেয়েটা সতর্ক থাকলেও সব সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারছিল না। আর তার সেই 'কুসুম-কোরক-যৌবন লাবণি'র দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতেই থম্‌কে তাকিয়েছিল ফকির।

মেয়েটি ডুবে যাওয়া মাত্রই ফকির জামগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছুটে নেমে পড়লো জলে।

'নিম্মলা' আর 'কচি-কাঁচা'রা হঠাৎ ওকে দেখে আঁতকেই উঠলো বলা যায়। ফকিরের সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। হাতের লাঠি ছুঁড়ে ফেলে সে ঝাঁপ দিলো জলে, ডুব দিলো, একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার। আর তারপরেই দেখা গেল চুলের মুঠি ধরে সে রাইমণিকে টান দিয়ে ঘাটের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

—কী হয়েছে ওর ? কী হয়েছে ?—গাম্‌ছা হাতে নিম্মলা ডাঙায় উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

নিস্পন্দ দেহটাকে পাঁজা কোলা ক'রে তুলে ধরলো ফকির, তারপরে বললো,—কোথায় এর ঘর ? বিষ্টি পড়তে শুরু করলো যে !

মাঠ-ঘাট ঝাপ্‌সা করে সত্যিই বৃষ্টি এসে গেছে। 'কুচো কাঁচা'দের দুতিনজন ছুটে যেতে লাগল মাঠের দিকে, 'বিষ্টির তীর-ছোঁড়া' উপেক্ষা করে।

—ও কী, ওরা যায় কোথায়?

নির্ম্মলা বললে,—রাইমণির মাকে ডাকতে।

নিজের হাতের ওপর শায়িতা নিস্পন্দ রাইমণির দিকে তাকিয়ে ফকির বললে,—নাম বুঝি রাইমণি?

নির্ম্মলা প্রায় কেঁদে ফেলেছে ততক্ষণে। বললে,—কী হয়েছে ওর?

—অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখছো না? ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

—অজ্ঞান হলো কেন?

—জলে ডুবে গেল দেখলে না?

নির্ম্মলা ডুকরে কেঁদে ওঠে এবার। ফকির বলে,—চুপ চুপ। তোমার হাতের গামছাখানা দাও, ওর শরীরটা ঢেকে দেওয়া উচিত, নয় কী?

নির্ম্মলা এগিয়ে এসে ওর বুকের ওপর গামছাখানা বিছিয়ে দেয়। ফকির বলে,—চলো, ঘরের দিকে চলো।

—ওর মা আসুক?

ফকির বললে—আসুক। কিন্তু ততক্ষণে একে কোনও ঘরের দাওয়ায়—টাওয়ায় রাখি গিয়ে, চলো। ওর জ্ঞানটা ত ফিরিয়ে আনতে হবে?

কালো পথ আর নয়ানজুলি,—এর নিকটতম যে কুটিরখানি, তার দরজায় তালা ঝুলছে। ফকির মেয়েটাকে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলো সেই দাওয়ায়। কুঁচোকাঁচাদের কিছু ছুটেছিল মাঠের দিকে, কিছু ভীড় করে রাইমণিকে ঘিরে ধরলো। ফকির বললো,—সরে দাঁড়াও।

তারপরে, নির্ম্মলার দিকে তাকিয়ে বললে,—ওর গা-হাত পা মুছিয়ে দাও ত?

নির্ম্মলা চোখের জল মুছে ওর গা-হাত-পা ভিজেচুল যতদূর সম্ভব মুছিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় মাঠের সেই মেয়েগুলো ছুটোছুটি করে এসে পড়লো। ওদের মধ্যে যেটি রাইমণির মা সে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মেয়ের ওপর দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে। আর, অন্য মেয়েরা কেউ মাথায় ঘোম্‌টা টেনে দিলো, কেউ আঁচল সাম্‌লালো। একটি বউ ত ফকিরকে দেখে মুখে বলেই ফেললো,—ওমা, এ কে গো?

ফকির রাইমণির মাকে আশ্বস্ত করলো। বললে,—শালুকের নালে পা জড়িয়ে গিয়েছিল, নইলে ও কী জলে ডেবার মেয়ে? পেটে জল কিছু গেছে। ঘর কত দূর?

এতক্ষণ পরে বোধ হয় চেতনা হয় রাইমণির মায়ের, মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে,—কাছেই।

—ওকে ঘরে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

বলে, মেয়েটাকে দুই সবল বাহুতে তুলে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গ্রামের ভিতরকার পথ ধরে চলতে থাকে ফকির। মেয়েদের দল ঘটনার আকস্মিকতায় এমন মুহ্যমান হয়ে পড়েছে যে, লোকটা কে, কোথা থেকে এলো, কী সে করতে যাচ্ছে, এসব তাদের চিন্তা করবার অবকাশও হলো না।

একটুখানি এগিয়েই রাইমণিদের ঘর। তিৎপল্লার বেড়াটা হাওয়ায় আর জলের ঝাপ্টায় একটু কাৎ হয়ে পড়েছে, উঠোনে জল পড়ে পড়ে বেশ কাদা হয়েছে, তার মাঝে মাঝে ইট পাতা। রাইমণির মায়ের নির্দেশে সেই ইটের ওপর পা ফেলে ফেলে সন্তর্পণে মেয়েটাকে নিয়ে এসে নিচু দাওয়াটায় উঠলো ফকির।

ঝুপ্ড়ি মতো ছোট্ট একখানা ঘর, দাওয়া বলতে উঠোন থেকে সামান্য উঁচু মাটির ঢিবি। তার ওপরে ছেঁড়া চাটাই আর বালিশ এনে রাখতেই মেয়েটাকে শুইয়ে দিলো সে। বাইরের মেয়েরাও ভীড় করে ঢুকছে, তার মধ্য থেকে দুই 'মানবক-মানবিকা' দাওয়ায় উঠে ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়ালো। অন্য কুচোকাঁচা'দের তাড়ালেও ওদের কেউ তাড়ালো না। তাই অনুমান করা যায় এরা দুটি রাইমণিরই ভাইবোন।

নিম্মলা সম্ভবতঃ রাইমণির খেলার সাথী, সে ভীড় ঠেলে ঠেলে ঠিক গুটিগুটি রাইমণির শিয়রে এসে বসলো। ভীড় থেকে কে একজন বললে,—হাসপাতালে নিয়ে গেলে হতো বাপু।

ফকির মুখ তুলে বল্লে,—কতদূর হাসপাতাল ?

—তা হবে কোশ ডেডেক।

ফকির বললে—কোশ ডেডেক ওকে নিয়ে কে এখন হাঁটবে ? দেখ, আমিই ঠিক করে দিচ্ছি। পেটে জল ঢুকেছে, বার করে দিতে হবে। মেয়েটাকে উপুড় করাও ত তোমরা কেউ, আমি দেখছি।

বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই —নানান্ প্রক্রিয়ার পর মিশকালো' লোকটা হাসপাতালের ডাক্তারের মতোই কাজ করলো। মেয়েটা চোখ খুললো, কে যেন দুধ গরম করে মুখে ঢাললো, ঢক্ঢক্ করে খেলো, আর তারপরে উঠে বসলো। চারিদিকে তাকালো, তারপরে নিজের দিকে চোখ পড়তেই ধড়ফড় ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল।

—অতো জোরে ছুটিস না লো, মাথা ঘুরে ভিমি যাবি।—কে যেন ভীড় থেকে বললে।

'নিম্মলা'ও তৎক্ষণে যেন 'সম্বিৎ' ফিরে পায়। পরনের ভিজে গামছাটা

গায়ে গায়ে প্রায় শুকিয়ে গেছে, আর ত তক্ষণে বৃষ্টিও একটু ধরেছে, সে ছুটে ওদের সীমানা থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল।

ততক্ষণে মেয়েদের ভীড়ও স্বচ্ছ হওয়ার কথা। কিন্তু, তাদের মধ্যে 'মিশকালো লোক টাকে দেখা অবধি যে 'গুঞ্জন' শুরু হয়েছিল, তা এবারে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। 'কচি-কাঁচা'দের কাছ থেকে যতোটা জেনে নেবার ততটা জেনে নিলেও পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে না। 'মেয়ে' ভালো হয়ে ওঠ্‌বার পর 'গুঞ্জন' যেন ক্রমশঃ অভিযোগের পর্যায়ে উন্নীত হলো। লোকটা যেন এ-বাড়িতে কতো এসেছে-গেছে, এমনি ভাবে আধ-বোজা চোখে দাওয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। রাইমণির মা ঘরে মেয়েকে শাড়ী-টাড়ি পরাচ্ছে বোধ হয়। ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা যাক,—হ্যাঁ গা, রাইয়ের মা, লোকটা কে?

আরেক জন ফিস্‌ফিসিয়ে বললে,—লোকটা এ-গাঁয়ের কেউ নয়, আশ-পাশের গাঁয়েও ওকে দেখেছি বলে মনে হয় না। লোকটা ভিন্‌দেশী।

—এখানে এসে জুট্‌লো কেমন করে?

অপর একজন তেমনি নিম্নকণ্ঠে বললে,—কেমন ডাকাবুকো চেহারা দেখেছো? বুকে আবার ভালুকের মতো লোম।

চাপা গলায় 'হিস-হিস' করে হেসে উঠলো সবাই। একটি মেয়ে বললে,—খালি গা, পরনের ধুতিটাও ভিজে। রাইয়ের মাকে বলো না, একখানা শুক্‌নো ধুতি এনে পরতে দিক্‌।

আবার চাপা হাসির ঢেউ বয়ে গেল। অন্য একজন টিপ্পনী কাটলো,—রাইয়ের মা ধুতি কোথা পাবে? কোলের গুঁড়োটা ত সাত বছরের। এখনো ধুতি পরবার বয়স হয় নি।

—কত্তার নেই এক-আধখানা?

আরেকটি মেয়ে বললে,—কত্তা ত 'নিরু দ্দশ' আজ সাত বছর। কোলের-টাকে নিয়ে ঘরে ফিরলো হাসপাতাল থেকে, মনে কতো আহ্লাদ, দুই মেয়ের পর এক ছেলে। ওমা, ঘরের কত্তা ঘরে নেই, সেই যে 'উধাও' হলো আর কি 'পাত্তা' মিললো তার? রাইয়ের মার ত চোখের জল চোখেই শুকিয়ে যায়।

বর্ষিয়সীটি বললে,—তুই 'প্যাঁচাল' ছাড় দেখি। যেন কলের গান বাজাতে শুরু করেছে! ঘ্যানোর-ঘ্যানোর-ঘ্যানোর!

আবার হাসি। অথচ, যাকে কেন্দ্র করে এই হাসি, সে কিন্তু দেওয়ালে মাথা রেখে দিব্যি চোখ বুজিয়ে রেখেছে। একটি মেয়ে আবার মুখ খুললে,—তা' বলি দিদি, ঘরে কত্তার ছেঁড়া কানিও ত থাকতে পারতো?

'দিদি' সাড়া দিলো না। সাড়া দিলো আরেক জন, বললে.—জন মজুরী খেটে খেতো, ক'জোড়া ধুতি ছিল শুনি? যা-দু-একখানা ছিল, রাইয়ের মা তা সাত বছরে প'রে প'রে ছিঁড়েই ফেলেছে।

আরেক জন বললে,—তোদের মাথাব্যথারও বলিহারি যাই। ঘরে গিয়ে বল্‌গে, না হয় একটা শাড়ীই বার করে দিক লোকটাকে।

অপর একজন লোকটাকে নিবিষ্ট মনে দেখ্‌ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ পাশের বউটার গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে বলে উঠলো,—ও দিদি, ঐ দেখ, লোকটার বোজা চোখের কোণে জল।

—অ্যাঁ!

মেয়েগুলো সবাই বিস্মিত হয়ে লোকটার দিকে তাকালো,—সে কী গো! অমন দশাসই পুরুষ—অমন লম্বা—অমন চওড়া,—অমন একমাথা কালো কুচ্‌কুচে বাব্‌রী চুল,—সেও কি না কাঁদে?

রাইয়ের মা বাইরে এলো এতক্ষণে। বললে,—মেয়ে ভালো আছে দিদি। খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলাম, বেড়ে-টেড়ে নিয়ে তিন ভাই বোনে খাবেখন। চলো-চলো মাঠে যাই—এখনো অনেক কাজ পড়ে আছে!

কাছের বউটি চোখের ইঙ্গিতে লোকটিকে দেখালো। রাইমণির মা বছর ত্রিশ বত্রিশের একটি আঁটোসাটো-গড়নের সাধারণ মেয়েমানুষ, তার ধারণা ছিল, লোকটি এতক্ষণে চলে গেছে। তার বদলে, সে যে তখনো তার দাওয়ায় চুপ্‌টি করে বসে আছে, এটা সে ভাববে কী করে?

—ও মা!—বলে চম্‌কে উঠে সে দু-পা সরে এলো বউদের ভীড়ে।

একজন বললে,—কী গো, চেনা মানুষ নাকি?

—সে কী। চেনা মানুষ হবে কেন!—চোখদুটি যেন 'কপালে' উঠে যায় রাইমণির মা—কমলমণির।

বউরা রঙ্গরসের সুযোগ পেলে ছাড়তে চায় না। একজন বললে,—চেনা মানুষের মতো কেমন দাওয়ায় ঠেস দিয়ে ব'সে আছে, আর বলছো, চেনো না?

অন্য একটি বউ কিন্তু পরিহাস করলো না, বরং গম্ভীর সুরেই বললে,—লোকটা তোমার দাওয়ায় বসে কাঁদছে গো, দিদি।

—কাঁদছে! কেন?

অপর একজন বললে ঠাট্টার সুরে,—দেখ, সাত বছর পরে তোমার কত্তাই ফিরে এলো নাকি?

—ছিঃ—ছিঃ। তা কেন হবে?

বর্ষিয়সীটিও চাপা কণ্ঠে ঝংকার দিয়ে উঠলো,—দূর ছুঁড়ী। সে-লোক কেন হবে? সে কী অতো ঢ্যাঙা ছিল? না, কি অতো চওড়া ছিল তার বুকের ছাতি? বলি, এই সাত বছরের মধ্যেই কি সব আমরা ভুলে বসে আছি? দিব্যি গৌরবর্ন্ন চেহারা, রাইমণির কান্তিও অতো ফরসা হয়নি বাপের মতো।

কমলমণি লোকটাকে এ-যাবৎ মনস্থির ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার অবসর পায়নি। মেয়ের কী হলো, সেটা ভাববে? না, অন্য কিছু ভাববে? এবার দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা কথা তার মনে 'ছ্যাৎ করে উঠলো। পাশের বর্ষিয়সীর বাহু আঁকড়ে সে বলে উঠলো,—ও দিদি, আমি চিনেছি।

—কে লো?

ওকে ঘিরে সবাই মুহূর্তে প্রায় গোল হয়ে দাঁড়ালো বলা যায়। কমলমণি একটু দম নিয়ে তেমনি 'ফিস্‌ফিস্' করেই বললে,—তিন বছর আগে যখন আমাদের পাড়ার নয়ান-জুলিটা খোঁড়া হয়, তখনকার সব মনে আছে ত? এই লোকটাও মাটি কাটতে এসেছিল ভিন গাঁ থেকে। আমাদের দিকে খালি খালি নজর করতো মনে আছে?

—অ্যাঁ।—মুহূর্তে যেন পট-পরিবর্তন হয়ে গেল। কোনো কোনো বউ আর দাঁড়ালো না, নিমেষে দুদ্দাড় করে একেবারে দৌড়। এবং তারই শব্দে বোধকরি লোকটা একটু চমকে উঠলো, সে চোখ খুললো। বড়ো-বড়ো দুটো চোখ, লাল-লাল দেখাচ্ছে। লোকটা বাহু দিয়ে চোখের জল মুছলো, তারপরে, একটু কেশে নিয়ে গলা পরিস্কার করে বললে,—হ্যাঁ, আমিই সেই। তিন বছর জেল খেটে ফিরছি।

—ও, মা গো।—মুহূর্তের মধ্যে, আর যারা ছিল, তারা সব পালালো, শুধু কমলমণি আর সেই বর্ষিয়সী মেয়েমানুষটি ছাড়া। বর্ষিয়সীটি মাথার ঘোমটা একটু উঠিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো,—বেশ মানুষ ত তুমি, গাঁয়ের মরদরা গাঁয়ে নেই দেখে দিব্যি সটান গাঁয়ের ভিতর ঢুকে এলে? বউ-ঝিদের লাজ লাগবে না তোমাকে দেখে?

লোকটি সোজা হয়ে বসলো,—এসেছিলাম বদলা নিতে, কিন্তু বদলা নেওয়া হলো না, লাঠিটা কোথায় পড়ে গেছে। সেই 'মায়ের থান' থেকে সোজা হেঁটে আসছি, দেহ আর বয় না, ইচ্ছে করছে দাওয়ার ওপর গড়িয়ে পড়ি। তোমরা ত মাঠে যাবে? যাও না? জিনিসপত্তর খোয়া যাবে না, আমি কথা দিলাম।

'মায়ের থান' অর্থাৎ 'অম্বিকা-কালনা।' এই এতদূর সত্যিই সোজা পথ নয়। এই 'অজগর পথ' হেঁটে এসেছে কিনা 'বদলা' নিতে? কী সাংঘাতিক লোক গো! বর্ষিয়সী বললে,—শুতে চাও, অন্য ঘরের দাওয়ায় যাও। রাস্তার

দিকে 'কামার ঘর' পাবে, বাইরে থেকে তালা বন্ধ? সেখানে গিয়ে ব'সো। বউমানুষের ঘরের দাওয়ায় জানা নেই শোনা নেই—তুমি থাকবে কী লজ্জায়, শুনি?

লোকটি হাসলো, বললো,—মেয়েটাকে জল থেকে তুললাম, তারও ত একটা 'ইনাম' বলে কথা আছে দিদিঠাকরুণ।

—আমরা 'গরীব-গুরবো' মানুষ, আমরা কী ইনাম দেবো? পরের ক্ষেতে খেটে খাই।

কমলমণি কথা বলেনি কিছু। এতক্ষণে, ভিতর থেকে নীল একটা শাড়ী পরে রাইমণি উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। রাইমণির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে লোকটি বললো,—মেয়েটাকে এই দুই হাতে কোলে তুলেছি, বলতে পারো মেয়ের সব্ব অঙ্গ আমার হাতে মাখামাখি,—আর কি আমাকে পর বলা যায়?

—ও মা গো!—অস্ফুট একটা উক্তি করে উঠলো কমলমণি। রাইমণি ঘরের অন্ধকারে মুখ লুকালো।

বর্ষিয়সী বললে,—ঘেন্না-ঘেন্না! তুমি বাপু বাইরেই যাও, পাড়ায় মরদ বলে কি 'বুড়ো-হাবড়া' কেউ নেই? টের পেলে তারাও ছুটে আসবে, হৈহৈ বাঁধলে রাস্তার উল্টো কিক্‌কার গাঁ থেকে 'পাখিরা'-বাড়ির ছেলেরাও আসতে পারে, তারা 'বড়োনোক,'—তারা কেউ না কেউ বাড়িতে আছেই।

লোকটি হয়ত উঠ্‌ছিল, 'পাখিরা'-বাড়ির নাম শুনে আবার বসে পড়লো। বললে,—আসুক। বিশেষ করে সেই ছেলেটা আসুক, যার মাথায় আমি লাঠি বসিয়েছিলাম।

বর্ষিয়সীটি হাঁউমাউ' করে উঠলো, বললো,—ও বাবা, কী ডাকাবুকো লোক গো, আবার লাঠালাঠি বাঁধাতে চায়?

লোকটি বললে,—ঘেন্না-ঘেন্না—লাঠি আমি ফেলে দিয়েছি। আমি শুধু জানতে চাই,আমাকে সবাই 'অ-কথা কুকথা' বলে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল কেন? আমি কী দোষ করেছিলাম?

বর্ষিয়সীটি কী যেন উত্তর দিতে গিয়েছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে এই এতক্ষণ পরে কথা বলে উঠলো কমলমণি, বললে,—দিদি, তুমি কাজে চলে যাও ত? আমি লোকটার সঙ্গে কথা বল্‌ছি।

লোকটা অম্‌নি কলরব তুললো—কী খালি 'লোকটা লোকটা' করছো? আমার নাম—ফকির।

কমলমণি বর্ষিয়সীকে তখন প্রায় ঠেলে বার করে দিয়েছে বলা যায়।

স্ত্রীলোকটি একটু অবাকও হলো বিরক্তও হলো। বললে,—তোর বুকে কি ভয়-ডর নেই, হ্যাঁ রে কমল ?

কমলমণির ভাব দেখে মনে হলো. সে ভিতরে-ভিতরে রীতিমত উত্তেজিত, বললে,—ভয়-ডর থাকলে আমার চলে ? সাত-সাতটা বছর তিনটে বাচ্চাকে বুকে করে কীভাবে মানুষ করেছি, তুমি জানো না, দিদি ?

—জানি না ?

—তাই বলি, এখন তুমি যাও, লোকটাকে সজুত করতে আমি একাই যথেষ্ট।

বর্ষীয়সীটির চলে যাওয়ার অপেক্ষা না রেখেই আগড়টা ঠেলে দেয় কমলমণি। আগড়ের ধাক্কায় ঈষৎ-কাৎ-হয়ে-পড়া তিৎপল্লার বেড়াটা মুহূর্তের জন্য থর থর করে কেঁপে ওঠে। আকাশ ভেঙে তখন জল ঝরছে না বটে, কিন্তু মেঘের ঘেরাটোপ তখনো বিদ্যমান। নিকষ কালো রঙটা মুছে গিয়ে মেঘের রঙটা তখন সাদা-সাদা দেখাচ্ছে। সুরসিকদের ভাষায় 'পান্তুয়া ভাঙা মেঘের রঙ। বাইরে কালো-পানা ভিতরটা সাদা, তার থেকে চিনি-চিনি রস যেন উছলে পড়ছে!'

কোমরে হাত রেখে লোকটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল কমলমণি, বললে,---পরের ঘরে ঢুকলে পুলিশ ধরে, এটা জানো না ?

লোকটা মাথা হেলিয়ে আবার ভর রেখেছে দেওয়ালে, অল্প একটু হেসে বললে,---না হয় পুলিশেই ধরবে, এ-আর নতুন কথা কী ?

কমল বললে, গাঁয়ের মরদরা ফিরে এলে যে চোরের মার খাবে ? সে ভয়টুকুও নেই ?

ফকির বললে, মার খাওয়ারও অভ্যেস আছে, কিন্তু খামোখা মারবে কেন ? কী দোষটা করলাম আমি ?

কমলমণির চোখ দুটো চাপা ক্রোধে যেন জ্বলতে থাকে, চাপা স্বরে সে বলে, —কী দোষ করেছো মনে পড়ছে না ?

ফকির বললে, তোমার মেয়েকে প্রাণে বাঁচিয়েছি, সেটা কী দোষ হলো ?

কমলমণি দাওয়ার কিনার পর্যন্ত চলে আসে, গলার স্বর নিচু, অথচ তীব্র, বলে, এটা ত আজকের কথা। আজকের বিষয়টা পরে বলছি। তিন বছর আগে কী করেছিলে ? লাগো নি আমার পিছু ? সব কথা কি আমি কাউকে খুলে বলেছি নাকি ?

ফকির সোজা হয়ে বসলো এবার, বললে, তোমরা কাজকর্ম করতে যেতে, তোমাদের চোখ চেয়ে দেখতাম। এর বেশি কি করেছি ?

—দেখাটা কি সবার ওপরই ঠিক ঠিক ছিল ? না, আমার ওপর একটু বিশেষ 'নেকনজর' ছিল, ঠিক করে বলো ত ?

ফকির একটা হাই তুলে তুড়ি দিলো, তারপরে বললে, 'নেকনজর' ছিল কিনা বলতে পারবো না, তবে, সবার মধ্যে তোমাকেই চোখে পড়তো বেশি। দেখতে শুনতে ভালোই ত ছিলে।

যেন এবার জ্বলে উঠলো কমলমণি, বললে, হতভাগা মানুষ, পরের বউকে অমন চোখে দেখতে গিয়ে তোমার একটুও লজ্জা হলো না?

লোকটা হাসলো, বললো—এটা আমাকে শুধিয়ো না, শুধাও তাঁরে, যিনি আমায় ছিষ্টি করেছেন।

বলতে বলতে লোকটা এবার উঠেই পড়লো, তারপরে বললো,—কিন্তু ঠাকরুণ, এবার একটা কথা বলি। তোমার কোনো ডর নেই, যে-চোখে তিন বছর আগে তোমাকে দেখতাম, সে-চোখে আর তোমাকে দেখবো না।

—তবে? অন্য দিকে চোখ পড়েছে বুঝি?

লোকটা তেমনি বাঁকা হাসলো, বললে,—তা, পড়ুক না? তোমার ত আর ভয় নেই।

বলতে বলতে এগিয়ে গেল আগড়ের দিকে। ভিতর থেকে রাইমণিও এই সময় আবার উঁকি দিতে লাগলো।

কী মনে ক'রে কমলমণি হঠাৎ বলে ফেললো,—চললে কোথায়?

লোকটা মুখ ফেরালো, বললে,—যাই, ধারে-কাছে কোথাও ডেরা-ডাণ্ডা খুঁজে নিতে হবে। অতদূর থেকে রোজ-রোজ হেঁটে আসা ত আর সোজা নয়?

—ঘর কোথায় তোমার?

ফকির বলে,—ঘর কোথাও নেই বলেই ত ঘর খুঁজি।

কমল বলে,—তা বলে এই ঠাঁই যেন কখনো খুঁজতে এসো না, বিপদে পড়বে।

ফকির আর কিছু না ব'লে আগড় ঠেলে বাইরে চলে গেল।

চলে গেল বটে, কিন্তু সেই থেকে গাঁয়ের এ-পাড়ায় শুরু হলো মহা উৎপাত। মরদরা একে একে ফিরে এলো বিকেলের দিকে। শুরু হলো জটলা। সড়কের ওপার থেকে 'পাখিরা বাড়ি'র 'কানাই পাখিরা'-ও এলো। সে বললে,—মাথাটা কেউ তার দু-ফাঁক করে দিতে পারলে না।

পঞ্চায়েতের এক বুড়ো বললে,—দোষটা সে কী করেছে শুনি?

কানাই তার মাথার দাগটি দেখালো, বললে,—এখনো বলছো কী দোষ সে করেছে?

বুড়ো বললে,—সে ত তিন বছর আগেকার কথা।

আরেক বুড়ো বললে,—তার জন্য ত জেলও সে খেটে এলো, বাছা।

কানাই আর কিছু না বলে গজ্‌রাতে থাকে।

অন্য বুড়ো বলে,—কমল-বউয়ের মেয়ে ত ম'রেই যেতো, তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, সে-কথাটাও ভুলো না।

কানাইয়ের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। কিন্তু, সে ধনী গৃহস্থের সন্তান, তার স্বাভাবিক 'দেমাক' যাবে কোথায়? বললে,—আর যদি কখনো তাকে এদিকে আসতে দেখি—

তাকে বাধা দিয়ে এক বুড়ো বললে,—এ-তুমি মিছে তড়পাচ্ছো। এলেই কী করতে শুনি? সরকারী রাস্তা—সবারই সমান হক্ আছে চল্‌বার, বুঝলে? কী বলেন 'পাখিরা' মশাই?

'পাখিরা-মশাই' মাতব্বর ব্যক্তি, কানাইয়ের পিতৃদেব, তিনি তাঁর টাকপড়া প্রবীণ মাথাটি নেড়ে বললেন,—দাগী আসামী, সাবধান থাকাই ভালো।

—সে ত নিশ্চয়। চোখে-চোখে রাখতে হবে বই কী।

—পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে যদি সেইরকম ফষ্টি-নষ্টি করে—সুর ভাঁজে?

—তাহলে, আবার পিছ্‌মোড়া ক'রে বেঁধে উত্তম-মধ্যম দিতে হবে।

—ঠিক কথা। দরকার হলে পুলিশ ডাকতে হবে।

এইরকম দু'দিন ধ'রে 'বৈঠক' বস্‌ছে ঐ একটি লোককে কেন্দ্র ক'রে। আর, দু'দিন ধ'রে মাঠে কাজ করতে করতে মেয়েরাও আলোচনা করছে লোকটাকে নিয়ে। প্রথম দিকে রাগ, ঘৃণা, কিন্তু তারপরেই ওদের রসনা সরস হয়ে ওঠে। একজন বলে,—যাই বলো আর তাই বলো কমল দিদির দিকে 'টাঁক' আছে।

কথাটা শুনে অন্য সবাই মুচকি-মুচকি হাসলেও কমল ওঠে তেলে-বেগুনে জ্বলে, বলে,—নুড়ো জ্বেলে দেবো না মুখে? আঁশবটি দিয়ে নাক কেটে আন্‌বো।

এর পরে যে কথাটা জনৈকা সুরসরিকা ব'লে ওঠে, তা' আর লেখা চলে না, অশ্লীলতার পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।

হাসির ঢেউটা থেমে যেতে আরেক জন বলে,—দু-দুটো দিন কেটে গেল, 'ভমরা'র দেখা নেই যে?

বর্ষীয়সীটি এবার ধমক দেয়,—যা-সব জানিস না, তা নিয়ে গুয়ে-গুণাস কেন? আমি বেড়ায় আড়াল থেকে ওদের 'কথা-বাত্তা' শুনেছি। লোকটার কোনো 'টাঁক' নেই কমলের ওপরে, এই বলে রাখলাম।

কথাটার ছোঁয়া লাগে সবার মনে। কিছুক্ষণ সবাই নীরব হয়ে যায়, বোধ হয় এই কথাটাই তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে।

কে বুঝি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ বললে, ও দিদি ধনেশ পাখী উড়্ছে না ?

আর সবাই সঙ্গে সঙ্গে তাকায়, বর্ষিয়সী বলে, বক দেখে ধনেশ পাখী ভাবছিস ? ধনেশ পাখী আসে ধান পাকার মরসুমে।

অন্য একটি বউ বলে ওঠে, ধনেশ পাখী এলে তাদের তাড়াবার ব্যবস্থাও করা যাবে ঐ লোকটিকে দিয়ে। ঐ পাহাড়ের মতো চেহারা, মিশ্‌কালো রঙ্‌, ওকে দেখলেই পাখীরা পালাবে।

একজন মুচকি হেসে বললে, তাহলে ওকে আনাই সাব্যস্ত করো।

হাসির ঢেউ আবার ওঠে। কমলমণি বর্ষিয়সীকে চুপি চুপি বলে, ওদিকে এক কাণ্ড হয়েছে দিদি। মেয়ে ত ঘর থেকে আর বেরুতে চায় না। ওর সখী নিম্মলা এসে কাল ডাকাডাকি, কিছুতেই ঘর থেকে বেরুবে না। অথচ, না বেরুলে আমারই বা চলে কী করে ? দিন গেলে চার-চারটে প্রাণীর পেট। মাছ না ধরিস, শাকপাতাও ত তুলে আনতে পারিস ?

বর্ষিয়সী বলে, কেন রে, মেয়ের এত লাজ কেন ?

কমলমণি বলে, লাজ আর কতটা ? ভয়। বলে, লোকটা যদি এসে পড়ে ? লোকটার কথা ভাবলেই আমার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করে, দেখলে ত একেবারে ভির্মি যাবো।

—ভাবনার কথা।

তিন দিনের দিন লোকটাকে আবার দেখা গেল। একা নয়, চৌকিদারের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে আসছে। পাড়ার লোক দু'চার জন এগিয়ে গেল কথা বলতে। কী কথা হলো কে জানে। নয়ানজুলির আশ-পাশ থেকে কুঁচোকাঁচার দল 'দেছুট'। সেদিন আবার হয়েছিল কী, মায়ের তাড়া খেয়ে রাইমণি বেরিয়েছিল নয়ানজুলির দিকে। প্রথমটায় সে বুঝতে পারেনি, যখন টের পেলো তখন শাড়ীর আঁচল সামলাতে সামলাতে একেবারে যাকে বলে, 'দুদ্দাড় দৌড়।'

পিছন থেকে সেই লোকটি, অর্থাৎ ফকির, হেঁকে বললে,—ও রাইমণি দৌড়োও কেন, ও রাই ?

কে কার কথা শোনে ? মাঠ থেকে বউগুলোও নজর করছিল। এমন অবস্থা, যে, তারাও ছুটে পালাবে কিনা কে জানে ! কমলমণি তাদের আটকে দিলো। বললে; কী করবে লোকটা ? আমি আছি না ? সেদিন দাওয়া থেকে ওকে বার করে দিতে আমার কি লাঠি লেগেছিল ? কমলমণির 'সাপ-লক্‌-জিভ্‌'ই যথেষ্ট।

ফকির কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুর ঘুর করলো না, চৌকিদারের সঙ্গে আবার ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকে। এবং, মাত্র সেই দিনই নয়, তারপরে তাকে রোজই দেখা যেতে লাগলো সড়কের ওপর। শোনা গেল, চৌকিদারের ঘরে ও থাকতে আরম্ভ করেছে। চৌকিদার বলেছে,—দারোগাবাবু ফকিরকে শাসিয়ে দিয়েছে, কোনো চুরি বা কাজিয়া হলে আগে তিনি ওকেই বেঁধে নিয়ে যাবেন।

লোকটি নাকি হেসে তার উত্তরে দারোগাকে বলেছে,—হুজুর এক বাঘের এলাকায় অন্য বাঘ এসে উৎপাত করতে সাহস পায় না। বাঘেরও এলাকা 'বন্ধন' করা থাকে।

দারোগা নাকি বলেছিলেন,—ভালো কথা। কিন্তু, বাঘকেও সাবধান করে দিলাম। কোনো উৎপাত হলে আমার হাতে তার মরণ!

ফকির তখনো হেসেছে, বলেছে—হুজুর, বাঘের নখ-দন্ত সব গেছে, কোনো ভাবনা নেই।

এ-সব কথা বুড়োদেরও বৈঠকে হয়, মেয়েদের রাগ-রঙ্গের কালেও হয়। সুরসিকাদের একজন বলে,—কোন্ বাঘিনী আবার বাঘের নখ-দন্ত ভঙ্গ করে দিয়েছে দেখ!

সেই বর্ষিয়সীকে একান্ত ডেকে কমলমণি বলে—অ দিদি, মেয়ে যে আবার ভাবিয়ে তুললে! ঘর থেকে বেরিয়ে 'চান'-টুকুও করতে যেতে চায় না!

বর্ষিয়সী বলে,—আদিখ্যেতা! ধমক দে।

তা' ধমক ধামক দিয়ে মেয়েকে একদিন নয়ানজুলিতে পাঠাতে মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো। তখন ঠিক দুপুর বেলা, অবশ্য এই সময়ই 'লোকটা' ঘুর ঘুর করে। সে নাকি জামগাছটার আড়ালে লুকিয়েছিল, ঝপ্ করে সামনে এসে একটা ঝকঝকে পাথর, না পুঁতির মালা এগিয়ে দিয়েছিল ওর সামনে, বলেছিল, —এটা নেবে? নাও না?

কমল দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে রইল এক মুহূর্ত, তারপরে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে,—এইবার বুঝতে পেরেছি তোমার 'টাঁক' কার ওপর। শেষকালে ঐটুকু মেয়েটার ওপরে? হতচ্ছাড়া—হাড়হাবাতে!

কিন্তু বর্ষিয়সী সব শুনে ওকে বললে, খবরদার এ নিয়ে গোল করিস না। শেষকালে মেয়েরই একটা 'কলঙ্ক' রটবে। একে গরীব ঘর, তায় পাড়া-গাঁ বলে কথা!

—তা' বলে চুপ করে থাকবো?

বর্ষিয়সী কী যেন ভাবলে, তারপরে ওকে পরামর্শ দিলে, দুই কান হয়েছে,

তিন কান হবার দরকার নেই। তুই এক কাজ কর না? তুই ওকে গিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস কর, ওর মতলবটা কী! পারবি না?

—তা আমি খুব পারবো!

সেদিন, সারা সকালটা 'পিথিমী' সিক্ত করে আকাশটা একটু শান্ত হয়েছে, মেঘরা 'পাল পাব্বণে মেতে ওঠা' মবদদের মতো এ-ওর গায়ে ঢলে ঢলে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, এমন সময়, সেই জামগাছটার কাছে সোজা গিয়ে দাঁড়ালো কমলমণি ফকিরের মুখোমুখি। ফকির তখন উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি টান্‌ছিল। অদূরে একটা রাখাল ছেলে গাই-বাছুর তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কমলমণিকে আসতে দেখে থম্‌কে দাঁড়ালো।

প্রথমে তাকেই ধমক দিলো কমলমণি,—এই ছোঁড়া, ভাগ, কী দেখ্‌ছিস এদিকে?

ওকে দেখে ফকির ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কমল সোজা তার দিকে তাকিয়ে বললে, চিনতে পারো?

—খুব?

কমলের বুকখানা ঘন ঘন ওঠা-পড়া করছে রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে, বললে, শেষকালে আমাকে ছেড়ে আমার মেয়ের দিকে? ছি-ছি!

ফকিব অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। সেই বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকানোর ভাবটা দেখে আরও বুঝি জ্বলে উঠলো কমলমণি, বললে, হায়া নেই তোমার? নিজেব বৌ ছেলে নেই?

উত্তরে ফস্ করে বলে বসলো ফকির,—ছিল, বৌ ছিল, আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে আজ অনেকদিন। তা' হবে, সাত সাতটা বছর হবে। কোথাও খুঁজে পাই নি।

কমলমণি আর কিছু বলতে পারে নি, একপ্রকার দ্রুত হেঁটে পালিয়েই চলে এসেছিল বলা চলে। বর্ষিয়সী জিজ্ঞাসা করেছিল,—কী হলো?

কমলমণি বলেছিল, ঠিক বুঝলাম না।

—দেখ আর কয়েকটা দিন!

রাইমণি আর বেরোয় না। ওদিকে 'শাওন' চলে গেল, 'ভাদ্র'ও যায়-যায়, দিক্‌বিদিক জলে টইটম্বুর! শোনা যায়, লোকটা তবু আসে। ঐ সড়ক দিয়ে হেঁটে যায়, এই পর্যন্ত। গাঁয়ের লোক ওঁৎ পেতে আছে, একটা কিছু বিসদৃশ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে লোকটাব ওপরে, মায়া-দয়া-ক্ষমা বলে তখন আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু, আশ্বিনের বাজনা বাজতে-না বাজতেই শোনা গেল এক অদ্ভুত খবর। কানাই পাখিরার সঙ্গে সেদিন নাকি মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছিল লোকটার। তার আগে. মুখে যতোই আস্ফালন করুক. পারতপক্ষে কানাই কখনো সামনে পড়তে চাইতো না তার। সেদিন হঠাৎই দেখা হয়ে গিয়েছিল। লোকটা নাকি কানাইকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলে. মাথাটা দেখি ?

—দেখে কী করবে ?

লোকটা হেসে নাকি বলেছিল. নিজের পাপের 'চেহ্নটা' একবার দেখবো না ?

—পাপ !

লোকটা বলেছিল. পাপ নয় ? রাগটা পাপ. হিংসেটা পাপ, কু-নজরটাও পাপ।

কানাই কথাটা শুনে এতো অবাক হয়ে গিয়েছিল. যে. কোনো কথাই বলতে পারে নি। তা পরে অবাক কাণ্ড, কানাই নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলো—কী করো তুমি ?

—জনমজুরী।

—কোথায় ?

—যে-দিন যেখানে জোটে। একটা পেট চলে যায়।

—কেউ নেই তোমার ?

—না।

পরে শোনা গেল আরও 'সাংঘাতিক' 'মারাত্মক' 'অবিশ্বাস্য' ব্যাপার। পাখিরাদের যে ইঁটখোলা আছে পূবপাড়ার মাঠ পেরিয়ে কানা নদীর ধারে, সেখানে ওরা কাজ দিয়েছে লোকটাকে। আরও অদ্ভুত কাণ্ড. লোকটা নাকি 'পাখিরা'দের বাড়িতেই থাকে।

মেয়েরা 'ঢুধেল ধান'-এর মাঠে 'নিড়ুনী'র কাজ করতে করতে বলে, কী সব্বনাশ! 'পাখিরা'রা যে ভীষণ বড়লোক।

—তাই ত।

—মতলবটা কী ?

দিনকতক পরে মেয়েরাই আবিষ্কার করলো ব্যাপারটা। রাইমণির লোকটিকে দেখে ভয় পেয়ে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে পালানো, লোকটারও রাইমণির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা—মেয়েদের কি আর এসব কিছু বুঝতে বাকি থাকে ? 'আশ্বিন' গেল, 'কার্তিক' গেল, 'আঘন' মাস প'ড়ে গেল, মেয়েরা কানাকানি ছেড়ে এবার মুখর হয়ে উঠলো, বললে,—ও কমলমণি, দাও না মেয়েটাকে লোকটার সঙ্গে 'জটকে'।

ফোঁস করে ওঠে কমলমণি,—ওমা, মেয়ে কি আমার 'ফ্যালনা?' অমন মুখ-চোখ, গড়ন, গায়ের রঙ দেখাও দেখি?

বর্ষিয়সী পরে ওকে বোঝালো—কথাটা উড়িয়ে দিস নি। একবেলা খাস, একবেলা ত পেটে কিল মেরে পড়ে থাকিস্। লোকটি পাখিরাদের নজরে পড়েছে, রুজি-রোজগার করে, দশাসই চেহারা, বয়স মেয়ের আন্দাজে একটু বেশি, কিন্তু তাতে কী হয়েছে? আখন পড়ল, 'দিন' দেখে বিয়ে দিয়ে দে।

কমলমণি কথাটা শুনে দিনকতক 'গুম্' হয়ে রইল, 'হাঁ'ও বলে না, 'না'ও বলে না। লোকটা সড়কের ধার দিয়ে ঘুরঘুর করে আজকাল বিকেল বেলায়। মেয়েরা নয়ানজুলিতে গা ধুতে যায়. কিন্তু তাকে দেখে আজকাল আর পালায় না, লজ্জাও করে না তেমন। একজন সুরসিকা ত এগিয়ে গিয়ে একদিন ওর সঙ্গে কথাই বলে বসলো। বললে—আমাদের গাঁ-টাকে শেষপর্যন্ত ভালোবাসলে?

লোকটা একটুক্ষণ থেমে উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, তা' বাসলাম।

সুরসিকা বলে,—মাঠে ধনেশ পাখী নামছে, আমরা আর তাড়িয়ে পারি না। তুমি একটু খাটো না কেন? দশাসই জোয়ান মানুষ।

এবং, সত্যিসত্যি দেখা গেল, লোকটা সকাল বিকেল-সারা দুপুর ক্ষেতটার আল-পথে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে,—হাঁই-হুস্-স্!

বড়ো-বড়ো ঠোঁট-ওয়ালা কুটিল চোখ ধনেশ পাখীগুলো উড়ে-উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে ছোট-খাটো বুলবুলির ঝাঁকও।

দিনকতক পরে, বর্ষিয়সার পরামর্শ নিয়ে মেয়ের মনও খানিকটা বুঝে কমলমণি গিয়ে দেখা করলো ওর সঙ্গে। ঝিল্‌মিল নীল আকাশের নিচে সাদা মেঘের ভেলার কিনারে কিনারে বিদায়ী সূর্যের আরক্তিম রেখাগুলি ফুটে উঠেছে! তারই পটভূমিকায় হেমন্তের শস্য-মঞ্জরীর মাঝখানে ফকিরের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো কমলমণি। বললে,—আমাদের সবার ইচ্ছে, তুমি রাইমণিকে বিয়ে করো।

লোকটি একটা বুনো পায়রার ঝাঁক তাড়াচ্ছিল তখন, বলছিল,—হুস্—ঝা—!

হঠাৎ থেমে গিয়ে কমলমণির মুখের দিকে তাকালো, তারপরে খানিকক্ষণ ধরে ভেবে নিয়ে বললে,—আচ্ছা দেখি। তোমার মেয়ের ভার আমিই নেবো।

'কথা' রেখেছিল ফকির! শুধু 'কথা রাখা' নয় অসাধ্য সাধন করা। যা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারেনি, তা-ই করে ফেললো সে। কা মন্ত্রে

পাখিরাদেরা বশ করলো কে জানে, ঘুঁটেকুড়োনীর মেয়ে হলো রাজ-রাজেশ্বরী, পাখিরাদের কুলবধূ। কানাই পাখিরার চাদরের সঙ্গে খুঁট বেঁধে রাইমণি একদিন সড়ক পার হয়ে চলে গেল শ্বশুরঘর করতে।

দিনকতক পরে। বিস্মিত-বিহ্বল কমলমণি একদিন নিভৃতে জিজ্ঞাসা করলো ফকিরকে,—তুমি সত্যি করে কী চাও বলো ত ?

ফকির একটু হেসে বললে,—যা চেয়েছিলাম, তাই ত করলাম। আর কিছু চাইবার নেই।

—রাইমণির বিয়ে তুমি চেয়েছিলে ?

হঠাৎ ফকিরের চোখে দেখা গেল জল, ধরাগলায় কোনক্রমে বললে,—সাত বছর আগে বউ পালিয়ে যায়। মনে মনে বউকেই খুঁজতাম। হঠাৎ দেখলাম রাইমণিকে, ওকে ছুঁলাম, ওকে দুহাতে তুলে জল থেকে ওঠালাম। আমার হাতে ওর সারা অঙ্গ মাখামাখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলো বুকের ভিতরটা। মনে পড়লো, বউ যখন পালায়, তখন ওর কোলে ছিল এক বছরের বাচ্চা মেয়ে। সেই মেয়ে এতদিনে আট বছরেরটি হয়েছে, আরও কয়েক বছর গেলে রাইমণির মতোই হবে। হয়তো রাইমণির মতোই নিষ্পাপ, রাইমণির মতোই সহজ, সরল ! ওকে—

লোকটা আরও কিছু হয়ত বলতো, কিন্তু পারলো না, তাড়াতড়ি মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

আর তারপর ? ঘরের ধান উঠতে লাগলো ঘরে। লোকটিকে আর দেখা গেল না।

শোনা যায়, কোন দূর দেশ থেকে সে বুঝি মাঝে মাঝে কানাই পাখিরাকে 'পত্তর' লেখে,—স্নেহের বাবাজীবন—

আর এদিকে, শীত কেটে গ্রীষ্ম আসে, গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা আসে, মেয়ের দল আবার মাঠে যায় 'রোয়াধান'-এর কাজ করতে আবাররঙ্গ পরিহাসে মেতে যায়, আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, আসছে লো, কালো মাণিক—।

ভ্রমরকুণ্ডলা

ভোরবেলায় এক পশলা বৃষ্টি হবার পর আকাশটা দিগন্তব্যাপী মেঘের বোঝা বুকে নিয়ে নিথর হয়ে আছে। বাতাস এসে ওদের ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টায় এলোমেলো চলছিল এতক্ষণ। এখন অপারগ হয়ে ঝিরঝির ক'রে বইতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড খরার পর বৃষ্টিপাত সুপ্রচুর হওয়ায় মাঠের ধানের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক, তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভুঁই-মজুররা মাঠে নেমে পড়েছে। কোথাও কোথাও চাষ হয়েছিল সেচের জলে, সেখানে রোয়ার কাজ করতে নেমে গেছে মেয়েরা। কয়েকজন ছোট চাষী বড় চাষীদের কাছে গিয়ে বীজধানের জন্য ধর্ণা দিয়েছে।

এধারে-ওধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কুটিরগুলো দাঁড়িয়ে থাকলেও গ্রামখানি খুব ছোট নয়। এ-অঞ্চলে এককালে বোধহয় বড় বড় বিল ছিল, তারই স্মৃতি বহন করছে গ্রাম তার নামের মধ্যে। গাঁয়ের নাম,—বিলে-সন্তোষপুর।

গাঁয়ের মধ্য দিয়ে কাঁচা এক সড়ক চলতে চলতে হঠাৎ একসময় মুখ ঘুরিয়ে একেবারে সোজা রেললাইন ঘেঁষা নতুন বড়ো সড়কের সঙ্গে মিশে গেছে। পাকা ধানের বোঝা নিতে বড়ো বড়ো লরীগুলো একেবারে গাঁয়ের ভিতরে চলে আসে আজকাল। যেখানে এসে লরীগুলো দাঁড়ায়, সেখানে কয়েকখানা দোকান গড়ে উঠেছে। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা,—তার সামনে বেঞ্চি পাতা, লোকজন সেখানে ব'সে চা আর সস্তা বিস্কুট খায়, মাঝে মাঝে তেলে ভাজাও পাওয়া যায়। তার পাশে সাইকেল মেরামতের দোকান। 'কেষ্টার দোকান' বললে একডাকে সবাই চিনবে। এ-দোকানে শুধু সাইকেল নয়, সেচের যন্ত্রপাতি খারাপ হলেও আগে ডাক পড়ে কেষ্টার। আবার যাদের 'ট্যানজিস্টি' আছে, তারাও অগতির গতি ঐ কেষ্টার কাছেই এসে হাজির হয়। কেষ্টা কবে যে কাছাকাছি শহরটা থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তা আজ তার কারুর স্পষ্ট মনে নেই। কেউ কেউ বলে,-হাড়-ডিগডিগে চেহারার ছেলে, এককুড়ি বয়সও হয়নি, কালো হাফপ্যাণ্ট আর ময়লা হাতকাটা গেঞ্জি পরে সাইকেলের "চাকায়" পাম্প্ করছে,-এতো সেদিনকার কথা। আজ দেখ সেই ছেলের গায়ে গত্তি লেগেছে, ঝাঁকড়া চুল, বড়ো জুলফি, হলদে ডোরাকাটা বাঘের চামড়ার মতো জামা, আর আঁটোসাঁটো কালো প্যান্ট,—মুখে বিড়ি নয়,

সিগারেট। পাশের চায়ের দোকান দিয়েছে হরি গোঁসাইয়ের ছেলে হারান, তার কাছ থেকে প্যাকেট্ প্যাকেট্ সিগারেট কিনে পয়সা পোড়াচ্ছে,—কালে কালে কতই না দেখবো!

সেদিন গাঁয়ের বড়ো মোড়লের জামাই ঘোতন এসে কেষ্টাকে বললে, দেখ দেখি ট্যানজিস্টিটা? আওয়াজ দিচ্ছে না একদম।

কেষ্টা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললে,—রাখো এখানে, দেখছি।

বলেই নিজের মনে বিড়বিড় করে,—কিনবি ত ভালো রেডিও কেন্, তা না সস্তায় কোত্থেকে এক মড়াখেকো যন্তর নিয়ে এসেছে দেখো না!

ঘোতন কেষ্টার মেজাজের হদিস করতে না পেরে পাশে হারাণের দোকানে গিয়ে বসে এক ভাঁড় চায়ের ফরমাস করলো।

এমনিভাবে সেদিন যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, আকাশে মেঘের খেলা দেখবার ফুরসৎ কারও নেই। গাঁয়ের কাঁচা সড়কের বাঁকের মুখে একটা ছোট্ট ঝিলের মতো। সেই ঝিলের ওপর বাতাস ঝিরঝির ক'রে বইতে বইতে এক প্রান্তে ফুটে থাকা শালুক-ফুলগুলিকে নিয়ে বারবার কৌতুক করছিল।

ঝিলের একধারে কয়েকটি কুঁড়ে। দু-ঘর কুমোর বাস করে সেখানে। জলধর কুমোর ভোরে উঠেই তার চাক ঘুরোতে আরম্ভ করেছে। হাতের কায়দায় ছোটছোট গেলাস উঠে আসছে। সেই গেলাস কেটে সে পাশে সাজিয়ে রাখছে। এমনি করে করে অনেকগুলি গেলাস তার তৈরি হয়ে গেল এর মধ্যে। নিজের কাজে এত তন্ময় ছিল জলধর যে দ্বিতীয় মানুষটির উপস্থিতি সে আদৌ অনুভব করতে পারে নি। হঠাৎ একসময় তার মনে হলো, তার ঠিক পিছনের দাওয়ার বাইরেকার খুঁটিতে হাত রেখে কে যেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

চমকে পিছন ফিরতেই তার হাত লেগে চাকের গেলাসটা টাল খেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ভেসে এলো চাপা একটা হাসির লহর। জলধর মুখ ফিরিয়ে দেখলো, খুঁটির ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বাতাসী। ময়লা শাড়ী পরা কিশোরী বয়সের মেয়ে, বুকের ওপর লাল ডোবা-কাটা গামছাটি মেলে দেওয়া,—মাথার একরাশ চুল পিঠের ওপর মেলা। হাতে কালো রঙের দুটি ক'রে রবারের চুড়ি ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার নেই।

—বাতাসী!

কিশোরী বাতাসী বছর তেরো-চৌদ্দর মেয়ে মাত্র, কিন্তু শাড়ী পরলে রীতিমত ডাগরডোগরটি দেখায়। জলধর ডাকে কোনো সাড়া না দিয়ে মিটিমিটি

হাসতেই লাগলো। জলধর তার তুবড়ে যাওয়া গেলাসটি চাক থেকে তুলে ওকে দেখাতে দেখাতে বললে,—দিলি ত কাজ নষ্ট ক'রে!

—বাঃ! আমি করলুম!

জলধর এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বললে,—তুই কাছে এলেই কেমন যেন আমার কাজের ভণ্ডুল হয়ে যায়!

ঠোঁট ফুলিয়ে মেয়েটি অভিমান ভরে বললে,—ঠিক আছে, আমি চললুম!

ব'লেই দুমদাম পা ফেলে পিছন ফিরে মেয়েটি চলতে শুরু করলো।

জলধর ডাকলো,—এই শোন-শোন বাতাসী, দাঁড়া।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? মেয়েটি এত আহ্বানেও সাড়া দিলো না, সোজা চলতে লাগলো ঝিলের দিকে।

গাঁয়ে সুদৃশ্য এক বড়ো যে কোঠা বাড়িটা দূর থেকে দেখা যায়, সেটি বড়ো মোড়ল, অর্থাৎ গাঁয়ের মাথা চরণ দাসের বাসগৃহ। নিজের মহলের বাইরেও চৌহদ্দির লাগোয়া কয়েকটি কুঁড়েঘর দেখা যায়। এই কুঁড়েতে থাকে তার কিছু অনুগত আত্মীয়-পরিজন। জামাই ঘোতন এখানে মাঝে মাঝে আড্ডা জমাতে এলেও তার থাকার যায়গা কোঠাঘরের মধ্যেই। ঘোতন যখন হারাণের দোকানে বসে চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে ব্যস্ত, তখন একটি মানুষ কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে চৌহদ্দির বাইরে চলে এলো। বারে বারে সে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। এই রকম মেঘভরা আকাশের ঘেরাটোপ যেন তাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারলো না। মানুষটি বয়সে তরুণ, পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না বয়স, ঈষৎ শীর্ণকায় এবং একটু লম্বা, গৌরবর্ণ মুখখানায় তাম্রবর্ণের ছাপ। মাথায় ঝাঁকড়া বড়ো বড়ো চুল, মুখমণ্ডল পরিষ্কার কামানো। ছেলেটি ও-বাড়ির আশ্রিতেরই একজন, তবে লেখাপড়া জানে বলে বাড়ির ছোটদের পড়ায় এবং মোড়লের ইটখোলায় গিয়ে মজুরদের কাজকর্মেরও তদ্বির-তদারক করে।

ছেলেটির নাম কিশোর। সে ধীর পায়ে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। অঞ্চলটা মানভূম, মাঠগুলো সমভূমি নয়, কোথাও কোথাও উঁচু নিচু, দেখলে মনে হয়, যেন আলঘেরা ক্ষেতগুলো থাকে থাকে সিঁড়ির মতো সাজানো। আরও দূরে তাকালে পাহাড়ের শ্রেণী চোখে পড়ে, ধূসর এক বক্ররেখায় দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, অতিকায় হাতির দল যেন যেতে যেতে থমকে থেমে আছে

কিশোর খানিকটা খেয়ালের বশেই এগিয়ে গেল। ঘর থেকে বার হবার সময় তার ইচ্ছা ছিল হারাণের দোকানের দিকে যায়, কিন্তু ঘরের বার হয়ে

বৃষ্টি ভেজা মাঠ আর কান্না-শেষে কোন কারণে খুশি-হওয়া কিশোরীর আয়ত-চোখের মতো আকাশ দেখে তার সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। সে পথ ছেড়ে মাঠের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো। পথে পড়ে বৃষ্টির জল পেয়ে উপচে-পড়া একটা বাঁধ বা দীঘি। এই দীঘির আশে পাশে কিছু গাছ-গাছালি। কিছু শাল, কিছু কেঁদ, দুটো আমগাছও আছে, আর আছে কিছু বাবলা গাছ। এই বাবলা গাছের তলা দিয়েই সধবার সিঁথির মতো লাল কাঁকরের সরু পথ এঁকে বেঁকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে চলে গেছে।

স্নান করবার জন্য বুকের ওপর গামছা ফেলে, পিঠের ওপর একঢাল এলো চুল মেলে দিয়ে বাতাসী এই বাঁধের ধারেই এসেছিল, কিন্তু কী ভেবে সে-ও ঐ সরু লাল পথ বেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল মাঠের দিকে। কিশোর তাকে দেখেনি। কিশোর দেখবার অনেক আগেই সে অবারিত মাঠের দিকে ছুটে গিয়েছিল। মাঠ ছাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে যেতে গেলে মাঝখানে একটা নালা পড়ে। সরু নালা, প্রায়ই তাতে জল থাকে না বললেই হয়। উঁচু পাড় থেকে খানিকটা নিচে নেমে গেলে যে ক্ষীণ জলের ধারাটা চোখে পড়ে, সেটা মানুষ এক লাফেই পার হয়ে যায়। আর জলের গভীরতা? পায়ের পাতা ডোবে না বললেই হয়।

অথচ, এই নামহীন ক্ষীণ জলধারা আকর্ষণেই সেদিন ছুটে গিয়েছিল কিশোরী বাতাসী, কারণ সে জানে, পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমলে, আকাশ ছাপিয়ে 'উবঝ্ ঝরণ' বৃষ্টি নামলে, ঐ ক্ষীণ দুর্বল জলধারাই তখন ভরা যুবতীর মতো দু কূল ছুঁয়ে প্লাবন বইয়ে কলোকল্ ছলোছল্ করতে করতে দুরন্ত বেগে ছুটে যায়।

অবিরল বৃষ্টির দিনে এই দুকূলপ্লাবিনী ভয়ঙ্করী স্রোতস্বিনীর রূপ যে কী হয়ে দাঁড়ায়, বাতাসী সে সংবাদ রাখে বলেই তাকে দেখবার জন্য চঞ্চল পায়ে ছুটে যায়। গিয়ে একটা কেঁদ গাছের নিচে চুপ করে দাঁড়ায়, দুর্দান্ত জলের তোড তখন কলোকল-ছলোছল রব তুলে উন্মত্তার মতো বয়ে চলছে। কিন্তু স্রোতের এ রূপ সে দেখবে কী, জলধারার ঠিক ওপারে আর একটি অভাবিত দৃশ্য দেখে সে কয়েক মুহূর্ত 'কাঠ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কে একটি লোক ওপার থেকে এপারে আসবার চেষ্টা করছে। লাল-সবুজ-দাগ-ওয়ালা নতুন শতরঞ্চি মোড়া একটি পুঁটলি সবুজ ঘাসের ওপর রেখে লোকটা পায়ের আঁটো প্যাণ্ট গুটিয়ে, জুতো খুলে, এপারে আসবে বলে পাঁচ কষছে!"

বাতাসী একটু সরে কেঁদ গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়ালো। কিন্তু লোকটির চোখ থেকে তার বুকের লাল গামছার রঙ্ বোধহয় এড়ায়নি, সে ওপার থেকে হেঁকে বললো,—চান করবেন বুঝি? করুন না? আমি পাশ কেটে ঠিক বেরিয়ে যাবো।

বাতাসীর আর লুকোনো হলো না। সে অবাক হয়ে ভাবলো, লোকটি বলে কী? 'পাশ কেটে ঠিক বেরিয়ে যাবো'—মানে? সে কি ভাবছে হেঁটে এপারে আসবে? নাকি সাঁতরে? লোকটা কে রে?—নিজের মনেই বাতাসী বললে—ভরা বর্ষার স্রোতকে চেনে না, এ কেমনধারা লোক?

লোকটি এবার জলে পা ডোবাবার চেষ্টা করলো, তারপর পা উঠিয়ে নিয়ে ওপারের বাতাসীকেই বুঝি বা লক্ষ করে বললো—নাঃ—জল আছে—প্যান্ট ভিজোতেই হলো। কোমর জল হবে, কী বলেন?

বাতাসী কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

লোকটি বললে.—চান করতে অসুবিধে হচ্ছে, না? দাঁড়ান, আমি এখ্খুনি পার হয়ে যাচ্ছি। তার আগে—

বলে, লোকটি হেঁট হয়ে তার সেই দড়িবাধা লাল-সবুজ সতরঞ্চিটির পুঁটলিটা হাতে তুলে নিলো। নিয়ে লোকে যেমন করে ইঁট ছোড়ে, তেমনি করে এপারে ছোঁড়বার ভঙ্গি করলো। বাতাসী আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলো,—এ কী করছেন?

সে ছোঁড়বার আগে মাঝপথে থেমে গেল. বললে,—কেন? ওপারে ছুঁড়ে ফেলছি!

—যদি জলে পড়ে?

সে ঠোঁট উল্টে বললে,—দূর! এক চিল্‌তি একটা নালা! আমি বোধহয় এক ছুটে লাফিয়ে পার হতে পারি!

বাতাসী চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলো। পরিপূর্ণ যুবতী-বয়স হলে তার প্রতিক্রিয়া হয়ত অন্যরূপ হতো, হয়ত ছুটে পালাতো, কিন্তু লোকটার কাণ্ড দেখে তার হলো দারুণ কৌতূহল! যৌবনের পরশমণি সবে-ছোঁওয়া শরীরে একটা সঙ্কোচের শিহরণ সে অনুভব করছে বটে, মনে হচ্ছে, কাজ কি বাপু নিরালা মাঠের মধ্যে লোকটির সামনে দাঁড়ানোর,—আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে, এ কেমনধারা লোক, ঐ স্রোত পেরিয়ে এপারে আসবার চেষ্টা করছে? লোকটা কি নতুন এসেছে গাঁয়ে? তাছাড়া, কাণ্ডজ্ঞানও কি নেই? জল দেখলে চেনে না, তাতে স্রোত কী প্রচণ্ড? দেখলে মনে হয় লোকটার বয়স বেশি নয়, বুড়োরা দেখলে ছোঁড়াই বলবে, কিন্তু অবয়বে কেমন যেন বাবু বাবু

গন্ধ, গায়ের রঙটাও ফরসা, মুখখানা কেমন লাল্‌চে লাল্‌চে। গোঁফ দাড়ি নেই, শুধু কানের পাশে জুলফি দুটো কানের লতি পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথার চুল বড়ো বড়ো, কীরকম হাওয়া লেগে উঠে এসে চোখে-মুখে পড়ছে দেখ না!

লোকটা এবার পুঁটলি হাতে আরও একটু পিছিয়ে গেল। তারপরে একটু ছুটে জলের কিনারা পর্যন্ত এসে পুঁটলিটা সত্যি সত্যিই ছুঁড়ে ফেললো। এবং যত জোরেই ছুঁড়ুক না কেন, পুঁটলিটা এপারে এসে একেবারে জলের কিনারে, কেঁদগাছের সামনে পড়লো। ওতে কী আছে কে জানে, জল লেগে নিশ্চয়ই 'টইটম্বুর', – এবং শুধু কী তাই? হাত বাড়িয়ে বাতাসী যদি ওটাকে না ধরতো, তাহলে জলের স্রোত যে মুহূর্তে ওকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতো, কে জানে?

ওপার থেকে লোকটি বললে, –ঈস! এত জোরে ছুঁড়লুম, আর এইটুকু মাত্তর গেল?

বাতাসী পুঁটলিটা কেঁদ গাছের তলায় রাখতে রাখতে লোকটির দিকে তাকালো। লোকটি তখন হাসছিল, আর আশ্চর্য, তাকে এখন ভালো ক'রে দেখে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' করে সম্বোধন করতে লাগলো। বললে,—ভাগিস তুমি চান করতে এসেছিলে! ওর মধ্যে জামা-কাপড় টাকাকড়ি সব আছে। যেভাবে জলে পড়েছিল, তুমি না ধরলে, ওটা ঠিক ভিজে সপ সপে হয়ে যেতো!

মাত্র ভিজে সপসপে! – বাতাসী নিজের মনেই বললে, না ধরলে ওটা ডুবে যেতে। তারপরে স্রোতের টানে কোথায় যে চলে যেতো, তার কি কোনো হদিশ কেউ পেতো! লোকটা কে গো! মাঠে গাঁয়ে কখনো আসেনি নাকি, জলের স্রোতও দেখেনি!

লোকটা এবার জলের দিকে তাকালো, একটু হেঁট হয়ে ভালো করে জল দেখলো, তারপরে বললে, – কী, হেঁটে যেতে পারবো না? কতটা জল হবে? প্যাণ্ট ভিজুক ক্ষতি নেই, পুঁটলিতে পাজামা আছে।

বাতাসী আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো, –ডুব জল।

—ডুব জল! লোকটি চোখ তুলে তাকালো, তারপরে অবিশ্বাসীর সুরে বলে উঠলো, – তুমি খুকি কিচ্ছু জানো না। ডুব জল কখনো হতে পারে? আমি মাসখানেক আগেও এসেছিলাম। এটা পার হয়ে কতবার যাতায়াত করেছি। এখন বৃষ্টির জল পেয়ে যাহোক একটু ফুলেছে, এর বেশি আর কি হবে?

—স্রোত আছে।

বাতাসীর গলার স্বরে একটু বা চকিত হয়ে আবার জল থেকে মুখ তুললো লোকটা, বললে,—তা একটু আছে মনে হচ্ছে।

বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গায়ের জামায় হাত দিলো, বললে—গায়ের জামাটা খুলে ফেলি তাহলে, কী বলো?

বলতে বলতে গায়ের জামাটা খুলে ফেললো লোকটা। হাতে নিয়ে পুঁটলি পাকালো, তারপরে ছুঁড়ে দিলো সজোরে। কিন্তু হাওয়ায় ভেসে সেটা আর এপারে এলো না, পড়লো গিয়ে জলের ওপরে। এবং চোখের নিমেষে কিছু বলবার বা করবার আগেই সেটা স্রোতের গায়ে সওয়ার হয়ে সাঁই সাঁই করে এগিয়ে গেল। তখনো ফুরফুরে ডোরা কাটা কচি কলাপাতা রঙের জামার কাপড়টা দেখা যায়, তখনো ভুস্ করে জলের মধ্যে ডুবে যায়নি।

চোখের পলক ফেলতে-না ফেলতেই যেন ঘটে গেল ঘটনাটা! লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো,—এইরে! গেল—আমার জামা—আমার জামা—

এবং সঙ্গে সঙ্গে সে লাফ দিয়ে পড়লো জলে। যেন হঠাৎ একটা হুটোপাটি। বাতাসী চোখ ফিরিয়ে দেখলো, লোকটা জলে পড়লো আর মুহূর্তে ভেসে গেল অনেক দূরে। বাতাসী সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো। ছুটে বেশ খানিকটা যাবার পর একটা বাঁকের মুখে লোকটাকে আবার দেখতে পেলো। কোনক্রমে পাড়ে উঠে হাঁপাচ্ছে। বড়ো বড়ো চুল ভিজে গিয়ে চোখে মুখে এসে পড়ছে। প্যান্ট আর গায়ের গেঞ্জিও ভিজে লেপটে গেছে শরীরে! বাতাসী এপার থেকে দেখছে আর টিপ-টিপ-করা বুক নিয়ে ভাবছে,—লোকটা যে শেষ পর্যন্ত পাড়ে উঠেছে এই-ই ঢের, এখখুনি ভেসে চলে যাচ্ছিল. স্রোতের সঙ্গে মিশে।

হাঁপাচ্ছে লোকটা। খানিকক্ষণ পরে. একটু দম নিয়ে, মাথার চুল সরাতে সরাতে বললে, দারুণ স্রোত। জামা পাওয়া গেল না।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলো. ভালো সাঁতার জানি তাই রক্ষে, নইলে আমিও আজ মরতুম! ফাঁড়া গেল।

বাতাসী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি এবার উঠে দাঁড়ালো, বললে, পুটলিটা কোথায়?

বাতাসী হাত দিয়ে দূরের কেঁদগাছটার দিকে দেখালো। লোকটা নিশ্চুপে চলতে লাগলো।

বাতাসীও চলতে লাগলো স্রোতের পাশাপাশি, তবে স্রোতের বিপরীত দিকে। কেঁদগাছের নিচে এসে সে থামলো। লাল-সবুজের রেখাটানা নতুন শতরঞ্চি দিয়ে বাঁধা পুটলিটা যেমনটি রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনটি পড়ে আছে। ওপার থেকে লোকটিও সেটা দেখলো, তারপরে তার দিকে ফিরে হঠাৎ সে বললে, এই স্রোতে কেউ চান করতে পারে? খবরদার চান করো না। ভেসে যাবে।

বাতাসীর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। সে মনে মনে বললে, বুকে গামছা রয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি এই স্রোতে গা ভাসাতে এসেছিলুম নাকি? আমি এসেছিলুম দেখতে! মরা গাঙে জোয়ার দেখতে ভালো লাগে না?

লোকটি বললে, ধারে-কাছে একটা সাঁকোও নেই। কী করে পার হই বলো ত?

বাতাসী এবার কথা বললে, হেঁটে চলে যান, সাঁকো একটা আছে।

লোকটি বলে উঠলো, আরে, সে ত মাইল তিনেক দূরে, বড়ো রাস্তা যেখান দিয়ে গেছে। অতো দূর হাঁটবো না বলেই ত সটকাট করতে গিয়েছিলুম! তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে? মোড়লদের চেনো? বড়ো মোড়ল? তাদের জামাই, ঘোতন? ঘোতনের আমি বন্ধু। বললুম না? কিছুদিন আগে আমি এসেছিলুম! গাঁ-টা ঘুরে আমার ভালো লেগেছিল. তাই আবার এসেছি। ইস্! কটা টাকা সাশ্রয় করবার জন্য হাঁটতে গেলাম। সাইকেল রিক্সা করলেই হতো!

বাতাসী বললে, জামাইবাবুকে চিনি।

—তুমি ছুটে গিয়ে খবর দিতে পারবে?

—হ্যাঁ—বলে মাথা হেলিয়ে বাতাসী দ্রুত পা বাড়াতেই—'না-না-দাঁড়াও যেও না'—বলে লোকটি কী ভেবে আবার বাধা দেয়, —যেতে গেলে তোমাকে পুটলিটি নিয়ে যেতে হয়। ওখানে ফেলে রেখে গেলে ত চলবে না! ওতে আমার যথাসর্বস্ব রয়েছে। তোমার কাছে লুকোব না, ওতে একটু সোনাদানাও আছে। বড়ো কষ্টের পয়সায় তৈরি করানো। চাঁপদানীর চটকলে কাজ করি। চাঁপদানী চেনো? চিনবেও না, সে অনেক দূর। বড়ো গঙ্গা, যাকে বলে গঙ্গা-ভাগীরথী, তার পাশে। আমরা তার জলে ঝাঁপাই জুড়ি, আর এখানে এসে নাকানি চুবোনি খেলুম একটা এঁদো নালার কাছে না, দাঁড়াও, পার আমি হবোই। আমাকে হতেই হবে।

বলতে বলতে সেই অদ্ভুত মানুষটি আবার জলে নামলে। এবার ঝাঁপ দিয়ে নয়, আস্তে আস্তে, সন্তর্পণে। বাতাসী দেখতে পাচ্ছে তাকে, নামতে না নামতেই গলা জল, তারপরেই লোকটা হাত বাড়ালো, সাঁতারের ভঙ্গিতে। কিন্তু এতো চাঁপদানীর গঙ্গা নয়, এ মানভূমের কাঁকর মাটির দেশের হঠাৎ ঘুম ভাঙা পাহাড়ী স্রোতস্বিনী, একে পার হওয়া কি অতোই সহজ? লোকটি নিমেষে আবার সেই বাঁকের মুখে চলে গেল। আবার ছুটোছুটি। বাতাসী বাঁকের কাছে ছুটে এসে হাঁপাচ্ছিল। লোকটাও পাড়ের মাটি আঁকড়ে ধরে ক্রমশ নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসেছে! তার বোধহয় দম বন্ধ হবার জোগাড়, জল থেকে নিজেকে টেনে তুলে পাড়ের ওপর শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছে।

মাঝখানে প্রবল স্রোত। ওপারে শরীর এলানো মানুষটা, এপারে বুক দুরু-দুরু করা স্তম্ভিত বাতাসী। মোড়লদের জামাইয়ের বন্ধু, ওরা কেউ তাদের কিছু নয়, কিন্তু তা বলে অসহায় লোকটাকে সে এমন করে ফেলেই বা পালায় কী করে? তার ওপরে কেঁদগাছের ছায়ায় পড়ে আছে তার শতরঞ্চি মোড়া পুটলি, যাতে নাকি রয়েছে তার যথাসর্বস্ব, সোনাদানা!

আচ্ছা, মানুষটার আক্কেলই বা কীরকম? সে যে বাতাসী, সামান্য এক গরীব বিধবা মায়ের মেয়ে, ঐ মোড়লদের ভুঁইতে ধান রুয়ে যাকে পেট চালাতে হয়, তাকে না জেনে না শুনে অমন করে বিশ্বাস করে সথাসর্বস্ব 'সমর্পণ' করতে আছে? এখন যদি পুটলি নিয়ে সে ছুট দেয়? পরে তার হদিস পাবে লোকটা? তার বয়সী মেয়ে গাঁয়ের মধ্যে অঢেল আছে! সেই দঙ্গল থেকে তাকে খুঁজে বার করা সহজ নাকি?

কিন্তু ওদিকে হলো কী লোকটার? অমন করে ভুঁয়ে পড়ে রইল যে! জ্ঞান-ট্যান হারিয়ে ফেললো নাকি? কাকে এখন ডাকবে বাতাসী? ধারে কাছে একটা লোক যদি থাকে এই সময়। ছুটে আবার তাহলে গাঁয়ে যেতে হয়। ঐ মোড়লদের বাড়িতে গিয়েই খবর দিতে হয়। হ্যাঁ গো, তোমাদের জামাইয়ের বন্ধু ঐ হোথা নালার ধারে পড়ে আছে, তাকে তুলে নিয়ে এসো?

সে কী করবে না করবে ভাবছে, এমন সময় ওপারের মানুষটা ধীরে ধীরে মুখ তুললো, উঠে বসলো, দারুণ স্রোত—সাঁতরেও কুল পাচ্ছি না। দেখি কী করা যায়।

বলে, সে উঠে দাঁড়ালো, নেশাখোর মানুষের মতো টলতে টলতে হেঁটে উজিয়ে যেতে লাগলো সেই কেঁদগাছটার দিকে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসীও পা ফেলতে লাগলো, মাঝখানে সেই ভয়ঙ্করী স্রোতধারার ব্যবধান।

কেঁদগাছের তলায় লাল-সবুজ শতরঞ্চির পুঁটলিটা তেমনি ভাবেই পড়ে আছে। বাতাসী এসে দাঁড়ালো। ওপারে সেই লোকটাও এসে দাঁড়িয়েছে। খানিকক্ষণ নির্বাক, কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। তারপরে এক সময় সেই লোকটি যেন আর্তনাদ করে উঠলো, তাইত! পার হবো কী করে?

বাতাসী ওর দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকালো, বললো, আমি গাঁয়ে ছুটে যাবো? ডেকে আনবো কাউকে?

মন্দ নয়, লোকটি বললে, যেতনের শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ বড়ো মণ্ডলদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে হয়। বলবে যে, যার সঙ্গে তোমাদের ছোট মেয়ে সৌরভীর সম্বন্ধ হয়েছে, সে এসেছে, কিন্তু স্রোতে পার হতে পারছে না।

অবাক হয়ে আবার তাকালো লোকটির দিকে বাতাসী। সৌরভীকে সে

চিনবে না কেন, খুব চেনে। দিব্যি মেয়ে—গাঁয়ের মধ্যে সেরা সুন্দরী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না! তার সঙ্গে একটি শহরের ছেলের সম্বন্ধ স্থির রয়েছে, কাণাঘুষোয় এ-কথ টাও শুনেছে বাতাসী। আরও শুনেছে, ছেলেটি দেখতে নাকি রাজপুত্তর, ভালো চাকরি করে, পেটে বিদ্যেও আছে! ফ্যালনা ছেলে নয়, শীগ্‌গিরই আশীর্বাদ হয়ে দিন-ক্ষণ স্থির হবে।

—নাঃ!—ওকে দেখতে দেখতে বাতাসী নিজের মনেই বললে, খাসা মানাবে ওর সঙ্গে গৌরভীর।

ছেলেটি বললে, কী, পারবে না কি খবর দিতে?

– এখুনি যাচ্ছি।

কিন্তু সে পিছন ফিরে ছুট দেবার আগেই ছেলেটি ডাকলো, এই শোনো; শোনো? দৌড়িও না। একটা মতলব বার করেছি মাথা থেকে।

বাতাসী থমকে থেমে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো।

ছেলেটি বললে, আমার ঐ পুঁটলি থেকে দড়িটা খুলতে পারবে?

বাতাসী ওর পুঁটলিটার দিকে তাকালো।

ছেলেটা বললে, ঐ দড়িটা খুলে ওর একটা প্রান্ত আমার দিকে ছুঁড়ে দাও, অন্য প্রান্তটা তুমি শক্ত করে ধরে থাকবে, কেমন? আমি ওটা ধরে কোন রকমে সাঁতরে পারে চলে আসবো।

বাতাসী চোখ বড়ো বড়ো করে কথাটা শুনছিল। এখনো তার কিশোরী বয়স, যৌবন-যাদুকর তার দেহে লাবণ্যের ঢেউ তুললেও মনের দিক থেকে এখনো তার বালিকা সুলভ কৌতুক-কৌতূহল অহেতুক লজ্জা বা শঙ্কার আড়ালে চাপা পড়ে যায় নি। ছেলেটির প্রস্তাবে তার হলো ন' যযৌ ন' তস্থৌ' অবস্থা। যেতেও পারছে না, থাকতেও পারছে না।

ছেলেটি বললে, কী চুপ করে রইলে কেন? দড়িটা খোলো?

বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েটির কাছে এ এক অভিনব প্রস্তাব। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা ক্রীড়া-কৌতুকের আভাষ পেয়ে মেয়েটি সচকিত হয়ে উঠলো, তাকালো ছেলেটার দিকে, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, দড়ি ধরে সাঁতারে পার হওয়া যায় নাকি?

—কেন যাবে না? ছেলেটি বললে, তুমি খুঁটটা শক্ত ক'রে ধরে থাকবে, তাহলে আমি ঠিক পার হতে পারবো।

মেয়েটি এবার আর দ্বিরুক্তি না করে ওর পুঁটলির কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো। দড়িটা অবশ্য খুব শক্ত, টানাটানিতে ছিঁড়ে যাবার ভয় নেই।

লম্বাও আছে. শতরঞ্চি-মোড়া পুঁটলিটাকে কয়েকটা পাকে বেশ করে জড়িয়ে আছে। অনেক কষ্টে দড়িটা শেষ পর্যন্ত খুলে ফেললো বাতাসী। কিন্তু তারপর ?

ছেলেটি ওপারে দাঁড়িয়ে উসখুস করছিল। মেয়েটি দড়ি খুলতে যতো দেরি করছে, ততই সে অস্থির হয়ে উঠছে! বার বার বলছে, কই, হলো ? দেরি করছো কেন ?

মেয়েটি দড়িটা নিয়ে এক সময় উঠে দাঁড়ালো, জলের ধারে এগিয়ে এলো। ছেলেটি বললে, ছুঁড়ে দাও—একটা প্রান্ত আমার দিকে ছুঁড়ে দাও ?

বাতাসী দড়িটা গুটিয়ে নিয়ে ছুঁড়তে গিয়ে সবই ছুঁড়ে দিলো ওপারে। ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে দড়িটা ধরতে ধরতে বললো, এই যাঃ! সবটাই ছুঁড়লে যে! একটা প্রান্ত রাখবে ত নিজের হাতে ? বলে, সে অনেক কায়দা-টায়দা করে দড়ির এক প্রান্ত আবার ছুঁড়ে দিলো এ পারে, বাতাসীর কাছে। কিন্তু বাতাসী হাত বাড়িয়ে সেটি ধরবার আগেই পড়ে গেল জলে!

—ধুঁৎ!

বলে ছেলেটি দড়িটা আবার টেনে নিলো হাতে, বললো, আবার ছুঁড়ছি, এবার লুফে নেবার চেষ্টা করো, হারিয়ে ফেলো না।

বলে, আবার ছুঁড়লো, কিন্তু এবার সে নিজেই পার করতে পারলো না, প্রান্তটা হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো জলের ওপর।

— এ-ও মজা মন্দ নয়, বাতাসী মনে মনে ভাবলো, এও এক ধরণের খেলা!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দড়ির অপর খুঁটটা বাতাসী শক্ত করে ধরতে পারলো, এবং আসল 'খেলা' শুরু হলো এর পর থেকেই।

বাতাসী দড়ির এক প্রান্ত ধরে রইলো এক তীরে দাঁড়িয়ে, আর অন্য তীরে ছেলেটি দড়ির প্রান্ত হাতে খানিকটা পেঁচিয়ে নিলো। নিয়ে, আরেক বার ওর দিকে তাকালো, বললে,—তুমিও খানিকটা পেঁচিয়ে নাও—নইলে খুলে যেতে পারে। ঝুলিয়ে যাবে, দড়ি লম্বা আছে।

বাতাসী ওর দেখাদেখি দড়িটা হাতে পেঁচিয়ে নেবার পর ছেলেটি আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলো না. জলে এসে নেমে পড়লো। এবং মুহূর্তের মধ্যে বাতাসীর হাতে এসে পড়লো প্রবল টান। জলের একেবারে কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল সে। সেই হেঁচ্‌কা টান সে সামলাতে না সামলাতেই পা হড়কে প'ড়ে গেল জলে। কোথায় চলে গেল তার বুকের নতুন গামছা কোথায় চলে গেল তার শাড়ীর আঁচলের খুঁট! জলে খানিকক্ষণ নাকানি চোবানি খেতে

সে সাঁতরাবার চেষ্টা করতে লাগলো। সাঁতরাতে সে জানতো ভালোরকমই। কিন্তু বিপদ হলো তার শাড়ী নিয়ে। শাড়ীটা খুলে গিয়ে তার পায়ের দিকে জড়িয়ে গেছে। সে ভালোমতো পা ছুঁড়বে কী করে? তাই সাঁতরাবার আগেই সে তলিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু কথায় বলে, স্রোতের মুখে তৃণ পেলেও লোকে সেটা অবলম্বন করে। বাতাসী দড়ির প্রান্তটা ছাড়েনি। এবং ছাড়েনি বলেই প্রাণে মরলো না, নালার নাবালে সেই বাঁকের মুখে গিয়ে আটকে গেল দেহটা!

এই বাঁকটা ছিল বলে রক্ষে। গতবারও এই বাঁক রক্ষা করেছিল ছেলেটাকে, এবারও রক্ষা করলো শুধু তাকে নয়, বাতাসীকেও।

ছেলেটা বাঁকে আটকে যাবার পর নিশ্বাস নেবার জন্য মুখ তুললো, হাতে তখনো সেই দড়ির প্রান্তটা পেঁচানো। কিন্তু, মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, মেয়েটা কোথায়? তার হাতের দড়ি আলগাই বা কেন? ভাবতে ভাবতে দড়িতে টান দিতেই সে অনুভব করতে পারলো, মেয়েটা কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে দড়িটায় টান দিলো ছেলেটি। মেয়েটি জলে ভেসে উঠলো, একেবারে তার পায়ের কাছে। উপুড়-হওয়া ভঙ্গি। একরাশ বড়ো বড়ো কালো চুল হাজার হাজার সাপের বাচ্চার মতো কিলবিল করছে যেন, কিলবিল করছে জলে, কিলবিল করছে লাল্‌চে-লাল্‌চে ফরসা পিঠের ওপরে, কোমরে, নিতম্বে। কী সর্বনাশ! মেয়েটার শাড়ী কোথায়?

তার ওপরে বোধহয় 'ভির্মি' গেছে। আস্তে আস্তে একটু টেনে, মুখখানা কাত করে কোলের ওপর রাখলো, নগ্ন দেহের বাকি অংশটা জলে।

লাল একটা গামছা দেখেছিলাম না—ওর বুকের ওপর? সেইটা বা গেল কোথায়? মরুক গে! মেয়েটা তার টানে ওপার থেকে এপারে এসে পড়েছে, কিন্তু জ্ঞান নেই, মূর্চ্ছা গেছে।

ওদিকে, গ্রামের প্রান্তসীমায় কিশোর এসে দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে লাল গামছার লাল রঙ তার চোখে পড়ছিল। এটুকু বুঝতে পেরেছিল, গ্রামের কোন মেয়ে স্নান করতে নালার ধারে গেছে—একা একা। কিন্তু ওপারে কালো কালো কী দেখা যায়? প্যাণ্ট-পরা কোনো একটা লোক নয়?

সে খানিকটা কৌতূহলের বশেই এদিকে এগিয়ে আসছিল। আসতে আসতেই সে দেখলো, ওপারের ছেলেটি আর এপারের মেয়েটি কী একটা ধরে যেন টানাটানি করছে। তারপরে, নিমেষের মধ্যে মেয়েটিকে আর দেখা গেল না, দেখা গেল না ছেলেটিকেও। সর্বনাশ! জলের ঐ প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে পড়ে গেল নাকি?

সে দৌড়তে আরম্ভ করলো। দৌড়তে দৌড়তে সে যখন ঘটনাস্থলে পৌছলো, তখন মূর্চ্ছিত মেয়েটিকে দু-হাত ধরে ছেলেটি কোনক্রমে কিনারে বসে আছে। মেয়েটির দেহের অর্ধেক দেখা যায়, আর অর্ধেক জলে।

ছেলেটি ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলো,—ও ভাই, শুনছেন? শীগগির দৌড়ে ঐ কেঁদ গাছের কাছে চলে যান। ওখানে একটা পুটলি পাবেন পুটলিটা ছুঁড়ে দিন। ওটা আমার। ওর মধ্যে আমার কাপড় আছে। মেয়েটাকে তো জল থেকে তুলতে হবে? না-না আগে আসুন—পরে সব গুছিয়ে বলছি।

কিশোর বাতাসীকে চিনতো। চিনতো মানে, দূর থেকে দেখতো। মাথার ঐ এক ঢাল কালো চুল নিয়ে কখনো সবুজ মাঠের দিকে যাচ্ছে, কখনো পরনে তার টিয়ে পাখীর শরীরের রঙের মতো শাড়ী, মেঘলা দিনে কখনো বা ঘন নীল শাড়ী, কখনো বা খর মধ্যাহ্নে টকটকে লাল শাড়ী। রঙ ভিন্ন হলেও তাতে বোনা মোটা সুতোর সস্তা শাড়ী। কুমোরের চাক ঘোরায় যে ছেলেটি, সেখানেও ওকে দেখা যেতো, দেখা যেতো কানাইয়ের দোকানের কাছে। নিজের মনেই কাছে যেতো, নিজের খেয়ালেই ঘুরে বেড়াতো, কত কাম করতো, কখনো ছাগল চরাচ্ছে, কখনো ঘুঁটের জন্য গোবর কুড়োচ্ছে, কখনো মায়ের সঙ্গে মাঠে নামছে ধান রুইতে। ওর মুখের কথা কজন শুনেছে কে জানে, কিন্তু ওর উপস্থিতি অনুভব করেছে গ্রামের প্রতিটি মানুষ। বিশেষ করে তরুণ দল। ডাকলে কাছে যায় না, ছুটে পালায়। কিন্তু আপন মনে পথ হাটতে তার দ্বিধা নেই, কে কী বলছে-না-বলছে, সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন কিছু সুন্দরী না, তবু ও যখন অদূর মাঠের পথে হাটতো মাথার এক ঢাল চুল মেলে, তখন ওর দিকে না তাকিয়ে পারা যেতো না। অথচ খুব গরীব ভাগচাষীদের কারুর মেয়ে ও, পরনে মোটা-খাটো শাড়ী—আনমনা।

কিশোর ঐ ছেলেটির কথা মতো কেঁদগাছের কাছে গিয়ে সেই পুঁটলিটা কুড়িয়ে আবার ওদের কাছাকাছি ফিরে এলো।

ছেলেটি বললে, বেশ করে গুছিয়ে ছুড়ে দিন। খুলে—সব কিছু ছত্রভঙ্গ না হয়ে যায়। হ্যাঁ,—ঐভাবে ধরুন—বেশ জোর করে ছুঁড়ে দিন। দেখবেন, জলে না পড়ে যেন!

কিশোর তা-ই করলো। পুঁটলিটা ছেলেটির মাথার কাছে কাঁকর-মাটির ওপর এসে পড়লো, পড়ে পুঁটলিটা একটু এলিয়ে গেল।

বাঃ—ঠিক হয়েছে—ধন্যবাদ—বলে, ছেলেটি এবার ওর দিকে মুখ ফেরালো, বললে, মেয়েটাকে এবার তুলি, আপনি উল্টো দিকে মুখ করুন—শীগগির।

কোণারকের পাষাণী মেয়ে, আমি আর সে

সে—অর্থে—অক্ষয় মজুমদার। অক্ষয় মজুমদারদের সঙ্গে সারা জীবনে বহুবার আমার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। ওষুধ-বিক্রির দালালি নিয়ে এদেশ-সেদেশ করে বেড়াচ্ছি সেই প্রথম যৌবনকাল থেকে। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে পা দিয়ে কর্মরথচক্রের গতি শ্লথ করে দিতে অভিলাষ হয় বই কি মাঝে মাঝে, কিন্তু অবাক হয়ে নিজের জীবনটার দিকে নিজেই যখন ফিরে তাকাই, তখন ভাবি, সাধ থাকলেও সাধ্য কই? নিজের সৃষ্টি-করা গতিবেগ নিজেকে প্রতিনিয়ত তাড়না ক'রে বেড়াচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে যে বিরাম দেব, সে শক্তি কই? কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে যখন ফিরে আসি, তখন সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে সদম্ভ উক্তি করতে ছাড়ি না—দেবো এবার সব ছেড়েছুঁড়ে। খেটে-খেটে আর পারি না, মানুষের শরীর না কি? রাজ্যে-রাজ্যে অমন করে চরকির মত ঘুরলে, বাঁচবো আর কদিন? কিন্তু ছুটি নিলেও মনটা হাঁপিয়ে ওঠে। সংসারের গতানুগতিকতা, ক্রমবর্ধমান অভাবের আগুনে ঝলসানো কয়েকটি মুখ—সব-মিলিয়ে আমাকে যেন পুনর্বার বাইরের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। গৃহিণীর হাঁপানী, ছেলেমেয়েদের কলেজ আর স্কুল, বড়ো মেয়ের জন্য পাত্র অন্বেষণ, সর্ববিধ সমস্যা যেন একত্র হয়ে আমাকে তাড়া করতে থাকে,—ব্যাধ-ভীত পশুটির মতোই তখন জীবিকার উপল বন্ধুর পথে দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হয়ে ক্রমাগত ছুটতে থাকি, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, মীর্জাপুর থেকে শুরু ক'রে বেজওয়াড়া, বিজয়নগরম, পুরী, কটক, ভুবনেশ্বর,—যেখানে যাবার আদেশ হয়, নির্বিচারে সেই দিকেই প্রস্থান করি।

কিন্তু যেখানেই যাই,—অক্ষয় মজুমদারদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটবেই। চিল্কার ধারে 'রম্ভা'য় একবার নেমেছিলাম, দেখি সেখানেও অক্ষয় মজুমদার। পায়ে বুট জুতো, পরনে খাকীর প্যাণ্ট আর সার্ট, মাথায় খাকী রঙের সোলার টুপি, ছররা বন্দুক হাতে,—চিল্কার কিনারে কিনারে পাখী শিকার করতে বেরিয়েছে। প্রথমেই চিনতে পারা যায় না, চলন-বলনের ভঙ্গিমা দেখে সন্দেহ হয় মাত্র। বেশ মনে আছে সেদিনকার কথাটা। রম্ভারই একটি "দরমা-ছাওয়া-বেঞ্চি-পাতা চায়ের দোকানে" বসে পুরানো কাঁচের গেলাসে চা খাচ্ছি,

—কাদা-মাখা বুট জুতো, খাকী প্যান্টে কাদার দাগ, হাতের ছর্‌রা বন্দুকটাতে পর্যন্ত কাদা লেগেছে, অক্ষয় মজুমদার প্রতিম ভদ্রলোকটি ক্লান্ত ভঙ্গিমায় ধপাস ক'রে এসে বসলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-বেঞ্চিটার ওপরে, আমার পাশে। দোকানী বন্দুকধারীকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, আশেপাশে স্থানীয় লোকেরা এসে ভিড় করে দাঁড়ালো, অবশ্য সসম্ভ্রম দূরত্ব রেখেই। ভদ্রলোক সবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে অবশেষে আমার দিকে মুখ ফেরালেন, আমার পোষাক-পরিচ্ছদ, মুখাবয়ব মুহূর্তে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে প্রশ্ন করলেন,—বাঙালী নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুশিতে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপরে মাথা থেকে সোলার হ্যাটটা নামিয়ে টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠলেন—মাছের কারবার নাকি?

—না।

বিস্ময়ে চোখের ঘন ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হয়ে গেল, বললেন—তবে? রস্তায় বাঙালী আর কী করতে আসবে? ছবি আঁকা-টাকার হাত আছে নাকি?

হেসে ফেললাম, বললাম—না। কাজে কর্মে এ-সব অঞ্চলে ঘুরে বেড়াই, হঠাৎ এবার শখ হলো, একদিনের জন্য চিল্কায় নেমে পড়লাম, এই আর কী!

ভদ্রলোক এবার এমন খুশি হয়ে উঠলেন যে, হো-হো ক'রে হাসতে-হাসতে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে আমার উরুর ওপরে সজোরে এক চাপড় বসিয়ে দিলেন, বললেন—আরে, আমিও যে তাই।

তারপরে পাশে-রাখা ছর্‌রা বন্দুকটা দেখিয়ে বললেন—এই 'লাইসেন্স-করাটা' সব সময়ই কাছে থাকে বুঝলেন, যখনই শখ হয়, আপনার মতোই কোথাও নেমে পড়ি।

ব'লেই মুখ ফিরিয়ে দোকানীকে বলে উঠলেন—কইরে, চা দে, দু'গেলাস। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল না, বরং ভালোই লাগছিল। ভদ্রলোকের কার্যকলাপ দ্রুত অপসারিত করছিল অপরিচয়ের কুহেলিকা। এর আগে একবারই মাত্র দেখেছিলাম ওঁকে চিল্কার ধারে এবং তা-ও দূর থেকে। কিন্তু, তখন থেকেই যে-সন্দেহটা মনের মধ্যে ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, ওঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে করতে সেটা দৃঢ় হলো। নির্ঘাৎ অক্ষয় মজুমদার। ভদ্রলোক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক করে ভিড় হটিয়ে দিয়েছেন চারপাশ থেকে। তারপরে—আমার কাছে ঘেঁষে এসে, যেন নিগূঢ় কোনো রহস্যালাপ করছেন, এমন ভঙ্গিমায়, সাগ্রহ অথচ চাপা গলায় প্রায় ফিস্‌ফিসিয়েই বললেন—পেলাম না মশাই, তাররাতাই পালিয়েছে।

আমি কথাটা বুঝতে না পেরে ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে মাথাটা নাড়িয়ে-নাড়িয়ে একটু হাসলেন, বললেন—স্নাইপের ঝাঁক মশাই, স্নাইপের ঝাঁক! পালাকেমিদির দিকে কোথাও ঝিল আছে, সেদিকেই উড়েছে। তা' যাবো মশাই, এখ খুনি চা খেয়ে দৌড়োবো। স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় তল্পি তল্পা রেখে এসেছি, ও-গুলো তুলে নিয়ে, পরের ট্রেন ধ'রেই একেবারে—।

বলেই, কথাটা শেষ না করে, হাতটা প্রসারিত করে একটা ভঙ্গি করলেন, তারপরে বললেন—সে নাকি আবার ছোট ট্রেন মশাই, নৌপদা, না, কী যেন এক স্টেশনে, নেমে, বদলাতে হয়। কখনো ত যাইনি পালাকেমিদি, আপনি গেছেন?

—গেছি।

—গেছেন! উল্লাসে আর উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, বললেন,—স্যার, তাহলে চলুন না আমার সঙ্গে! এক হাত নিই ভায়রাভাইকে।

বললাম—বসুন। চা এসেছে—চা নিন।

বসলেন একটু স্থির হয়ে, চাও নিলেন। বললাম,—ভায়রাভাইটি কিন্তু এখনো স্পষ্ট হলো না।

গরম চায়ে অতি কষ্টে ঘন ঘন গোটা কয়েক চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন,—ঐ যে বললাম, স্নাইপ, স্নাইপের ঝাঁক।

কিন্তু, আমার মুখের ভাবে তখনো জিজ্ঞাসার রেখা মিলিয়ে যায়নি দেখে আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলতে লাগলেন—ব্রীফেই বলি। বিয়ের পর বউটার থেকে ছোট শালীটাকেই ভালো লাগত। তা, টাইম অ্যাণ্ড টাইড ত কারুর জন্য বসে থাকে না। একদিন বিয়ে হয়ে গেল ছোট শালীর। বরটি বেশ ছেলে, যেমন দেখতে, তেমনি বিদ্যায়, তেমনি টাকা-পয়সায়। আমার সঙ্গে এমনিতে খুব ভাব, কিন্তু স্নাইপ-শিকার আমার নেশা ত? না মশাই, রুন্‌কেস করা ভালো, অন্য পাখীর পিছনে আমি কখনো ছুটি না, আমার নেশা শুধু ঐ স্নাইপে। একদিন একটা জায়গায় নির্জনে স্নাইপের আশায় বসে থাকতে থাকতে কথাটা আমার মনের ভেতরে প্লে ক'রে গেল। স্নাইপের ঝাঁককে ভায়রাভাই নাম দিলে কেমন হয়?

বলতে বলতে আবার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন অক্ষয় মজুমদার ভদ্রলোকটি, তারপরে স্থান-কাল ভুলে স্বাভাবিক স্বরেই বলতে লাগলেন সেই

হাসির রেশ টেনে,—কথাটা যেই মনে হওয়া, অমনি বেদম হাসি। হাসির শব্দে পাখিগুলো পর্যন্ত উড়ে গেল। সেই থেকে, আত্মীয়স্বজন কাউকে ত বলতে পারি না, এই আপনাদের মতো লোকের কাছেই ডিসক্লোজ করি- স্নাইপের ঝাঁকের নামকরণ করলাম—ভাইবাভাই। কী? চার্ম পাচ্ছেন না কথাটায়?

সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হলো, এ-অক্ষয় মজুমদার না হয়েই যায় না। এদের যে আমি অণুতে পরমাণুতে চিনি। তবু আরও একটু পর্যবেক্ষণ করবার জন্য বলে উঠলাম—কিন্তু যাই বলুন, পালাকেমিদি আমি এখন যেতে পারব না। আমারও তলপি-তলপা স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় রয়েছে, সে সব তুলে নিয়ে ডাউন ট্রেন ধরব, যাবো খুর্দা রোডে, সেখান থেকে গাড়ি বদল ক'রে যাবো পুরী। পুরীতে একটু কাজও আছে, দিনকতক বিশ্রাম নেবার ইচ্ছাও আছে। বিশ্রাম মানে, মানসিক বিশ্রাম বলতে পারেন। তা-ও ঠিক পুরী নয়, যাবো কোণারক। -তুন যাচ্ছি না, এদিকে অবসর পেলে কোণারকটা একবার ঘুরে যাই, বেশ ভাল লাগে নির্জন পাষাণ মন্দিরটা। মন্দির থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামের প্রান্তে নদীর বাওড় কি ঝিল, একটা কিছু হবে, সেখানে মশাই আমি স্নাইপ দেখেছিলাম, অজস্র স্নাইপ।

আমি জানতাম স্নাইপের বার্তা ভদ্রলোককে উৎসাহিত করে তুলবে। ঠিক তাই হলো। শুনতে শুনতে ভদ্রলোকের চোখ দুটি বিস্ফোরিত হয়ে উঠলো।

—বলেন কী? অজস্র? মানে, ঝাঁকে ঝাঁকে?

বললাম—হাঁ।

ভদ্রলোক আমার হাতের ওপর হাত রেখে চাপ দিয়ে বলে উঠলেন,—তা হলে স্যার রইল পালাকেমিদি, আমি আপনারই সঙ্গ ধরলাম।

এই যে ওর আকস্মিক দিক পরিবর্তন,—এতে আমি বিস্মিত হলাম না। অক্ষয় মজুমদারদের যতদূর চিনেছি, তাতে জানি, ওঁদের পক্ষে এ-ধরনের আচরণটাই স্বাভাবিক।

পুরীতে সমুদ্রের ধারে অজয়বাবুর হোটেলেই আমার বরাবরের আস্তানা। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে এ-হোটেলে এসে উঠলেও গুঁৎ গুঁৎ করতে লাগলেন, বললেন—বটার হোটেলেই যাওয়া উচিত ছিল স্যার, বড্ড হৈ-চৈ এখানে, বড্ড লোকজন।

হেসে বললাম—তাত হবেই। পূজো সামনে, সীজনের লোকেরা আসতে সুরু করেছে, পুরী এখন জমজমাট।

ভদ্রলোক আবার আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললেন—আমরা কোণারক যাচ্ছি কখন?

বললাম—আজই। সন্ধ্যার পর। দাঁড়ান একটা গরুর গাড়ি ঠিক করে আসি।

উনি বললেন—গরুর গাড়ি কেন? মোটর-গাড়ি করুন না?

বললাম—ঘুর পথে যেতে হবে। তা-ও অনেক টাকা নেবে।

বললেন—নিক না, আমি বেয়ার করবো।

একটু হেসে বললাম—তা না হয় করলেন, কিন্তু লাভ নেই। আজ ভরা পূর্ণিমা। সারাটা রাত বালির উপর দিয়ে গরুর গাড়ি চলবে, তাতে যে কী অদ্ভুত লাগবে, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

ভদ্রলোক চোখদুটি বড়ো-বড়ো করে কথাটা শুনলেন, তারপরে বললেন—পূর্ণিমা রাতে বালি চিক্‌চিক্‌-করা দেখতে বেশ লাগে, না?

বললাম—শুধু কি তাই? পথে দু'দুটো নদী পার হতে হবে।

—কিন্তু ঐ যে বাওড় না, ঝিল বললেন—

বললাম—সেটা মন্দির ছাড়িয়ে—একটা গাঁ পড়বে—সেই গাঁয়ের প্রান্তে।

বললেন—ঠিক আছে। তাই, হবে।

পথের বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক। কখনো গরুর গাড়ির সঙ্গে হেঁটে, কখনো গাড়িতে বসে বা শুয়ে আমরা পথ পার হচ্ছিলাম। ভদ্রলোক স্নাইপের স্বভাব, স্নাইপের চেহারা—এসব নিয়েই আলোচনা করছিলেন বেশি। কথায়-কথায় ওঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচিতিও কিছুটা এসে পড়ছিল। যা বুঝলাম, মোটামুটি সচ্ছল অবস্থার মানুষ। তিন ভাইয়ের ব্যবসা, বড়ো ভাই-ই সব দেখাশোনা করেন, ইনি মেজো। বড়ো-বড়ো কয়েকটা শহরে ব্রাঞ্চ অফিস আছে, আর ছোটখাটো নানান শহরে আছে ওদের এজেন্ট। কটকে এসেছিলেন ব্যবসায়িক কাজে, সেইসূত্রে চিল্কা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে নিজের শখ মেটানো।

বললাম—এর আগে আসেননি কোণারক?

—না।

—কোণারকের মন্দির দেখেন নি?

—না।

রাত যখন শেষের দিকে, তখন আমরা অপেক্ষাকৃত বড়ো নদী—নিয়াকিয়া পার হলাম নৌকো করে। উনি ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছিলেন বারবার। দেখে, একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলে উঠেছিলাম—কষ্ট দিলাম আপনাকে। এ[illegible] দেখছি মোটরে এলেই হতো।

উনি একটা হাই তুললেন, তারপরে বললেন—আরে না-না, এ-আমার খুব অভ্যেস আছে।

নদীর পরপারে পৌঁছে গ্রামটায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর আবার শুরু হলো আমাদের চলা। বললাম—মন্দিরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেশ সকাল হয়ে যাবে। সঙ্গে ত প্রাতরাশ রয়েছে, সেটা শেষ করে, মন্দিরটা ঘুরে একটু দেখে, তারপরে আপনার স্নাইপের সন্ধানে যাওয়া যাবে'খন।

—ঠিক আছে।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির দৃশ্যমান হলো দূর থেকে। বার কয়েক এসেছি তবু সমান ভালো লাগে কোণারক। দেখামাত্র মনে হলো, এই ঝাউবীথি পেরিয়ে এখ্খুনি ছুটে চলে যাই। কিন্তু, আমার উৎসাহের সঙ্গে আমার সঙ্গীর উৎসাহের যোগসাধন হলো না। কেমন যেন নিরুৎসাহ ভঙ্গিতে ভদ্রলোক হেঁটে চলেছেন। নতুন যারা আসে, তারা মন্দিরের চূড়া দেখতে পেয়ে যে-ভাবে উল্লসিত হয়ে ওঠেন, ওঁর মধ্যে ঠিক সে-ভাবটা পরিলক্ষিত হলো না। মনে মনে একটু দমে গেলাম, মনে হলো, তবে কি চিনতে এঁকে ভুল করলাম? তবে কি ইনি অক্ষয় মজুমদার নন?

কথাটা যেই মনে হলো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি বিপরীত চিন্তা আমাকে পেয়ে বসলো। অনুশোচনা-বিজড়িত সে চিন্তার স্রোত। ভাবতে লাগলাম, কী প্রয়োজন ছিল ভদ্রলোককে এভাবে মাতিয়ে দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসার? ইনি পার্লাকেমিদি যাচ্ছিলেন, তা-ই না হয় যেতেন। সেখানকার ঝিলেও স্নাইপ, এখানকার বাওড় বা ঝিলেও তাই। ওঁর অগ্নিস্রাবী লৌহ-যন্ত্রটায় সেখানেও কয়েকটা নিরীহ প্রাণী হত হতো, এখানেও হবে। মাঝখান থেকে সে হত্যালীলার সঙ্গী হয়ে থেকে লাভ কী? দেশ থেকে যখনই আমরা বাইরে আসি, কতো সহজে, কতো তুচ্ছতার মধ্য দিয়ে, কতো অপরিচিতের সঙ্গেই না বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এমন করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানি, কলকাতার যতো নিকটবর্তী হতে থাকি, তত ছেদ ঘটতে থাকে সে বন্ধুত্বে,—স্টেশনে পৌঁছে, 'আচ্ছা, নমস্কার, আবার দেখা হবে'-র পর সেই যে যে-যার পথে চলে যাই, ঠিকানা-বিনিময় হওয়া সত্ত্বেও আরও পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে না। সুতরাং এই যে ক্ষণিকের, কিংবা বড় জোর দিনকয়েকের বন্ধুত্ব, এর জের টেনে নিজের ইচ্ছার সঙ্গে এদের ইচ্ছাকে এমন করে মিছিমিছি বেঁধে ফেলতে গেলাম কেন।

নির্জন-নিভৃত কোণারকের বিশাল ভগ্ন মন্দির। অনতিদূরের বটগাছটা আজও ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ছিন্নমস্তক পাষাণ

প্রহরীটি তার পাষাণ অশ্বটিকে নিয়ে। ভদ্রলোক বললেন—কই মশাই, লোকজন কোথায়?

বললাম—স্থানীয় লোক দু-একজন হয়ত দেখা যাবে, আর ঐ আমাদের গরুর গাড়ির গাড়োয়ান। ব্যস্, আবার কী? আপনি আর আমি, এই-ই ত যথেষ্ট লোক, বেশি ভিড় থাকা কী ভালো?

কাছের একটা পুকুরে গিয়ে আমরা হাত মুখ ধুয়ে এলাম। গাড়োয়ান একপ্রান্তে তার গাড়িটিকে সরিয়ে নিয়ে রেখে গরু খুলে দিলে। তারপরে কাছে সরে এসে বললে—নিকটে ডাকবাংলো রয়েছে, বাবুরা যান না? বিশ্রাম করেন।

বললাম—কী দরকার? বরং গাড়ি থেকে শতরঞ্চি আর টিফিন কেরিয়ারটা বার করে আনো। এখানেই বসা যাক, মন্দিরের কাছ ঘেঁষে। কী বলেন?

অনতিবিলম্বে সেই ব্যবস্থাই হয়ে গেল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, খাওয়া-দাওয়া রেখে আগে মন্দির অর্থাৎ মন্দিরের স্থাপত্য ভালো করে দেখে নিই। কিন্তু, সেই মুহূর্ত থেকে মনে হতে আরম্ভ করেছে, ইনি অক্ষয় মজুমদার কি না কে জানে! ঠিক সেই থেকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি বারবার।

গাড়োয়ান ঘটি করে খাবার জল নিয়ে এলো। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

—তা আর বলতে!—ভদ্রলোক বলে উঠলেন—বেশি চুঁইচুঁই করছে।

নীরবে খাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম বটে কিন্তু বারবার মনটা উন্মনা হয়ে পড়তে লাগল। মনে হতে লাগল—না—না, এ-আমি ঠিক আশা করি নি। এবং খাওয়ার পালা শেষ করে যখন উঠে দাঁড়িয়ে স্থাপত্য-লীলা দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম, ওঁর মধ্যে একেবারেই উৎসাহ দেখা গেল না, উনি আবার হাই তুললেন, বললেন—বড়ো ঘুম পাচ্ছে মশাই, আপনি ঘুরে-টুরে আসুন, আমি ঘুমিয়ে নেই একটু।

মনে-মনে আমি আরও দমে গেলাম। তবু শেষ চেষ্টা। বললাম—সে কী! নতুন এসেছেন, মন্দিরের এই অবিস্মরণীয় শিল্প আপনি দেখবেন না!

ভদ্রলোক তৎক্ষণে শতরঞ্চির ওপরে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়েছেন। বললেন—দূর মশাই, কতগুলি ডেড্ পুতুল দেখে কী করবো?

অগত্যা একাই ঘুরে-ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। একসময় মন্দির বেয়ে উঠলাম ওপরে, সেই মন্দিরা-বাদন-রতা পাষাণী মেয়েটিকে দেখতে। তার ঠোঁটের হাসি ঠিক তেমনি অম্লান আছে—আজও। দূরে ঝাউবীথির আড়ালে সমুদ্রের অবাধ সুনীল জলরাশি চোখে পড়ে। অন্যদিকে গ্রামের ছোট ছোট

কুঁড়েঘরগুলির আভাসও পাওয়া যায়, তারই অন্তরালে আছে, স্নাইপের ঝাঁক বুকে নিয়ে সুখে শুয়ে থাকা বাওড়, কি, ঝিল!

কিছুক্ষণ ওপরে চুপচাপ বসেছিলাম মন্দিরা-বাদিনীর সামনে, তারপরে নেমে এলাম একসময়ে সন্তর্পণে পা ফেলে, পা ফেলে! এখান থেকে পদস্খলন হলে গুলি-বেঁধা স্নাইপের মতোই ঘুরতে ঘুরতে পড়তে হবে আকাশ থেকে কঠিন মাটিতে। ধীরে ধীরে নেমে এলাম। শতরঞ্চিটা আমি ইচ্ছা করেই মন্দিরের গা ঘেঁষে একটা মনোমত স্থানে বিছিয়ে নিয়েছিলাম। ভরসা ছিল, ভদ্রলোক যদি সত্যিই অক্ষয় মজুমদার হন, ত, নির্ঘাৎ চোখে পড়বে। চোখে পড়বে সেই বিশেষ মূর্তিটা। একদা যুগল-মূর্তিই ছিল ওখানে অন্যান্য মূর্তিগুলির মতো, কিন্তু আমরা প্রথম যেদিন কোণারক আসি, সেদিন থেকেই দেখছি, মহাকাল পুরুষটিকে সরিয়ে দিয়েছে, আছে শুধু নারীমূর্তিটি। পুরুষটি নেই, কেমন ছিল পুরুষটির মূর্তি, তা জানবারও উপায় নেই, শুধু একটু এখনো দেখা যায়, মেয়েটির কটিদেশে একখানি পুরুষের হাত শুধু সংলগ্ন হয়ে আছে। এবং সেই পরশটুকুতেই উন্মুখ দেহবল্লরী দুরন্ত লজ্জায় একটু বাঁকিয়েছে যেন মেয়েটি, মুখখানি একটু ফিরিয়েছে বিপরীত দিকে! বেণী-ভঙ্গিমা প্রাচীন বেশভূষার সাক্ষ্য বহন করছে, কিন্তু ঈষৎ আনত মুখখানি, চিবুকের কাছে ছোট্ট একটু টোল-খাওয়া, ঠোঁটের কোণে টেনে আনা সলজ্জ মধুর হাসিটুকু—এ সমস্তই কালের প্রহরা উত্তীর্ণ হয়ে সাম্প্রতিক বরবর্ণিনীদেরও অনুরাগ-সিঞ্চিত অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করছে! ভাবান্তরে বলা যায়, চিরন্তনী নারীর চিরন্তন এক বিশিষ্ট ভাবের রূপায়ণ!

কিন্তু ভদ্রলোক নির্বিকার। গায়ে একটা চাদর টেনে দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছেন, নিদ্রাভিভূত নাসিকা সগর্জনে সেই বার্তাই ঘোষণা করছে। ধীরে ধীরে বসে পড়লাম ওর পাশে। একবার মনে হলো নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেই ওঁকে। বলি,—উঠুন, দেখুন, দেখেছেন এ অপরূপ সৌন্দর্য আগে? আমার কাছে কখনো পুরানো হলো না! কিন্তু না, নাড়া দিলাম না ওঁকে। যদি বিরক্ত হন? অক্ষয় মজুমদারের মতো উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই বিশেষ মূর্তিটির দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকবে, এমন লোক যদি সত্যিই উনি না হন? ক্রমশই আমি হতাশ হচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমানেও আঘাত লাগছে। অক্ষয় মজুমদারদের চিনতে ভুল করবো, শেষ পর্যন্ত আমি? পোড় খাওয়া মানুষ আমি, বহুদর্শী মানুষ আমি, আমি এক লহমাতেও চিনতে পারব না, কে অক্ষয়, আর কে নয়? ঘুমের অতলে-তলিয়ে-

যাওয়া এই মানুষটিকে দেখে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় ক্রমশই ভরে যাচ্ছিল আমার মন। কিন্তু, এ-ও যে আমার প্রচণ্ড ভ্রম—তা' ভাঙতে আমার বেশিক্ষণ দেরি হলো না। এবং ভাগ্যে ভেঙেছিল। নইলে এই আখ্যায়িকা পরিবেশনের কোনো প্রয়োজনই হতো না।

গাড়োয়ানটি পায়ে-পায়ে এক সময় কাছে এসে বসলো। নির্ণিমেষ চোখে মূর্তিটিকে দেখছি লক্ষ্য করে সে প্রথমেই কোনো কথা বলল না, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর সে বলল—বাবু ?

—কী ?

ধীর মৃদু কণ্ঠে সে বললে—ফিরবেন কখন ? রৌদ্র উঠে আসছে মাথার ওপর।

বললাম—ফিরতে দেরি আছে। আমরা কিছুক্ষণ পরে ঐ গ্রামটায় যাবো—শিকার করতে। ফিরে আসবো এখানে। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে রওনা দেবো, বুঝলে ?

গাড়োয়ান বললে—তাহলে গ্রাম থেকে চালডাল কিনে নিয়ে আসি বাবু, বটগাছতলায় উনুন পেতে রান্না চাপিয়ে দেই।

—বেশ। এই নাও টাকা।

লোকটা চলে গেল। সারারাত ঘুম হয়নি, শরীর ভেঙে ক্লান্তি নেমে আসা স্বাভাবিক। পাষাণী মূর্তিটির দিকে মুখ করে আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে পড়লাম। হাঁটুর কাছ থেকে পা পর্যন্ত, সবটা পড়ল মাটিতে। তা হোক, মূর্তিটিকে চোখের আড়াল করতে পারবো না। ঝাউয়ের বনে হাওয়া লেগে গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ হচ্ছে। মূক অতীত যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে দুঃসহ বেদনায়, মন্দিরের প্রতিটি পাষাণ-মূর্তি যেন প্রাণ ফিরে পেতে চায়, বলতে চায় ওগো আজকের মানুষ, আমরা কেউই পাষাণ নই, আমাদের কালের রক্ত-মাংসের জীবিত মানুষেব আদল নিয়েই আমরা তৈরি, আমাদের প্রতিটি প্রাণীর ইতিহাস আছে, প্রতিটি প্রাণীর আছে বলবার মতো কথা !

আশ্চর্য, কথাগুলি মাত্র আমার মনেই উদয় হলো না, আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম তার প্রতিটি ধ্বনি। ওদের কথাগুলো ঠিক এমনি করেই সেবার আমাকে বলেছিল অক্ষয় মজুমদার। বলেছিল—এত নিখুঁৎ এদের প্রতিটি অবয়ব ! প্রেমিকার দেহমঞ্জরী জরা এসে ছাই করে দেবে, প্রেমিক সে চিন্তা সহ্য করতে পারেনি, তাই প্রতিটি প্রেমিক তার কালের জীবিত প্রিয়াকে নিপুণভাবে ধরে রেখে দিয়ে গেছে পাষাণের মধ্যে।

অকাল তন্দ্রা এসে আমার চেতনাকে ধীরে ধীরে আশ্রয় করছে, আর আমি ছায়াছবির মতো দেখতে পাচ্ছি, আমার সম্মুখে অবয়ব নিয়ে দাঁড়াচ্ছে অক্ষয় মজুমদার। আমার পার্শ্ববর্তী ঘুমন্ত লোকটির দেহ থেকেই সে যেন উঠে দাঁড়ালো। পার্শ্ববর্তী সঙ্গীটির থেকে লম্বা, কালো, আর তার মাথাটা ওঁর মতো কেশবিরল নয়। সেই যে সেবার কোণারক এসেছিলাম আসল অক্ষয় মজুমদারের সঙ্গে, এই ছায়ামূর্তি একেবারে ঠিক সেই অক্ষয় ব্যক্তিটির। কণ্ঠস্বর একেবারে হুবহু সেই অক্ষয়ের। বছর কয়েক আগেকার কথা, তবু মনে হয়, যেন একেবারে কালকের ঘটনা। বস্তুত, সেই থেকেই ত অক্ষয়দের আমি চিনতে শুরু করেছিলাম। অক্ষয় বললে—ঐ যে পাষাণী মেয়েটিকে দেখছেন, ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচিত একটি মেয়ের অদ্ভুত মিল আছে। ' চিবুকের নিচের ঐ টোলটুকু, ঠোঁটের কোণের ঐ হাসি, ভ্রূভঙ্গি, ছোট্ট কপাল, গ্রীবা—সব আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই মেয়েটির কথা। আবার দেখুন ওই মেয়েটির সঙ্গে মন্দিরের ওপরকার সেই মন্দিরা-বাদিনী মেয়েটির ঠোঁটের হাসির অপূর্ব মিল আছে। তাই না? আমার মনে হয়, এ দুটি মূর্তি একই মানুষের সৃষ্টি, তার একই প্রেমিকার আদল থেকে গড়ে তুলেছে এই মূর্তি দুটি।

একটু দম নিয়ে অক্ষয় আবার বলতে শুরু করল,—আসল কথাটা কী বলতে পারেন? স্রষ্টার কাছে সে নিজে বড়ো, না সৃষ্টি বড়ো? প্রেমিকের কাছে সে নিজে বড়ো, না তার প্রেমিকা বড়ো?

এবং উত্তরের জন্য প্রত্যাশা না করেই সে বলতে লাগলো,—একটি মেয়ের কথা বলতে গিয়ে তার কথা না বলে নিজের কথাই বলতে ইচ্ছা করছে আগে। আমার কাছে কে বড়ো? আমি, না সেই মেয়েটি?

এবারেও প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করে নিজের মনেই বলে যেতে লাগলো—আমিই বড়ো, নইলে তাকে যখন প্রতিবিম্বিত দেখছিলাম, তখন তাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাই নি কেন? আপনি ত জানেন আমি বিচিত্র পেশার মানুষ। ছোটবেলা থেকেই শখ ছবি আঁকার, কিন্তু অভিভাবক একদিন কান ধরে হিড়-হিড় করে টেনে তুললেন আমারকে ছবি আঁকার কাজ থেকে। তুলে, ভর্তি করে দিয়ে এলেন সাধারণ কলেজে। গড্ডালিকা-প্রবাহে ভেসে চললাম। ঘাটের পর ঘাট পার হয়ে যখন তীরে ওঠবার সময় হলো, তখন দেখি সে মন আর সে উৎসাহ নিভে গেছে। আত্মীয়দের সুপারিশের জোরে মোটামুটি মাঝারী গোছের একটা চাকরি পেলাম সুদূর বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে। বোম্বাই বলতে যে ঐশ্বর্যসম্ভার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সে বোম্বাই নয়, যে-পরিবেশে স্থান পেলাম, সেটি হচ্ছে দরিদ্র বোম্বাই। মাত্র অস্তিত্ব-টুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য

নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে যেখানে। বহু ঘরওয়ালা একটা বিরাট বাড়ির ছোট্ট একটি খোপে স্থান পেলাম দোতলায়। আমার পাশের ঘরে থাকত থোঁড়া-মতন প্রৌঢ় একটি লোক, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা। কিছুদিন থাকতে থাকতেই আলাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোক মিশুকে আছেন; পুরোনো বাসিন্দা বলে বাড়ির প্রায় সবাই ওকে চেনে, এবং ডাকে ওঁকে প্রভুজী বলে। ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো বেশ বড়ো একটা ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মূর্তি আছে। শুনলাম, স্থানীয় লোক হলেও ওঁরা খৃষ্টান। মেয়েটির গায়ের রং আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েদের মতো শ্যামল। লম্বা গড়নের, দেখতে ছিপ্‌ছিপেও নয় মোটাও নয়, বয়স হবে একুশ-বাইশ, নিচের ঠোঁটটি ঈষৎ স্থূল,—প্রায় সব সময়ই যেন চাপা হাসি খেলা করতে থাকে সেখানে। চোখ দুটি খুব বড়ো না হলেও, তাকানোর ভঙ্গিতে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, চোখের তারা দুটি ঘন কালো। সাধারণ সাদা শাড়িই পরতে দেখি প্রায় সব সময়, মাথার চুলে ঈষৎ কুঞ্চন আছে, দীর্ঘ বেণীটা ঝুলিয়ে যখন সে হেঁটে যায়, তখন কুঞ্চিত চুলের পাত্‌লা অগ্রভাগগুলি কানের পাশে, মুক্ত বেণীর সঙ্গমে সঙ্গমে মৃদু মৃদু হাওয়া লেগে ধীরে ধীরে মাথা তুলতে থাকে। অবাধ্য অলকগুচ্ছ অদ্ভুত এক শোভা ধারণ করে, যখন সারাদিন পরে সে ফিরে আসে। আমারও অফিস থেকে ফেরার সময় সেটা। দূর থেকেই দেখতে পাই, সাদা শাড়ি, হাতে বেঁটে ছাতা, দুটি সুডৌল হাত একেবারে খালি, গলায় এক চিল্‌তে হার আছে কি নেই, কান দুটিও আভরণবিহীন, শুধু হাঁটার গতিবেগে, মাথায়, কপালে বেণীর ছন্দে ছন্দে দুর্বিনীত চূর্ণালকগুলি অবিরাম কাঁপতে থাকে।...এতো যখন তার সম্বন্ধে বলতে পারলাম তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি তাকে কতটা লক্ষ্য করেছি? নামটাও এতদিনে আমার জানা হয়ে গেছে। অতি সাধারণ নাম,—শোভা! বাড়ির সবার সঙ্গেই তার হাসি মুখের সম্পর্ক। কিন্তু তার কাজ শেষ করে এসে সেই যে ঘরে ঢোকে, বারান্দায় মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায় বটে কিন্তু অন্য কারুর ঘরে গিয়ে যে হৈ-হৈ করবে, গল্প করবে,—এমন ঘটনা কখনো চোখে পড়ে নি। বারান্দায় আল্‌সের ওপর ভর দিয়ে হয়ত পথের জনারণ্য দেখছে, আমিও এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়, আমার ঘরের সামনে, মুখ তুলে তাকিয়ে একবার দেখত, মুখে ফুটে উঠত অভ্যস্ত সেই হাসিটুকু, কিন্তু আবার সে মুখ ফিরিয়ে নিতো। এ-শুধু আমার বেলায় নয়, প্রতিবেশী সবার সঙ্গেই ছিল তার এই ব্যবহার।

আমার ব্যর্থ ছবি-আঁকার শখ ততদিনে ভিন্নতর এক পথ আবিষ্কার ক'রে নিয়েছে। যে আত্মীয় ও বন্ধুটির বিশেষ আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় আমি বোম্বাইয়ের

চাকরিটি পেয়েছিলাম, সে প্রায় আমারই সমবয়সী, এবং সেই জন্যই সম্পর্কে বড়ো হয়েও সে ছিল আমার বন্ধু। তার সঙ্গে আমার রস-রসিকতার সম্বন্ধ ছিল, ছিল প্রাণ-খুলে কথা বলার সম্বন্ধ। আসল বোম্বাইতেই সে থাকে, মহার্ঘ একটি ফ্ল্যাটে। মানুষটি অকৃতদার এবং একা। সেই জন্য এখানে আসবার মুহূর্তে মনে মনে এই প্রত্যাশাই ছিল যে, সরাসরি তার ফ্ল্যাটে গিয়েই থাকতে পারব। কিন্তু তা হয় নি। তার ফ্ল্যাটে সে একা থাকাই পছন্দ করে। আমি ততদিনে একটি সাধারণ ক্যামেরা সংগ্রহ করেছি। ফটো-তোলার মধ্য দিয়েই আমার ছবি আঁকার ব্যর্থ প্রয়াস তার সার্থকতার পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু তখনো কি জানতাম যে, এই ফটো তোলাই অবশেষে আমার জীবিকা হয়ে দাঁড়াবে? কলকাতায় আমাদের মজুমদার স্টুডিওর নাম আপনি শুনেছেন কি না জানি না, আমার দুটি ভাইকে সহকারী করে দিন-যাপনের গ্লানি বহন করছি ঐ স্টুডিওকে কেন্দ্র করেই। তবে আমাকে দেখেই ত বুঝতে পারছেন, কেন্দ্রে থাকতে পারি কদিন? ক্যামেরা নিয়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াই, এবং এ-যে ঠিক কিসের তাগিদে, তা' আপনাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না। কিন্তু, এহ বাহ্য। পূর্ব কথায় ফিরে আসি। আমার বোম্বাইয়ের সেই আত্মীয় ও বন্ধুটি হচ্ছেন শিল্পী, পেশাদারী শিল্পী, ছবি এঁকে তার দিন কাটে। সেই জন্য অফিসের পর এক-একদিন সন্ধ্যায় তার কাছে যাই। সে-ও সারাদিনের কাজের পর সেই সময় একটু বিশ্রাম করে। দুটি ঘর তার ফ্ল্যাটে। একটি তার শোবার-ঘর বসবার-ঘর একসঙ্গে, আর ভিতরের ঘরটি হচ্ছে তার স্টুডিও। সন্ধ্যায় চা-খেতে-খেতে আলাপ-পরিচয় হয়। হয়ত জিজ্ঞাসা করে—কাজকর্ম চলছে কেমন? কিংবা,—অসুবিধা হচ্ছে না ত? চেনা এক দালালকে দিয়ে তোমার ঘরটা পাইয়ে দিয়েছিলাম, নিজে দেখিনি। একদিন সময় করে দেখে আসব।...কিংবা,—তুমি ত সুন্দর ফটো তোলো হে? সেদিন আমার যে ফটোটা তুলেছ,—এককথায় অপূর্ব। জুহুতে গেছ? অনেক খোরাক পাবে। তোমার সেন্স অব ফ্রেমিং অদ্ভুত।...

এই সব কথা। তা-ও বেশিক্ষণের জন্য নয়। আমি জানি এবার ও স্যুট-টুট পরে বেরুবে। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পরে একটু অবসর বিনোদন, এবং এ-ক্ষেত্রেও সে একা-একা থাকতে ভালবাসে, সঙ্গী পছন্দ করে না।

আমার কিন্তু ওর কাছে যাওয়ার মুহূর্ত বিরল হয়ে আসতে লাগলো। অফিসের পর পা দুখানি আপনিই বাড়ির দিকে চলে যেতে চায়। মনে মনে জানি, বাড়ির কাছাকাছি রাস্তায় সেই মেয়েটিকে দেখতে পাবো,

সারাদিন অফিসে কাজ করবার পর ক্লান্ত পায়ে সে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখা হবে, আমাকে দেখে ঠোঁটের কোণে সে একটু খুশির হাসি টেনে আনবে, যেমন সে করে তার পরিচিত প্রতিটি লোককে দেখলে। বাড়তি কিছু নয়, বিশিষ্ট কিছু নয়, তবু প্রাক্‌সন্ধ্যার সে হাসিটুকু নেশার মতো আমাকে বাড়ির দিকে টানতে থাকে। এমনি দিনের পর দিন।

প্রভুজী এক-একদিন আমার ঘরে আসেন গল্প করতে, আমিও কখনো-সখনো যাই ওঁর ঘরে। মেয়ে এসে চা দিয়ে যায়, মুখে ফুটে ওঠে সেই নীরব হাসিটুকু, কিন্তু আর কিছু নয়। তারপরেই পরদার অন্তরালে তার অপসরণ। প্রভুজী বলেন—বাবুজী জীবনটা বড়ো কঠিন। বুড়ো হয়েছি, পা খোঁড়া, টুক্‌রোটাক্‌রা কাজ করি, কিন্তু যে-কাজই করি না কেন, পেমেন্ট ঠিক মতো পাই না। পেমেন্ট দিতে লোকে এত ঘোবায় কেন বলতে পারেন? এখন ঐ মেয়েই একমাত্র ভরসা। ওরই আয়ে বুড়োবুড়ীর চলছে।

বলেছিলাম,—অফিসে কাজ করেন বুঝি?

প্রভুজী উত্তর দিয়েছিলেন—হঁ্যা, স্টেনোগ্রাফাবের কাজ, বড়ো খাটুনী।

ঠিক এই সময় পর্দার অন্তবাল থেকে একটা আহ্বান এলো। প্রভুজী উঠে দাঁড়ালেন, পর্দার আড়ালে গেলেন, অবশ্য ফিবে এলেন, সঙ্গে সঙ্গেই। বললেন—মেয়ের মা কী বলেছে জানেন বাবুজী? বলেছে, বাবুজী মেয়ের একটা ফটো তুলে দেবেন। মেহেরবাণী করে?

বললাম—নিশ্চয়ই। এর মধ্যে মেহেরবাণীর কী আছে?

এবং, এই ফটো তোলার মধ্য দিয়েই শোভার সঙ্গে আমার আলাপ বা পরিচয় ঘটে গেল, তা-ও আকস্মিকভাবে। একটা নিদারুণ সম্ভ্রম আমার আছে ওর ওপর। ওর চাল-চলন শুধু আমাব কেন, বাড়ির সবারই সম্ভ্রম উদ্রেক করে। আমরা জানি, হাসির আড়াল দিয়ে সবাইকে ও দূরে রাখে। এবং ওর এই দূরত্বে থাকার মধ্য দিয়েই অদ্ভুত এক সুষমা ফুটে ওঠে ওর চারিদিক ঘিরে। এই সুষমাকে জ্যোতির্বলয় বলতে পারি, যে রশ্মিচ্ছটার মধ্যে দেবীর মতোই ওর মূর্তিখানি বিরাজ করতে থাকে।

কিন্তু, যা বলছিলাম। একদিন অফিসে কাজ করছি, হঠাৎ যা কোনদিন হয় না তা-ই হলো, আমার সেই আত্মীয় ও বন্ধুটি এসে উপস্থিত হলো। বললে—কাল তিনটের সময় একবার আসতে পারবে আমার ওখানে, তোমার ক্যামেরাটা নিয়ে? বিশেষ দরকার আছে।

গেলাম। ও বললে—একটা ছবি তুলতে হবে। একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেল

থেকে। ছবিটা তুলে দিলে আমার কাজটা একটু সহজ হয়, তাড়াতাড়ি হয়।

বললাম—কার ছবি? তোমার।

সে বললে—না। ভিতরে এসো? স্টুডিওতে।

কিন্তু না ঢুকলেই বোধহয় ভালো হতো। শিল্পীরা যেমন মডেল থেকে ছবি আঁকে, তেমনি উজ্জ্বল আলোয় একটা চৌকির উপরে নিঃস্পন্দ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে শোভা—সম্পূর্ণ নিরাবরণা। ঐ কোণারকের মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে দেখ, একেবারে ঐ ভঙ্গি, একেবারে ঐ সুঠাম দেহবল্লরী।

শোভা কয়েক মুহূর্ত সত্যি সত্যি বুঝি পাষাণে পরিণত হয়েছিল আমাকে দেখতে পেয়ে। তারপরেই অস্ফুট আর্তনাদ করে তাড়াতাড়ি একটা চাদর টেনে নিয়েছিল সে। আর আমি যেন বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো বেরিয়ে এসেছিলাম বাইরে। ছবি তোলা হয়নি, কিছুই হয়নি, কয়েকটা দিন আমি যেন চোরের মতো বেড়াতে লাগলাম। অফিসের পর অনেক দেরি করে বাড়িতে ফিরি, মনে মনে কামনা করি, তার সঙ্গে যেন দেখা না হয়। কিন্তু সময়টা তখন মাসের শেষ, মাসের শেষের দিকে প্রভুজীব সংসারে প্রতিমাসে যেমন একটা মনকষাকষি আর অশান্তির ঝড় বইতে থাকে, তেমনি চলেছে একটু টের পাচ্ছি, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। বোধ হয় সেটা পঞ্চম দিন, সন্ধ্যার পরে সবে এসে বসেছি, চাকরটা চা দিয়ে গেছে, চা খাচ্ছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। সম্ভবত প্রভুজীই আসছেন গল্প করতে, এই মনে করে বললাম—আসুন?

ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো শোভা। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, দুটো চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। রুদ্ধশ্বাসে সে বললে—আমার বাবাকে কিছু বলেছেন?

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে। বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—না!

—তবে?—বলে, সে একটা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো। সাদা শাড়ির আঁচলটা তার কোমরে জড়ানো, হাতদুটি খালি, গলায় এক চিল্‌তি হার আছে কি নেই, মুক্ত বেণীর সঙ্গমে-সঙ্গমে, কপালে, মাথায়, অবাধ্য চূর্ণালকগুলি হাওয়া লেগে থর থর করে কাঁপছে!

বললাম—বসুন?

মুখ তুলে দৃঢ়ভঙ্গিতে সে আমার দিকে সোজা তাকালো, তারপরে কণ্ঠস্বরে অন্তরের সব অগ্নি যেন ঢেলে দিয়ে বলতে লাগলো,—আমি কী তা' তো জেনেছেন। কিন্তু আপনিই বা কী? মডেল থেকে ছবি তুলে রোজগার করতে চান? ছিঃ!

বলেই আর দাঁড়ালো না, ত্বরিত পায়ে চলে গেল ঘর থেকে। কিন্তু যা রেখে গেল, তা এক বিস্ময়ের বস্তু। আরও দিনকয়েক ধরে লক্ষ্য করলাম, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে আমি শুধু তার কথাই ভেবে চলেছি। তার সেই দৃপ্ত ভঙ্গি, তার সেই বঙ্কিম গ্রীবা, তার সেই অবাধ্য চূর্ণালকস্তূপ, তার চোখের সেই অগ্নিস্রাবী দৃষ্টি—সব যেন ক'দিন ধরে হয়ে উঠলো আমার ধ্যানের বস্তু। তার 'ছি': বলে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আরও এক অব্যক্ত বাণী যেন ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠতে লাগলো আমার অন্তরে। অথচ তার সামনে গিয়ে যে দাঁড়াবো, সে সাহস আমার নেই। আমি তাকে ধ্যান করতে লাগলাম এবং সম্ভবত আর সাত দিনও কাটেনি, সন্ধ্যার পর আবার একদিন সে এলো আমার ঘরে, ঠিক তেমনিভাবে। বললে—একটা কথা বলতে এলাম।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—বসুন।

—না, বসব না—সে বললে, আমি কী তাও আপনি জেনেছেন, আপনি কী তাও আমি জেনেছি। আমাদের বাইরের রূপ যা-ই থাক, ভিতরের রূপ যে কী, তা জানতে আমাদের দুজনের কারুরই বাকি নেই। সেজন্য একটা চুক্তি করলে হয় না? আপনি আমার ফটো তুলুন, আর আমার যা প্রাপ্য, তা আমাকে দিন। আমাকে আর বাইরে নানান জায়গায় অতো ঘুরতে হয় না, সংসারেরও যথারীতি সাশ্রয় হয়।

কোনো উত্তর দিলাম না। সে-ও আর কিছু বললো না। বোধহয়, মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলো। তারপরে সে মুখ তুললো। অবাক হয়ে দেখলাম, চোখ দুটি তার জলে ভরে উঠেছে। এবং সেই জল লুকোবার জন্যই বোধ হয় মুখ ফিরিয়ে ত্বরিত পায়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এবং এলো আর পাঁচ দিন পরেই। কেমন যেন বিপর্যস্ত চেহারা, কেমন যেন ক্লান্ত পদক্ষেপ। এসে ধপ করে বসে পড়লো আমার সামনের চেয়ারটায়। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বোধ হয় মনে মনে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল, তারপর মুখ তুলে বললে—বাইরে দেখি না যে?

বললাম—রাত করে ফিরি।

হঠাৎ সে বললে—অন্য কারুর ছবি তোলা হচ্ছে বুঝি?

চুপ করে রইলাম।

সে চাপা গলায় বললে—আমাকে যদি পছন্দ না হয়, তা হলে—

কথাটা সে শেষ করলো না, কিন্তু শেষ কথাটা শোনবার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে রইলাম। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, আবার আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, চোখ

ছুটো তার জলে ভরে গেছে। কিছুটা আত্মগতভাবেই সে বলে উঠলো—ছিঃ-ছিঃ! একজন বিদেশীকে আমি—

তার নিজের কথাই বুঝি তাকে বিদ্যুতের কশাঘাত করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে, যে মন এসেছিল, তেমনি চলে গেল।

এর দিন চারেক পরে সে নিজে এলো না বটে, এলো তার চিঠি। 'লেটার বক্স' খুলতেই খামটা আমি পেলাম। খামে বড়ো একটা কাগজে স্বাক্ষরহীন সম্বোধনবিহীন কটি কথামাত্র লেখা, কী চাও আমার কাছে? আমার জীবন যে দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। বেরিয়ে যাই অফিসে যাবার মতো করে, কিন্তু আসল কাজের জায়গাগুলিতে যেতে পারি না, তোমার যে-দৃষ্টি দেখেছিলাম সেদিন স্টুডিওতে, সেই দৃষ্টি আমাকে নিষ্ঠুর গোয়েন্দার মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমি বা আমরা খাবো কী বলতে পারো? আমরা খৃস্টান, কিন্তু বাবা কতো নিঃসহায় তা জানো? বাবার ছেলেপিলে আছে, সব আছে, কিন্তু সেসব ছেড়ে সে আমার মাকে বিয়ে করেছিল। আমার মারও দুটো বিয়ে। তবে সে পক্ষের স্বামী বেঁচে নেই, সন্তানাদিও নেই। ওদের দুজনের শেষ বয়সের সন্তান আমি। বাবা সমাজ, আত্মীয়বান্ধব থেকে বিতাড়িত, মা থাকেন অসূর্যম্পশ্যার মতো, আর আমি? আমাকে তুমি রেহাই দিতে পারছো না?

বলা বাহুল্য, উত্তর দিলাম না। কিন্তু জানতাম, এর উত্তর সে প্রত্যাশা করে। চিঠির উত্তরে চিঠি না পেলে সে নিজেই আসবে। ঠিক সাতদিন পরে তা-ই ঘটলো।

সরাসরি প্রশ্ন করলো—উত্তর দিলে না যে?

বললাম—তুমি আসবে, জানতাম।

দুর্জ্ঞেয় ক্রোধে আর ক্ষোভে তার সর্বশরীর যেন কাঁপছে থরথর করে, বললে—ছবি আমার তুলবে না?

বললাম—না।

বললে— তবে কী চাও তুমি আমার কাছ থেকে?

বললাম—কিছুই না।

তীব্র কণ্ঠে সে বলে উঠলো—মিথ্যে কথা। অস্বীকার করতে পারো, তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? কেন পালাচ্ছ? আমার চিন্তা তোমাকে এমন করে পেয়ে বসেছে যে, তুমি ভব্যভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পর্যন্ত লজ্জা পাচ্ছ! ঠিক কি না বলো?

চুপ করে রইলাম।

ও এবার বসলো, বললো—কে কে আছে বাড়িতে? খৃস্টান হতে পারবে?

বলে উঠলাম—কেন, তোমাকে বিয়ে করতে হলে খৃস্টান হতে হবে কেন?

উঠে দাঁড়ালো, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে, আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ, তারপরে চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলো—নীচ, কামুক, লম্পট কোথাকার! এই এতদিনে কথা ফুটলো? আমি এ-যুগের মেয়ে, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন? যা বলতে চাও, সোজা-সুজি বলতে পারো না?

সেদিনও সে চলে গেল অমনি করে। মন যেন অনেক শান্ত হয়ে গেল। বেশ মনে আছে, বহুদিন পরে সে-রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলাম নিশ্চিন্তে। কিন্তু সকালে উঠে চা খেতে খেতে তার কথাই ভাবছি, তার বলে-যাওয়া কথা-গুলিই স্মরণ করছি; হঠাৎ মনে হলো, ভুল কথা। এ-যুগের মেয়ে তুমি নও, তুমি সে-যুগের মেয়ে। তোমার মুখ, তোমার গ্রীবা, তোমার বুক, তোমার কটি—সবই যেন প্রাচীন কালের, যে-কালে শিল্পী যৌবনের বিভিন্ন ছন্দকে প্রতিমার মতো রূপ দিতো পাষাণের খণ্ডে-খণ্ডে।

নিজের চিন্তার মধ্যে নিজে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার বাইরে কী যে ঘটেছে, সেদিকে আর দৃষ্টি ছিল না। রীতিমত তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম বলা চলে। কোথায় ওঁকে নাড়া দিয়ে ঘুম থেকে তুলবো, তা না, উনিই আমাকে জাগিয়ে দিলেন। বললেন—সর্বনাশ, সূয্যি যে একেবারে মাথার ওপর। আর কখন রওনা হবেন গাঁয়ের দিকে?

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। গাড়োয়ানটিও গুটি-গুটি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বললে—খিচুড়ি চড়িয়ে দি?

বললাম—দাঁড়াও, গাঁ থেকে ফিরে আসি! মাঠ ভেঙে হেঁটে যাবো। বেশি দেরি হবে না ফিরতে।

ভদ্রলোক সার্ট, প্যাণ্ট, বুট, আর টুপি পরে তৈরি হলেন। আমি ওঁর পাশাপাশি নিশ্চুপে চলতে লাগলাম বটে, কিন্তু সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন করে রইলো কোণারকের সেই পাষাণী মেয়েটি, যাকে দেখে অক্ষয় মজুমদার তার "শোভা"র কথা আমাকে সবটুকু না বলে থাকতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বিয়ে করেছিলেন, শোভাকে?

অল্প একটু হেসেছিল অক্ষয়, বলেছিল—সে আমাকে নিয়ে সাজগোজ করে

বেড়াতে যেত। ছুটতে যেতাম। মালাবার হিল্‌স গেছি, মোরাড্‌লায় তার পরিচিত এক বান্ধবীর বাড়িতে গেছি, কেভ দেখতে গেছি, বেড়িয়েছি খুব। বেড়াতে বেড়াতেই তার ভাবান্তর ঘটলো! ততদিনে আমাদের "এন্‌গেজমেণ্ট"-এর কথা সবাই জেনে গেছে। খৃষ্টান হবার প্রশ্ন অবান্তর, রেজেষ্ট্রি করে যে-দিনটিতে আমরা বিবাহিত হবো, সেই দিনটি পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। শুভদিনটি দ্রুত এগিয়ে আসছে। হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়ালো একদিন, বললে—বিয়ে হবে না। আমার ভুল ভেঙে গেছে।

বললাম—ভুল?

সে বললে—বেশ বুঝতে পেরেছি, তুমি আমাকে ভালবাসো না। অথবা ভালবাসতে তুমি জানো না। আমি এ-যুগের মেয়ে এবং পোড়-খাওয়া মেয়ে, ভালবাসা বলতে কী বোঝায়, আমি তা' জানি। বিয়েটা তোমার কাছে খেয়ালের জিনিস হতে পারে, আমার কাছে নয়। তুমি আধখানা মন দিয়ে আমাকে ভালবাসতে গেছো, আমি তা' নেবো কেন? আমাদের সম্পর্কের এখানেই ইতি হোক।

চোখ দুটি তার শুষ্ক, জ্বালা ধরা। রুদ্ধ-কণ্ঠে বলেছিলাম—এসব কী বলছো? তুমি কি আমার কোনো ব্যবহারে রুষ্ট হয়েছো? দেখ, যেখানে যেতে বলেছো, আমি গেছি। কিন্তু কখনো দেখেছো, আমি তোমার সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করেছি? আমার সংযম আছে, আমি অপেক্ষা করতে জানি।

—ছাই তোমার রোমান্টিসিজম্‌! —শোভা দুচোখে আগুন জ্বালিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলো—ইনিয়ে-বিনিয়ে মিষ্টি মধুর কথা অনেক বলেছো অনেক শুনেছি। শুনে শুনে অরুচি ধরে গেছে। স্টুডিওতে আমাকে সেদিন অমনভাবে দেখে তোমার চোখে যে লালসার আগুন ফুটে উঠেছিল,—আমি চেয়েছিলাম সেই আগুনে দাউ-দাউ করে জ্বলতে। তোমার সেই শিল্পীবন্ধু আমার দেহ-সুষমায় শিল্প-সৌন্দর্য দেখেছে, তুমিও যে শেষ পর্যন্ত তা-ই দেখতে থাকবে দিনের পর দিন ধরে,—তা, আমি ভাবিনি। আমি যা চাই তুমি তা নও। ছবি তোলার নেশা, তোমারও যে সৃষ্টির নেশা, তা' আমি জানতাম না। আমাকে মুক্তি দাও। আর আমার সঙ্গে ঘুরো না।

—তারপর?

চাপা উল্লাসের একটা অভিব্যক্তিতে আবার আমার চমকটা ভেঙে গেল। চম্‌কে উঠে দেখি, সূর্য সত্যিই মাথার ওপরে উঠে পড়েছে, আর আমাকে

একটা হাত ধরে ভদ্রলোক একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়ে দিয়েছেন। চাপা স্বরে বললেন—নড়বেন না। সামনে তাকান। দেখছেন কী কাণ্ড!

ভাবতে ভাবতে মাঠ ভেঙে গ্রাম পার হয়ে কখন যে ঝিলের ধারে চলে এসেছি, একেবারে খেয়ালই ছিল না। নিস্তরঙ্গ নিথর জলে সত্যিই পাখির মেলা বসে গেছে! ওপারটা শ্যামল গাছপালায় ঢাকা, বেণুবনের মধ্যে রৌদ্র-ছায়ার ঝিকিমিকি এখান থেকেই চোখে পড়ে। তার ওপরে, নীল সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছে আকাশটা, সাদা সাদা খণ্ড-বিখণ্ড মেঘগুলি পালতোলা নৌকার মতোই বুঝি নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে!

হঠাৎ দিক-দিগন্ত কাঁপিয়ে একটা প্রবল শব্দ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল পাখির ঝাঁক। চমকে তাকিয়ে দেখি, ওঁর হাতের সেই ছর্‌রা বন্দুকটা উনি নামিয়ে রাখছেন আর হাসছেন হা-হা করে পাগলের মতো।

আর্তকণ্ঠে বলে উঠলাম—কী করলেন আপনি? সত্যিই মারলেন পাখি?

ভদ্রলোক হাসি থামিয়ে অবাক হয়ে তাকালেন আমার মুখের দিকে, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—পাখি মারব না, এই আপনি আশা করেছিলেন নাকি?

বুকের ভিতরটা তীব্র উত্তেজনায় ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, বলে উঠলাম—ঠিক তাই। আমার এক বন্ধু ছিল—অক্ষয় মজুমদার—বহুদিন তার সঙ্গে দেখা হয় না—কোথায় কেমন আছে সে তাও জানি না—কিন্তু তার মতো লোক আমি আরও দেখেছি। নিত্য পরিব্রাজক এদের মন। এরা যে কাজে যখন করে, সে কাজে তখন মন দেয় না। আর দেয় না বলে অনেক কিছু হারায়। কিন্তু হারায় বলে দমে না, যেন হারের মধ্যে প্রকাণ্ড জিৎ তারা খুঁজে পায়। আমি ভেবেছিলাম আপনিও তাদের মতো—

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন,—চলুন, ফিরে যাই।

—কেন? পাখি মেরেছেন, নেবেন না খুঁজে, কুড়িয়ে?

ভদ্রলোক বললেন—কই আর মারলাম? মারতে এসেছি, লক্ষ্যবস্তু হাতের মুঠোয়, অথচ মারলাম না, এরই মধ্যে যে জীবনের সব আনন্দটুকু খুঁজে পেয়েছি। বন্দুকটা ওপরে তুলে এমনভাবে ফায়ার করেছি, যাতে নিশ্চিত জানি, একটার গায়েও গুলি লাগেনি।

বলতে বলতে আবার হেসে উঠলেন—ভায়রাভাইরা চিরকালই পালিয়ে যায়। পালাতে দিতেই ত আনন্দ, মারতে কি ইচ্ছা করে, আপনিই বলুন?

মন থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেল।

বুঝলাম, ভিন্ন পোশাকে ইনিও যে এক অক্ষয় মজুমদার, এ আমি বুঝতে ভুল করি নি। আর তাছাড়া ভুল করবই বা কী করে? এদের যে আমি অণুতে-পরমাণুতে চিনি।—কারণ, আমি নিজেও যে একজন অক্ষয় মজুমদার!

ফিরে গেলাম

আমি এ-কাহিনীর কেউ নই, অথচ আমার কথা দিয়েই শুরু করতে হচ্ছে। আজ থেকে বেশ কয়েকটা বছর আগেকার ঘটনা। ও অঞ্চলটা দণ্ডকারণ্য উন্নয়নের মাধ্যমে এখন সম্ভবত অন্যরূপ ধারণ করেছে, কিন্তু তখনকার দিনে ওসব দিকে শহুরে মানুষদের পদপাত ঘটতো খুবই অল্প। বিশাখাপত্তন থেকে বাস ছাড়তো খুব ভোরে। বহু গ্রাম আর জনপদ পার হয়ে প্রাক-মধ্যাহ্নে গিয়ে দাঁড়াতো 'এস-কোটা' বলে একটা জায়গায়। ছোট্ট জনপদ। নামটা খুব বড়ো সেইজন্য লোকে ছোট করে নিয়ে বলতো, 'এস-কোটা।'

ভ্রমণ-কাহিনী লিখছি না, নইলে এ-পথযাত্রার বর্ণনা বিস্তৃতভাবেই করা যেতো। এখানকার বাসগুলিতে লোক দাঁড়াতে দেয় না, সিট ভর্তি হয়ে যাওয়া মাত্রই আর যাত্রী নেওয়া হয় না। ভিতরটা বিশাখাপত্তন থেকেই বোঝাই হয়ে আসছে। পথে কোথাও দু-একবারের জন্য বাস থেমেছে, কিন্তু কোনো ওঠা-নামা হয় নি। বাসটা খুবই ছোট্ট, ত্রিশ জন লোক ধরে মাত্র। আমার সঙ্গী রত্নম্ ভিতরেই বসেছিল। আমাকে বসিয়েছিল ড্রাইভারের পাশে। বলেছিল, খালি যখন পাওয়া গেছে একটা সিট্, ফার্স্টক্লাশেই বসে পড়ুন। ভাড়া একটু বেশি লাগবে। তা লাগুক। আরামে যেতে পারবেন। আমি রইলাম পিছনে।

বলা বাহুল্য মনটা একটু উৎফুল্লই হয়েছিল। নতুন যাচ্ছি এ-অঞ্চলে, যায়গাটা বেশ ভালোভাবেই দেখা যাবে। অবশ্য ড্রাইভারের পাশে বসে মনটা একটু খুঁত খুঁত করতে লাগলো। ড্রাইভার বসেছিল ডানদিকে, আমি মাঝখানে, বাঁ-দিকে 'মাথায়-পাগড়ি' বেয়ারা-টেয়ারা গোছের একটি লোক। যদিও ড্রাইভারের পাশে একজনের বেশি নেওয়াটা উচিত নয়, কারণ বসলে দুজনকে যথেষ্ট ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হয়। কিন্তু উপায় নেই, জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ওদের 'পারমিট' আছে। আমি দীর্ঘদিন এদেশে বসবাস করলেও 'অন্ধ্র' ভাষা তেমন আয়ত্ত করতে পারিনি এখনো, যদিও, জনান্তিকে এখানে বলে রাখি, বিবাহ করেছি জনৈকা অন্ধ্র মহিলাকে। তিনি উচ্চশিক্ষিতা, স্থানীয় উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতেই বাক্যালাপ হয়

বেশি, আর তিনি তাতে স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করেন যথেষ্ট। কিন্তু থাক, আমাদের দাম্পত্য-জীবন যাত্রার কাহিনী এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়।

আমার কথা যেটুকু এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে, আমি এ অঞ্চলে আছি কিছু-কিছু দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে যুক্ত হয়ে, এবং উক্ত ব্যবসায়ের সূত্রেই সম্প্রতি চলেছিলাম 'এস্-কোটা' হয়ে 'আরুকু ভ্যালি'র উদ্দেশে। 'আরুকু ভ্যালি' হয়ে সুবিখ্যাত 'মাচ্‌কুণ্ডা-প্রোজেক্ট'-এ যেতে হয় কিন্তু আমার গন্তব্যস্থল ততদূর পর্যন্ত নয়।

'এস্-কোটা'য় বাস এসে থামলো জনপদের কোলাহল ছাড়িয়ে একেবারে বসতির সীমান্তে, পাকা চওড়া রাস্তাটারই ওপর অবশ্য। আশে পাশে কয়েকটা চা-জলখাবার-বিড়ি-সিগারেটের দোকান গড়ে উঠেছে, সম্ভবত বাসযাত্রীদেরই সুবিধার্থে। দেখলাম, বাস থামামাত্রই লোকজন নেমে গেল, নেমে গেল ড্রাইভারটিও। শুনলাম, বাস এখানে থেমে থাকবে পাক্কা আধ ঘণ্টা।

আমার পাশের 'পাগড়ী-পরা' লোকটিও নেমে গেছে। হাত-পা একটু ছড়িয়ে বসেছি, এমন সময় জানালার বাইরে থেকে উঁকি দিলো রত্নম। ডাকলো,—বাবু ?

সাড়া দিলাম,—কী ?

—নেমে আসুন না, চা-টা খাবেন না ?

—তা মন্দ কী, বলে পাশের ক্ষুদ্র দরজার ছিট্‌কিনিটা খুলে বাইরে এলাম। পাশের দোকানে চায়ের পালা শেষ করে উঠে আসছি, দেখি একটি মহিলা দখল করার চেষ্টা করছেন ড্রাইভারের পাশের সিটটা।

দোহারা শ্যামলী চেহারা, পরনে সাদা খোলের বুটিদার শাড়ী, অবশ্যই অন্ধ্রদেশীয়া ; কিন্তু, মাথায় চুলের পারিপাট্যে বাঙালী ললনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কানে দুটি ছোট ছোট সাদা পাথরের ফুল, নাকেও অনুরূপ একটি পাথর। এগিয়ে গিয়ে বাধা দেবো মনে করছি, ইতিমধ্যে তিনি দরজা খুলে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সেই মাথায় পাগড়ী পরা লোকটা। বাসের ছাদে বেডিং-সুটকেশ-ট্রাঙ্কগুলো সাজানো রয়েছে, সেখানে বাসের ক্লিনারটি উঠেছে, তার দিকে তাকিয়ে পাগড়ী-পরা লোকটা কী যেন বলছে।

কাছে গিয়ে তাকেই তাড়া দিলাম। বললাম,—কী রকম লোক তুমি হে ? মহিলাটি উঠে আমার সিটে গিয়ে বসলেন, আর তুমি হাঁ করে তাই দেখলে ? একটা কথাও বললে না ?

আমার হিন্দী অন্ধ্র মেশানো ভাষাভঙ্গি কতটা বুঝলো লোকটা জানি না, উত্তর এলো মহিলাটির কাছ থেকে। তিনি পরিষ্কার ইংরেজীতে যা বললেন, তার অর্থ করলে দাঁড়ায়,—ও আমারই লোক। এ-সব বাসে ভিড় থাকে, তাই ওকে রাত থাকতে পাঠিয়েছিলাম বিশাখাপত্তনমে, বাসের একটা প্রথম শ্রেণীর সিটে বসে 'এস্-কোটা'য় আসবার জন্য। আমার এখান থেকেই ওঠবার কথা। লোকটা এ-বাসে আর যাবে না, ও ফিরে যাবে ভিজিয়ানাগ্রাম অন্য বাস ধরে।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল রত্নমও। সে ফিস্‌ফিস্ করে বললো,—উঠে পড়ুন স্যর, জানালার ধারের সিটটাই ত পাচ্ছেন এবার।

আমি উৎসাহিত হয়ে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় সেই পাগড়ী-পড়া লোকটি নিম্নকণ্ঠে কী যেন বললে মহিলাকে। আর তিনি সেটা শোনামাত্রই এগিয়ে এলেন, আমাকে বাধা দিয়ে বললেন,—দাঁড়ান, নেমে যাই।

বলতে না বলতেই নেমে এলেন তিনি। মৃদুকণ্ঠে—মুখ নিচু করে বললেন, —আপনি ভিতরে যান. জানালার ধারের সিটটা আমার।

অগত্যা তা-ই করতে হলো। রত্নম বিরস মুখে ভিতরে গিয়ে বসলো। যাত্রী যারা নেমেছিল, তারা সব উঠে এলো। কন্‌ডাক্টর, ক্লিনার, ড্রাইভার,— তাদেরও সব দেখা পাওয়া গেল!

আস্তে আস্তে গাড়ি ছাড়লো এক সময়। ভদ্রমহিলা যতদূর সম্ভব আমার স্পর্শ বাঁচিয়ে বাঁদিক ঘেঁষে বসেছেন। খানিকক্ষণ বাস চলবার পর তিনি মুখখানা ফেরালেন আমার দিকে, মৃদু কণ্ঠে বললেন,—আপনি অন্নপূর্ণার স্বামী না?

চমকে উঠলাম। আমার স্ত্রীর নাম অন্নপূর্ণা, একথা ঠিক। একটু অবাক হয়েই বললাম,—হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—আমি শকুন্তলা।

কিন্তু নামটা বলা সত্ত্বেও আমার মুখে যখন চিনতে-পেরে-ওঠার চিহ্ন ফুটে উঠলো না, তখন তিনি একটু হতাশ হলেন মনে হলো। এক মুহূর্ত নীরব থেকে তারপর বললেন, অন্নপূর্ণা আর আমি একই স্কুলে চাকরি করতাম। এখন অবশ্য আমি ও-চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভিজিয়ানাগ্রামে আছি। আপনি চিনতে পারছেন না? আমি কিন্তু আপনাকে দেখামাত্রই চিনেছি। নইলে, মেয়েমানুষ হয়ে আগে থাকতে কথা বলতে যাবো কেন পুরুষের সঙ্গে?

একটু বিব্রত হয়েই বললাম,—তা' তো বুঝলাম, কিন্তু, আমি—

বাধা দিয়ে অল্প একটু হাসলেন তিনি, বললেন,—আপনার দোষ নেই, আমি আগের থেকে অনেক মোটা হয়ে গেছি। অনেকেই চিনতে পারে না। বছর

চারেক আগে আপনি আর অন্নপূর্ণা আমার বিয়েতে সাক্ষী হিসাবে সই করেছিলেন মনে পড়ে ? মিস্টার পাম্বলু,—ম্যারেজ রেজিস্ট্রার,—মনে নেই ?

মুহূর্তে যেন বিস্মরণের কালো পর্দাটা সরে গেল। ওঁর মুখের দিকে অবাক হয়েই তাকালাম এবার। বলে উঠলাম—শুধু একটু মোটাই হন নি, রীতিমত ফর্সা হয়ে গেছেন।

হাসলেন মহিলাটি। আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নি। আমার স্ত্রীর অনুরোধ-উপরোধেই 'সাক্ষী'র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম সেদিন, নইলে এঁকে আমি এঁর বিয়ের আগে বার দুই-তিনের বেশি দেখি নি। ঘোর কালো লিকলিকে চেহারা। তার সঙ্গে এই চেহারার মিল কোথায় ? সে তুলনায় ইনি ত এখন রীতিমত সুন্দরী !

শকুন্তলা তেমনি মৃদুকণ্ঠে বললেন,—আরুকুতে যাচ্ছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—এই প্রথম ?

—হ্যাঁ।

—আমিও তাই। এই প্রথম।

আমাদের কথাবার্তা চলাকালীন ড্রাইভার ঘন ঘন আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। এবার একটা বাঁকের মুখে পড়তে সে তার হুইলের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

আমাদের চারদিকে প্রান্তর। তালগাছের জটলা মাঝে মাঝে, কিছু কিছু খেজুর গাছ। আমাদের সামনে সোজা রাস্তাটার পরপারে বিরাট পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

শকুন্তলা জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে শূন্য প্রান্তর লক্ষ্য করছেন। আমি তাকিয়েছিলাম সামনে। বেশ অনুভব করছিলাম, রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে, গ্রাম-ট্রাম পেরিয়ে ধীরে ধীরে অরণ্যভূমিতে আমাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে।

কিছুদূর চলার পর একটা সাঁকো। সাঁকো পেরুবার পরই আমাদের বাসটা হঠাৎ থেমে গেল। ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। বাস বিকল হলো না কি এই জনহীন অরণ্যে ? ড্রাইভার-কনডাক্টর-ক্লিনার সবাই নেমে গেল।

ড্রাইভার তার সিটের নিচ থেকে একটা আস্ত নারকেল বার করে হাতে নিলো। শকুন্তলাও উৎকণ্ঠিত মুখে আমার দিকে তাকালেন, ভিতরের যাত্রীদলে কিন্তু উত্তেজনার বাষ্পও নেই। তাদের কেউ কেউ রাস্তায় নেমে দাঁড়ালেন, এই পর্যন্ত।

—বাবু!

দেখি, রত্নম দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের দরজার কাছে। ড্রাইভাররা তিনজনে রাস্তা দিয়ে নেমে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল। বললাম,—কী ব্যাপার রত্নম?

রত্নম বললে,—ওরা পূজো দিতে গেল। আমরা এখন পাহাড়ে উঠবো কি না? রাস্তা খুব দুর্গম। তাই, বাস যেতে-আসতে এখানে ওরা প্রতিবার পূজো দিয়ে যায়।

একটু নিশ্চিন্তবোধ করলাম। যাক্, তবু ভালো যে বাস বিকল হয় নি সত্যি সত্যি।

রত্নম সরে যেতে শকুন্তলা প্রশ্ন করলেন মৃদুকণ্ঠে, আপনার লোকটি কী বললো, রাস্তা দুর্গম?

—হ্যাঁ।

আর কোনো কথা নয়। রাস্তা যে কতো বেশি দুর্গম আর বিপদসঙ্কুল, সেটা ক্রমশই টের পেতে লাগলাম। বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়। তারই মধ্য দিয়ে পথ কেটে নেওয়া হয়েছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। পাহাড়েরই পাথর ভেঙে, টুকরো করে পথের ওপর ছড়িয়ে পথ তৈরি হয়েছে। এক পাশে অতলস্পর্শী খাদ্, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়—তার মধ্য দিয়েই ভারবাহী পশুর মতো বাসটা ঠেলে উঠছে। এইভাবে চলতে চলতে একটা ছোট্ট গ্রামে এসে আমরা থামলাম। পথের পাশে পাকা বাড়ি পর্যন্ত আছে, চায়ের দোকান, তরকারীর বাজার ইত্যাদি। তার পিছন দিকে নাকি একটা ঝর্ণা আছে ভারী সুন্দর। বাস থামামাত্রই সব যাত্রী ছুটলো সেই ঝর্ণা দেখতে। ড্রাইভাররা জানালো, এইখানে তারা চান-খাওয়া দাওয়া সেরে নেবে। তার মানে—অঢেল সময়।

রত্নম এখানেও নেমে এসে যথারীতি ডাকলো,—বাবু?

আমি ডানদিক দিয়ে ড্রাইভারের দরজা খুলে নেমে আসতে আসতে দেখি সকরুণ চোখে মহিলাটি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বললাম,—আসুন না? ঝর্ণা দেখবেন।

খুশি হয়ে উঠলো ওঁর মুখখানা। দরজা খুলে নেমে এলেন, হাতে ওঁর ছোট্ট ব্যাগটা। রত্নমের ভ্রুদুটি কুঁচকে উঠলো। ভাবখানা এই—কী আশ্চর্য, ওকে আবার কেন?

মহিলাটিকে নিয়ে ঝর্ণা দেখতে যাচ্ছি, রত্নম বললে—এখানে খাওয়াটা সেরে নেবেন স্যর? আরুকু পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে যাবে দেখছি।

বললাম,—না রত্নম, বরং তুমি সেরে নাও।

শকুন্তলার দিকে ফিরে বললাম,—খাবেন আপনি ?

ভদ্রমহিলার মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠলো, মাথা নেড়ে জানালেন,—না। রত্নমকে পার্শ্ববর্তী খাবারের দোকানে বসিয়ে আমরা দুজনে ঝর্ণা দেখতে গেলাম। কাছেই। বনের ডালপালার আস্তরণের আড়াল থেকে হঠাৎই আত্মপ্রকাশ করেছে ঝর্ণাটি। এইটাই ওর বিশেষত্ব। ছোট্ট ঝর্ণা সামান্য ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে, তারপরে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পাথরের ছোট-বড়ো অজস্র নুড়ি চারধারে বিছিয়ে দিয়ে। বাসের যাত্রীরা সৌন্দর্য দেখবার থেকে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেবার তাড়ায় ব্যস্ত। দু তিনজন মহিলাও রয়েছেন দলে। কয়েকটি শিশু। শকুন্তলা আর আমি একটু দূর থেকেই দেখছিলাম ঝর্ণাধারা। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেটি ঝাঁকড়া মাথার একটা গাছের তলা। মাটি থেকে একটা গৈরিক চওড়া পাথরের অংশ জেগে আছে। শকুন্তলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন সেখানকার দৃশ্য দেখে। বললেন, একটু বসি।

—বসুন—আমি বললাম—আমি বরং রত্নমের ওখানে খাওয়ার দামটা দিয়ে আসি।

উনি কিছু বললেন না। আমি ফিরে চলে এলাম রত্নমের কাছে। রত্নমের খাওয়া তখনো শেষ হয় নি। আমাকে সামনে বসতে দেখে খেতে খেতেই বললে,—ঐ মেয়েটিকে আপনি জানেন বাবু ?

—কেন বতো ও ?

রত্নম বললে —মেয়েটিকে নিয়ে, আমার পাশে যে ভদ্রলোক সস্ত্রীক বসেছেন তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হচ্ছিল। তাঁকে মেয়েটি না চিনলেও মেয়েটিকে তিনি চেনেন। ভিজিয়ানাগ্রামে এখন থাকে, ব্যাঙ্কে চাকরি করে। আগে মাস্টারী করতো, বদনাম হওয়ায় সে চাকরি গেছে।

—বদনাম কিসের ?

রত্নম বললে—স্বভাবচরিত্র নাকি ভালো না। চার বছর আগে বিয়ে করেছিল, বিয়ের একবছর যেতে না যেতেই স্বামীকে ডাইভোর্স করে দিয়েছে। তাই বলছিলাম, আপনি ওর সঙ্গে—

—থাক রত্নম, ও আলোচনাটা না করলেও চলবে।

আমি ওর কাছ থেকে উঠে আবার গেলাম শকুন্তলার কাছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন ঝর্ণার দিকে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চমক ভাঙলো। বললে,—বসুন ?

নিশ্চুপেই পাশে গিয়ে বসে পড়লাম একটু দূরত্ব রেখে অবশ্য। বললেন, ভারী সুন্দর জায়গাটি, না?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলে উঠলাম,—আচ্ছা একটা কথা বলবো?

ভারী কোমল আর স্নিগ্ধ মনে হলো চোখের দৃষ্টি, বললেন,—বলুন?

প্রশ্ন করলাম,—আরুকুতে যাচ্ছেন কী বেড়াতে? কোনো আত্মীয়স্বজন—?

মহিলাটি মুখ নিচু করে অল্প একটু হাসলেন, তারপরে বললেন,—আপনি অন্নপূর্ণার স্বামী, আপনি আমার বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন. আপনাকে বলতে আর বাধা কী?

তারপরেই, একটুক্ষণ থেমে শুরু করলেন,—যাচ্ছি আমার স্বামীর কাছে। ভদ্রলোক রাস্তাঘাট তৈরি করার ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে দিন কাটে। সম্প্রতি চিঠি পেয়েছি, আরুকুতে এসেছেন। তাই দেখা করতে চলেছি।

শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি আমার ভ্রু-দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। যতদূর স্মরণে আছে, ওর স্বামী ছিলেন ওঁর মতো কোনো এক স্কুলের শিক্ষক, তিনি কি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছেন? কিন্তু, তাই বা কেমন করে হবে? ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ না করলে—?

আমার মনের ভাব বোধহয় বুঝতে পারলেন শকুন্তলা। আর বুঝতে পেরে একটু বোধহয় লজ্জাই অনুভব করলেন। তেমনি মুখ নিচু করেই ধীরে ধীরে বললেন,—আপনি বোধহয় ধাঁধায় পড়েছেন। না, প্রথম স্বামী নন, ইনি আমার দ্বিতীয় স্বামী। তাঁর সঙ্গে আমার 'বিচ্ছেদ' হয়ে গেছে অনেকদিন। শুনেছি, তিনি অন্যত্র বিয়ে করে সুখেই আছেন।

ভদ্রমহিলার অনুত্তাপ, নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। আর আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে ম্লান একটু হাসলেন শকুন্তলা, ধীরে ধীরে তেমনি নিরুত্তাপ কণ্ঠেই বলতে লাগলেন,—অন্নপূর্ণাকে বলবেন, আমিও সুখে আছি। আমি আজকাল চাকরি করছি ভিজিয়ানাগ্রামে, একটা ব্যাঙ্কে, আর ইনি আমার বর্তমান স্বামী সারা ভারত ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অবসর মতো আমাকে ডাক দেন, আমিও ছুটে যাই। দু-একদিন তাঁর কাছে থেকে আবার ফিরে আসি।

বলে উঠলাম,—এতটা যখন আমার কাছে বলে ফেললেন, তখন একটা প্রশ্ন করবো?

—করুন না? বলেই মৃদু একটু হাসলেন,—আপনাকে আমি 'বন্ধু' হিসেবেই গ্রহণ করেছি, নইলে কী এত সব বলতাম?

বললাম,—আচ্ছা? একসঙ্গে থাকলেই ত' পারেন। অবশ্য, আপনার পক্ষে চাকরি করা খুব প্রয়োজন কি না, ঠিক বুঝতে পারছি না?

অল্প একটু হাসলেন শকুন্তলা. বললেন,—টাকার জন্য চাকরি আমার না করলেও চলে, কিন্তু—

—কিন্তু?

শকুন্তলা একটু অসংলগ্নভাবেই যেন বলে ফেললেন,—একটা-কিছু অবলম্বন ত চাই!

—অবলম্বন! অবলম্বন ত'—স্বামী!

শকুন্তলা আবার একটু হাসলেন, বললেন,—দেখুন, পুরুষ নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা হলো দু-দুবার,—এঁরা দুজনে দু-রকম অবশ্য, কিন্তু স্ত্রী-সম্পর্কে আসল দৃষ্টিভঙ্গি দুজনেরই এক। আচ্ছা, আপনাকে যদি অন্নপূর্ণা সম্পর্কে একটা পাল্টা প্রশ্ন করি, আপনি কি রাগ করবেন?

—না—না, বলুন না।

শকুন্তলা বললেন,—ওকে বিয়ে করেছেন, অথচ ওকে চাকরি করতে দিচ্ছেন কেন?

বললাম,—আমি দেবার কে, বলুন? আপনারা কি সব-সময় আমাদের কথা শুনে চলেন?

শকুন্তলা বললেন,—সন্তান ত একটিও আপনাদের সংসারে আসে নি এখনো, আমি সে-খবর রাখি। ঝঞ্ঝাটও কম। আর্থিক কারণে যে অন্নপূর্ণা চাকরি করছে না, এটা অনুমান করতে দেরি হয় না,—তবে সে চাকরি করছে কেন জানেন? অন্য কোনো অবলম্বন নেই বলে। সত্যি করে বলুন ত, অন্নপূর্ণা আপনার প্রাত্যহিক জীবনে কতোখানি? স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে যে-সব ধারণা আমাদের ছিল, সে-সব আজ ইতিহাসের কথাবস্তু। কিন্তু না, আপনাদের দুজনের কথা দিয়ে উদাহরণ টানা আমার উচিত হচ্ছে না। আমি বলবো আমার নিজের কথা। আমি নিজে জানি, আমার স্বামীর কাছে আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনের বস্তু মাত্র তার বেশি কিছু নয়, আমার কথা তিনি ভাবেন কতটুকু? কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন একটু অবসর পান, তখন হয়ত মনের মধ্যে একটা জৈবিক তাড়না অনুভব করেন, আর তখনই আসে টেলিগ্রাম।

এখ্খুনি চলে এসো। আর আমিও অনুগত ভৃত্যটির মতো যেরকম করে হোক চাকরিতে ছুটি নিয়ে ওর ডাকে সাড়া দিতে চলে যাই।

আমি বিস্মিত হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলাম। মুখখানা একটা চাপা উত্তেজনায় আরক্ত হয়ে উঠেছে, ঠিক কাকে বলছেন সেদিকে বোধহয় তেমন আর সচেতনতাও নেই। 'উচ্চারিত চিন্তা' বোধহয় একেই বলে।

উনি একটুক্ষণ থেকে থেকে আবার অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—অবশ্য এর অন্য একটা দিকও আছে। আর আছে বলে জীবনটাকে মেনে নিতে পেরেছি। ছাড়াছাড়ি ভাবে থাকার ফলে, এবং স্বাধীন উপার্জনে রত থাকার জন্য আমাদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই অর্জিত ব্যাক্তিত্বটুকুই লাভ, কী বলেন?

—ঠিক বুঝলাম না।

—বুঝে কাজ নেই!—বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বললেন,—বাসের ভেঁা শুনছেন না? ঐ দেখুন, আপনার লোকটিও ছুটে আসছে।

দেখতে দেখতে রত্নম এসে পড়লো দৃষ্টি পথে। সে হাত নেড়ে ডাকছে,—বাবু চলে আসুন, বাস ছাড়ছে!

উঠে দাঁড়ালাম। চকিতের জন্য তাকিয়ে দেখি, সেই আশ্চর্য ঝর্ণাটির কাছ থেকে স্নানার্থীর দল কখন বিদায় নিয়ে চলে গেছে!

দ্রুত হেঁটে গিয়ে বাসে উঠলাম। কিন্তু এরপরই শুরু হলো পথের সত্যিকার দুর্গমতা। একপাশে অতলস্পর্শী খাদ, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়। রাস্তা সরু, তার ওপর দিয়ে মুহুর্মুহু বাঁক নিতে লাগলো গাড়িটা। শকুন্তলা এক-এক সময় ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে আমার গায়ের ওপর এসে পড়তে লাগলেন। বললাম,—আপনি বরং ভিতরে আসুন, আমি জানালার ধারে বসি।

—আপনার ভয় করবে না?

—আমি শত হলেও—পুরুষ।

আর কিছু বললেন না শকুন্তলা। ড্রাইভারকে বলে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা স্থান বদল করে নিলাম।

গাড়ি চলতে লাগলো। এর পর একটা জায়গায় গাড়ি এসে পৌঁছতেই বাস শুদ্ধ যাত্রী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। তাকিয়ে দেখি খাদের নিচে একটা ভাঙা বাস উল্টে পড়ে আছে দুমড়ে-মুচড়ে।

ভিতর থেকে কে যেন বললে,—পরশুদিন ঘটেছে ব্যাপারটা। এ-রাস্তায় প্রায়ই ঘটে।

শকুন্তলার মুখখানা ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি আমার হাতখানা আঁকড়ে ধরেছেন তিনি। অস্ফুট, ভীতকণ্ঠে বলে উঠলেন,—না এলেই হতো দেখছি।

ড্রাইভার দৃঢ়হাতে ধরে আছে 'স্টিয়ারিং'টা', চোখের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। সেই অবস্থাতেই সে বলে উঠলো,—ঐ পাহাড়ের চূড়োতে উঠতে পারলেই—ব্যস, আর ভয় নেই।

—ওখান থেকে 'আরুকু' কতোটা ?

ড্রাইভার বললে —তা অনেকটা পথ। ওটা হচ্ছে ঠিক আধাআধি জায়গা।

ড্রাইভার-কথিত সেই 'আধাআধি' জায়গাতে পৌঁছেই কিন্তু বিপর্যয় ঘটলো। একটা ছোট ডাক-বাংলো ছাড়া কিছু নেই। ডাকবাংলোটা ছাড়িয়েছি মাত্র এমন সময় কী করে যেন বাস-এ গন আগুন ধরে। মুহূর্তে কী যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, তা বর্ণনাতীত। আমি লাফ দিয়ে নেমেই শকুন্তলাকে টেনে নামালাম। কী যে কোথায় হতে লাগলো জানি না, একজন লোক বাসের মাথায় উঠে তাড়াতাড়ি বাক্স প্যাটরাগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে চারিদিকে ফেলতে লাগলো। রত্নম দৌড়ে কাছে এসে প্রশ্ন করলো,—আপনি ঠিক আছেন, বাবু ?

—তা' আছি।

বাক্স প্যাটরা আমাদের কিছু ছিল না, কিন্তু শকুন্তলার ছিল। একটি চামড়ার বড়ো স্যুটকেশ, খাকী রঙের ঘেরাটোপ পরানো। রত্নমের চেষ্টায় সেটা খুঁজে বার করা হলো। রত্নম অবশ্য খুবই বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সে আমাদের এক জায়গায় বসিয়ে রেখে ডাক বাংলোর চৌকিদারের কাছে ছুটে গেল। সবাই যখন আগুন নেভাতে, কিম্বা নিজেদের জিনিষপত্র কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত,—তখন সে আমার কাছে ছুটে এসে পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে গেল।

এবং, ভাগ্যে নিয়ে গিয়েছিল। কেউ আহত টাহত হয় নি অবশ্য, আগুনও যত শীঘ্র সম্ভব আয়ত্তে আনা গেল, কিন্তু বাসটি হয়ে গেলো সম্পূর্ণ অকেজো। বাসের সামনের দিকটা একেবারে ঘোর কালো বর্ণ ধারণ করেছে। একটা আহত জন্তু যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নিশ্চুপে।

যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই এদিক-ওদিক গ্রামে চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। অধিকাংশই তারা দেহাতী। আমরা জনা-ছয়েক ভদ্রলোক শুধু আটকা পড়লাম, সঙ্গে শকুন্তলা এবং আরেকটি 'বধূ'কে ধরলে আট। আমাদের আটজনেরই গন্তব্যস্থল ছিল 'আরুকু'।

এইবার সবার 'আক্রমণস্থল' হয়ে দাঁড়ালো ডাকবাংলোটি। রত্নমের কৃপায়

একটি ঘর আগে থাকতেই 'রিজার্ভ' হয়ে গিয়েছিল বলে রক্ষা। ঘর বলতে আর একটিই ছিল মাত্র। আমাদের তিনজনকে ছেড়ে দিয়ে ওরা পাঁচজন ঢুকলো অন্য ঘরখানায়।

দুখানি খাট পাতা ছিল ঘরে। তার ওপর বসে বিশ্রাম করছি। রত্নমও বসেছে জড়োসড়ো হয়ে একটা খাটের কোণে, সে বললে,—স্যর, আজ আর যাওয়া হবে না।

—সে কী!

ও বললে, ড্রাইভার করেছে কী, ক্লিনারকে পাহারায় রেখে কণ্ডাক্টরকে নিয়ে ছুটেছে পায়ে হেঁটে 'আরুকু'। ওরা ওখানে পৌঁছে আর একখানা 'বাস' নিয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যে! তা' যে-রাস্তা দেখলেন, তার ওপর দিয়ে সন্ধ্যাবেলা গাড়ি চালানো যায় কী?

— আরে বাপ, নির্ঘাৎ খাদে পড়বো তাহলে!—বললাম,—রুটের বাস আর নেই?

—না স্যর,—রত্নম বললে,—এই একখানাই যায়, আর একখানা আসে।

বললাম,—তা, না হয় বিশাখাপত্তনমে ফিরেই যাবো। কী বলেন, আপনি?

মহিলাটি উত্তর দেবার আগেই রত্নম বলে উঠলো,—সেটি ত' ফিরে গেছে, স্যর।

—কখন? পথে দেখলাম না ত'!

রত্নম্ বললে,—'এস-কোটা'তে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। আপনি লক্ষ্য করেন নি?

একটু উঁচু গলাতেই বলে উঠলাম,—তাহলে রত্নম্, আজ রাতটা আমাদের 'আরুকু'তেই কাটাতে হতো, কী বলো?

—হ্যাঁ স্যর।

—বলো নি ত' তুমি? বেডিং নিয়ে আসতাম।

ও জিভ্ কেটে উঠলো,—ছিঃ বাবু—আমার আত্মীয়ের বাসা আছে ওখানে বলেছি না? আপনার কোনো কষ্ট হবে না। ওটা একটা মহকুমা-শহর। হোটেল-মোটেলেরও অভাব নেই। যদিও খুব ছোট্ট শহর।

তখনো বিরক্তি আমার কাটে নি। বললাম,—যাই বলো, আর ওখানে যাচ্ছি না। এখন পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।

—ফিরে যাবেন?

—হাঁ।

—কাজের কী হবে ?

—হবে না।—বলে উঠলাম,—এ রকম-পথ জানলে আমি কিছুতেই রাজী হতাম না। আসতে।

রত্নম্ অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—ঠিক আছে বাবু। ফিরেই যাওয়া যাবে। আমি দেখি, মালীকে পাঠিয়ে চা-টা কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা !

ও চলে যেতেই শকুন্তলা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলেন, বললেন,—আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে।

—কেন ?

—কে জানে ! খাঁচা-থেকে-ছাড়া-পাওয়া পাখীর মতো লাগছে নিজেকে।

সেটি একটি বিচিত্র দিন বলা যায় আমার জীবনে। ওঁকে ঘরে রেখে আমি বেরিয়ে পড়লাম। পাশের পাঁচজনও যেন একটা অস্থায়ী সংসার পেতেছেন, কেন্দ্রমণি সেই বৌটি। ওদের আর কোনদিকে দৃষ্টি নেই। আমার কিন্তু ভীষণ বিশ্রী লাগছিল প্রথমটায়। আমি ডাকবাংলোর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে এসে সেই পুড়ে-যাওয়া বাসটির কাছে দাঁড়ালাম। মৃত একটা জন্তুর মতো পড়ে আছে। তার সামনে দিয়ে রাস্তা এঁকে-বেঁকে গেছে,—কখনো নিচে নেমে,—কখনো ওপরে উঠে।

কতক্ষণ যে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ চমক ভাঙলো পায়ের শব্দে। দেখি পাশের পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথ বেয়ে দুটি মানুষ নেমে আসছে। একটি পুরুষ, একটি রমণী। দুটিই বয়সে তরুণ। ছেলেটির গা খালি, পরনের ধুতিটা কোমরে শক্ত করে গুটিয়ে বাঁধা, হাতে লাঠি। পিছনের মেয়েটির পরনে খাটো একটা শাড়ী। সাদা খোলের ওপরে বড়ো বড়ো ফুলের ছাপ। পায়ে রুপোর বড়ো বড়ো মল। গায়ে চোলি-জাতীয় কালো রঙের খাটো জামা, হাতে একরাশ কাঁচের চুড়ি, গলায় পুঁতির মালা, কানে পিতলের ছোট ঝুমকো, নাকের গয়নাটা অদ্ভুত। নাকের দুই দিকে দুটি ছোট্ট পেতলের ফুল, ছোট পেতলের চেন্ দিয়ে যুক্ত করা। মেয়েটির মাথার কালো চুল ঠিক সাঁওতালী মেয়েদের মতো করে খোঁপা-বাঁধা। দুটি তীক্ষ্ণ চোখ আমার ওপর স্থাপিত করেই ছেলেটির গা ঘেঁষে চলতে লাগলো। সাঁওতালদের মতো মিশ্‌কালো গায়ের রঙ নয়, বরং একটু হল্‌দে হল্‌দে ছাপই লক্ষ্যে পড়ে।

নির্জনে, যেখানে একটা পাখীও ডাকছে না, সেখানে দুটি তরুণ-তরুণীর নীরবে পথ চলা বড়ো অদ্ভুত লেগেছিল সেই মধ্যাহ্নে। ক্রমে ক্রমে ওরা মিলিয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। আমি ফিরতেই দেখি, বাংলোর দিক থেকে রত্নম্ আসছে দ্রুতপায়ে সম্ভবত আমাকেই খুঁজতে।

—বাবু ?

—কী ?

রত্নম্ কাছে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। রীতিমত উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। বললে,—মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হলো। স্যর, আমরা কনট্রাক্ট পাবার জন্য যে বড়ো অফিসারটির কাছে যাচ্ছি 'আরুকু'তে, মহিলাটি তাঁরই কাছে যাচ্ছেন। বলছেন, তিনি নাকি ওঁর স্বামী।

—তাই নাকি !

—হ্যাঁ।

বললাম—তা হলে ত' বেশি করে খাতির করতে হয়। মনে হচ্ছে, কনট্রাক্টটা পেয়ে যাবো, কী বলো ?

রত্নম্ আমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুর না মিলিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললে—কিন্তু স্যর···

—কী ?

—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—কেন ?

রত্নম্ বললে,—আমি সেই অফিসারটিকে ত' চিনি। ভদ্রলোকের স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় ! কতো গল্প শুনেছি ! ওখানকার বুনো মেয়েদেব ধরে এনে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—তার সঙ্গে এ-মহিলাটির সম্বন্ধ কী ? ইনি দেখছো শিক্ষিতা, ভদ্রমহিলা,—ইনি ওঁর স্ত্রী হবেন না কেন ?

রত্নম্ বললে,—অফিসার-ভদ্রলোকটি অন্ধ্রদেশীয় লোক নন, ক্যানারীজ বোধ হয়। তিনি কী—

গম্ভীর হয়ে বললাম,—দেখ রত্নম্, আমি ত' বাঙালী হয়েও অন্ধ্রদেশীয়াকে বিয়ে করেছি। তাতে হয়েছে কী ?

রত্নম্ লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলো। বললে,—না-না--আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না। তবে, এক্ষেত্রে—

একটু ধমকের সুরেই বললাম,—ওসব কথা চিন্তা করো না। চলো দেখি, কী করছেন তিনি ?

গিয়ে দেখি, শকুন্তলা নিজের হাতে চা করছেন মালীর সাহায্য নিয়ে। আমরা যেতেই সহাস্যে এগিয়ে দিলেন কাপ। তারপরে বললেন,—জানেন ? কাছেই, মানে, মাইল দুয়েক দূরে একটা আদিবাসী গ্রামে আজ হাট বসেছে। হাটে সব পাওয়া যায়। পাশের লোকেরা যাচ্ছে। আপনারা যাবেন ? তা হলে, বাজার-টাজার করে বেশ ফিস্ট করা যেতো।

রত্নম্ কিছু বললে না, গম্ভীর হয়ে রইলো। আমি বললাম,—তার থেকে আর একটা কথা ভাবছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে আরুকু চলে গেলে কেমন হয়? আপনার স্বামীর কাছেই আমরা যাচ্ছি, জানেন তা?

মহিলাটি অল্প একটু হেসে বললেন,—মিঃ রত্নমের কাছে শুনলাম। হয়ে যাবে আপনাদের কাজ।

বললাম,—আপনার অবশ্য হাঁটতে কষ্ট হবে, কিন্তু আমাদের আর তর সইছে না! বুঝছেন ত।

শকুন্তলা বললেন,—যাই বলুন, অতো হাঁটতে আমি পারবো না। 'আরুকু' এখানে নাকি?

বলতে বলতে বসে পড়লেন ধপ্ করে মেঝের ওপরে, বললেন—আপনারা যদি যেতে চান, চলে যান। ওকে গিয়ে বলবেন আমি কাল সকালে যাবো। এই পাহাড়ের চূড়ায়, এই আশ্চর্য ব্যাপ্তির মধ্যে একটা দিন আমি কাটিয়ে যাবোই।

অদূরে মালীর দেখা মিললো আবার। সঙ্গে একটি আদিবাসী মেয়ে। এ-ও পরেছে খাটো ছাপা শাড়ী, এরও চুল বাঁধা সাঁওতাল মেয়েদের মতো করে। মেয়েটির কাঁখে ছিল কলসী, কোন ঝর্ণা থেকে জল ভরে এনেছে বুঝি আমাদের জন্য।

নতুন মাটির জল-ভর্তি কলসীটা ঘরের কোণে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই শকুন্তলা তার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদের ভাষায় কী যেন জিগ্যেস করলেন, মেয়েটি বুঝতে পারলো না, সলজ্জ একটু হাসলো মাত্র। শকুন্তলা ওর নাকের গয়নাটা হাত দিয়ে দেখলেন। ওর চিবুকে হাত দিয়ে একটু আদরও করলেন। মেয়েটি আমাদের সামনে লজ্জা পাচ্ছে দেখে তাকে ভিতরের বারান্দায় নিয়ে গেলেন টেনে—আমাদের দৃষ্টির আড়ালে।

রত্নম্ আমাকে চুপিচুপি বললেন,—কী করবেন স্যর?

খাটের ওপর বসে পড়েছি ততক্ষণে, বললাম,—রত্নম্ কাজের ইন্টারেস্টেই থেকে যেতে হচ্ছে। যাবে নাকি হাটে?

রত্নম্ এসব ব্যাপারে সত্যিই উৎসাহী। বললে,—তা যেতে পারি। পাশের লোকেরা তো যাচ্ছে, ওদের সঙ্গে চলে যাই। টাকা দিন। চাল-ডাল-তরকারী সব নিয়ে আসি।

টাকা বার করে দিলাম ওর হাতে। বললাম,—আমি সঙ্গে যাবো নাকি?

—কী দরকার স্যর—রত্নম্ বললে—আপনি বরং ওঁকে খুসি রাখার চেষ্টা করুন। কী জানি যদি সত্যি সত্যি সেই অফিসারটির ওয়াইফ হন ইনি।

বলতে বলতে হন্‌হন্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রত্নম্‌। আমি বসে রইলাম চুপচাপ। বেশ কয়েকটি মুহূর্ত পরে শকুন্তলা ভেতরে এলেন। মুখখানা অদ্ভুত এক খুসির জ্যোতিতে ভরা। পা-দুখানিও কী এক অভাবিত উল্লাসে বুঝি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আমার চোখে চোখ পড়ায় উনি বলে উঠলেন, —এই, উঠুন ত' একটু? বাইরে যান। আমি ডাকলে আসবেন।

ওঁর হাতের মুঠিতে কী যে একটা ছিল, সেদিকে চোখ রেখে বলে উঠলাম, —ওটা কী!

ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে উনি বললেন,—বলবো কেন!

আমি আর কিছু না বলে ত্বরিত পায়ে ঘরের বাইরে চলে এলাম।

পাশের ঘরটির সামনে সেই বউটি আর তার স্বামী রেলিং-এ ঝুঁকে দূরদিগন্তের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমার দিকে চোখ পড়তেই বউটি তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে বাংলোর চৌহদ্দির বাইরে—একটা বড়ো পাথরের ওপরে উঠে দাড়ালাম। এখান থেকে অতলস্পর্শী খাদ নিচে নেমে গেছে। তাকালে মাথা ঘুরে যায়। খাদের পরপারে আবার পাহাড। পাহাড় আর অরণ্য।

শকুন্তলার সেই কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো। কী এক বিষণ্ণতা যেন ঘিরে আছে ওর জীবনকে, যার কিছু ও ব্যক্ত করতে পারে, কিছু পারে না। ওর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আমার স্ত্রী অন্নপূর্ণার ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখখানি মনে পড়লো। সত্যিই ত', আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ওদের স্থান কতটুকু? কতোটুকু ভাবি ওদের কথা? স্ত্রী যদি শুধু ঘরের গৃহকাজ নিয়েই মগ্ন থাকতো, তাহলেও একটা অপ্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের কথা আসতো, কিন্তু যারা বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসেছে, তারা? তাদের সেই অর্জিত 'ব্যক্তিত্ব'? সেই ব্যক্তিত্বের মূল্য কতটুকু দিই আমরা?

—কী করছেন এখানে?

পিছন থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই চমকে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে আরও অবাক হলাম। নাকের গয়নাটাই আমাকে অবাক করলো বেশি। নাকের দুপাশে ছোট দুটি পেতলের ফুল, একটি আবার সরু চেন দিয়ে বাঁধা।

বুঝলাম, শকুন্তলা সেই মেয়েটির কাছ থেকে এটিকে হস্তগত করেছেন। শুধু তাই নয়, শকুন্তলা বুঝি সত্যিই তপোবনবাসিনী শকুন্তলা হয়ে গেছেন! মাথায় খোঁপা বেঁধেছেন সাঁওতালী ধরনে, কানে ফুল পরেছেন, অবশ্য সোনার।

হাতের চুড়িও সোনার, গলার হারও সোনার। গায়ের চেলিটিও দামী, শাড়ীটি দামী হলেও ছাপা শাড়ী, পরেছেন খাটো করে আদিবাসীদের ধরনে।

বললেন,—কী, চিনতে পারছেন না?

বললাম,—অদ্ভুত দেখাচ্ছে কিন্তু!

মুখে একটা সলজ্জ হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো। মুখখানা একটু নিচু করে ধীরে ধীরে বললেন,—আমরা ত' সিঁথিতে সিঁদুর পরি না, কিন্তু এরা পরে, আপনাদের বাঙালী মেয়েদের মতো। এ-মেয়েটার বিয়ে হয় নি, তাই সিঁদুর পাওয়া গেল না, নইলে সিঁদুরও পরতাম।

বললাম—হঠাৎ এ সখ?

অল্প একটু হেসে বললেন—খেয়াল। কেন, আপনার কি অপছন্দ হচ্ছে?

বললাম—আমার পছন্দ-অপছন্দে কী আসে যায়?

বললেন—যদি এই বেশে, এই এখানে সারা জীবন থাকতে পারতাম!

কাছে এসে বললাম—বেশিদিন থাকতে পারতেন না—ক্লান্তি আসতো।

বললেন—না, আসতো না। আমি ভুলে যেতাম আমার অতীত। আমি ভুলে যেতাম আমি কলেজে লেখাপড়া শিখেছি—দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে আমি পরিচিত—একথা ভুলে যেতাম।

আমি মুখ নিচু করলাম। অদূরে মালী আর সেই মেয়েটাকে আবার দেখা গেল। তাদের দেখে কলরব করে উঠলেন উনি। বললেন—ও মশাই শুনুন? আপনি একটু ঘর পাহারা দিন, বুঝলেন। আমি ওদের সঙ্গে হাটে চললাম।

অবাক হয়ে বলে উঠলাম—সে কী!

বললেন—ভয় পাবেন না—কোনো বিপদ হবে না আমার—ওরা আমার সঙ্গে থাকবে।

বললাম—দেখুন, রত্নম্ কিন্তু হাটে গেছে।

বললেন—বেশত'। আমি যা খুসি কিনে আনবো। আপনার জন্য যা হোক একটা প্রেজেণ্ট। কী, অনুমতি দিচ্ছেন ত?

বললাম—বারে, আমি কি আপনাকে অনুমতি দেবার মালিক?

চোখের তারা দুটি নাচিয়ে বলে উঠলেন—আপাতত।

বলেই আর দাঁড়ালেন না, ছুটে গেলেন ওদের কাছে, বন্যহরিণীর মতো।

বেলা প্রায় তিনটে, এমন সময় নির্জন রাস্তাটায় বহু পদধ্বনি শোনা গেল। পাশের লোকজনদের সঙ্গে ফিরে এলো রত্নম্, একটা আদিবাসী লোকের মাথায় নতুন-কেনা হাঁড়িকুড়ি সব চাপিয়ে।

আমি সেই পাথরটার ওপরই বসেছিলাম। কাছের একটা ঝাঁকড়া-মাথা অচেনা গাছ ছায়া দান করছিল আমাকে, রত্নম্ কী সুন্দর হাট করেছে, জিনিস-পত্রের দাম কত সস্তা, এসব সবিস্তারে বোঝাচ্ছে আমাকে। আমি ওকে একসময় বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, শকুন্তলা কোথায়?

ও হতবাক হয়ে গেল। অস্ফুটকণ্ঠে বললে—তার মানে?

বললাম ওকে সব কথা। ও বললে—ভয়ানক ভিড় ওখানে আদিবাসীদের, আমি তাঁর মধ্যে। ওঁকে ঠিক চিনতে পারি নি।

বললাম—মালীকে দেখেছিলে?

রত্নম্ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে কী যেন জিনিস কিনছিল একা।

—তার সঙ্গের মেয়েটি?

রত্নম্ বললে—অতটা লক্ষ্য করি নি। ভাবছেন কেন, ফিরে আসবেন।

হ্যাঁ, ফিরে অবশ্য ওরা এলো প্রায় সন্ধ্যাসন্ধি। মালীর সঙ্গে সেই মেয়েটিও ছিল, শকুন্তলাও ছিল। বাংলোর কাছে আসামাত্র শকুন্তলা রীতিমত ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করলো দরজা।

রত্নম্ বললে—কী হলো?

মালী বললে—ভয় পেয়েছেন।

—কেন।

মালী অল্প একটু হেসে চুপ করলো। মেয়েটা হেসে ফেললো ফিক্ করে। ওদের কাছ থেকে আর কোনো কথা বার করতে না পেরে রত্নম্ বললে—যান আপনি যান, দরজায় ঘা দিন।

—ঘর তো অন্ধকার। একটা বাতি যোগাড় করো।

মালী গোটাকয়েক হেরিকেন বার করে দিলো। একটি হেরিকেন ধরিয়ে আমি গেলাম দরজার কাছে। অন্য একটা হেরিকেন হাতে সেই আদিবাসী মেয়েটি চলে গেল রাস্তার দিকে। সম্ভবত একা মেয়েটি তার গ্রামে ফিরে গেল।

দরজায় ঘা দিতেই দরজা খুলে গেল।

—কী হয়েছে আপনার।

শকুন্তলা সেই বেশবাস খুলে ফেলেন নি। শুধু হাট থেকে কিনে আনা একটি ছোট ঝুড়ি রয়েছে মাটিতে পড়ে, তাতে টুকিটাকি জিনিস রয়েছে।

—অমন করে ছুটে এলেন কেন?

ভয় পেলে মানুষ যেমন করে কথা বলে, তেমনি করে শকুন্তলা বললেন—

আমি কী করবো বলুন। আমি ত' জানতুম না। হাটে যে ওদের বিয়ে হয়, আমাকে কি কেউ তা বলেছে! হাটে ঘুরতে ঘুরতে দেরি হয়ে গেল। আবছা আঁধার হয়ে আসছে, আমরা ফিরে আসবো, এমন সময় একটা লোক হুড়মুড় করে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল। আমার মাথাটা জোর করে ধরে কী যেন ঘষে দিলে। আলোটা নিয়ে দেখুন, কী করে দিয়েছে!

আলোটা তুলে ধরে দেখি, সত্যিই, সিঁথিটা সিঁদূরে মাথামাথি।

—আমি কিছু বুঝবার আগেই বলতে লাগলেন শকুন্তলা—দেখি, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। ভাগ্যি চিৎকার করে উঠেছিলাম। আমার সঙ্গের মেয়েটি আমাকে অন্য হাতে ধরে একটা ঝট্‌কা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলো। তারপরে, এমন ভিড়, কোথায় যে লোকের ভিড়ে ভিড়ে ছিটকে এলুম কে জানে। দেখি মেয়েটা আমার হাত ধরে আছে ঠিক। আমাকে ইঙ্গিতে বললে—পালিয়ে চলো।

—তারপর?

শকুন্তলা বললেন—তারপর আর কী। মালীকে খুঁজতে লাগলুম দুজনে। হাটের পাশে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল মালী। আমরা জোরে জোরে পা ফেলে চলে এলাম। যা ভয় করছিল না!

—ভয় কেন?

শকুন্তলা বললেন—আমাকে আদিবাসী মেয়ে ভেবে যে আমার মাথায় সিঁদূর দিলো, সে আমাকে খুঁজবে না? খুঁজে খুঁজে যদি এখানে আসে?

হেসে উঠলাম এবার। বললাম—পাগল! এলেই বা? আপনি এসব ছেড়ে ফেলুন।

ভদ্রমহিলা কিন্তু আশ্চর্য মানুষ, পোশাক ছাড়লেন না, এমনকি সিঁথির সিঁদূরও মুছলেন না, বললেন—যাক না, দেখাই যাক না কী হয়! যদি আসে কেড়ে নিতে, আপনি ত' রইলেন বীরপুরুষ, যুদ্ধ করতে পারবেন না?

বললাম—কাড়তেও কেউ আসছে না, যুদ্ধও কেউ করছে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তার পরের কথা অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি মালীর সাহায্যে রান্নাবান্না করলেন, রাত আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সব হয়ে গেল। আমি রত্নমরে সাহায্যে একটি খাট ভিতরের বারান্দায় নিয়ে এলাম। রত্নম্ মালীর কাছ থেকে একটি খাটিয়া সংগ্রহ করে আনলো। ভদ্রমহিলা দরজা ভেজিয়ে ভিতরে শুয়ে পড়লেন।

সবাই রাত্রির প্রশান্তিতে নিমগ্ন। পাশের ঘরের 'সংসার' থেকেও আর

কলরব ভেসে আসছে না। ওঁরাও আমাদের মতো ব্যবস্থা করেছেন। স্বামী-স্ত্রীকে ভিতরে দিয়ে বাকী তিনজন বাইরে শুয়েছেন।

রাত তখন অনেক। সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হঠাৎ কী একটা চিৎকার-কলরবে ঘুমটা ভেঙে গেল। দরজা খুলে শকুন্তলা বাইরে এলেন ভয়ার্ত আর্তনাদ করতে করতে—শীগগির আসুন—বাইরে একটা লোক।

হৈ হৈ চিৎকার। আলো নিয়ে খোঁজাখুঁজি। কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। ভদ্রমহিলা খোঁপা খুলে ফেলেছেন, নাকের গয়নাও অপসারিত, কিন্তু মোছেননি সিঁথির সিঁদুর আর পরনের ছাপা শাড়ীটা।

তাকিয়ে দেখি, ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে মুখ। আমি ওঁর ঘরের ভিতরে গিয়ে জানালাগুলো ভালো করে বন্ধ করে দিলাম। বললাম—ভয় কী, আপনি শুয়ে পড়ুন।

—বড্ড গরম হবে না?

বললাম—কিন্তু জানালা খুললে যে আপনি ভয় পাবেন।

উনি বললেন—ভালো করে খুঁজে দেখেছেন, কেউ এসেছিল কি না?

বললাম—আপনার মনের ভুল। কে আসবে?

বললেন—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, সেই চওড়া বুকের ছাতি, দুটি উৎসুক চক্ষু, আমি কি তাহলে ভুল দেখলুম!

—হ্যাঁ, ভুল ছাড়া আর কী। বলে উঠলাম—শুয়ে পড়ুন আপনি। এখনো রাত আছে অনেক।

—হ্যাঁ, শুচ্ছি। জানালা খুলে দিন।

দিলাম। দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছি ঘর থেকে, উনি এসে খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন—আসুন না ঘরে। আলোটা জোর করে দিয়েছি দেখছেন না। ঘুমোবো না, বসে বসে গল্প করবো, কেমন?

একটুক্ষণ থেমে থেকে বললাম—আমি কণ্ট্রাক্টর, আপনার আদেশ অবশ্যই আমাকে শুনতে হবে, কারণ আপনি আমার অফিসারের স্ত্রী।

হঠাৎ আমার বাহুমূলে মাথাটা রেখে সিঁথিটা ঈষৎ ঘষতে ঘষতে উনি আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন—না, না, আমি কারুর স্ত্রী নই। প্রথমে যে বিয়েতে আপনি সাক্ষী ছিলেন, সে বিয়েটা সরকারী অনুষ্ঠান মাফিক হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে মৌখিক কণ্ট্রাক্ট ছিল এক বছরের মাত্র। সবটাই আসলে ভুয়া। Intellectual companionship বোঝেন, আমি ছিলাম তাই। আমার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে আসলে আমার বিয়েই হয় নি, টাকার বিনিময়ে—!

বলতে বলতে দুটি চোখ দিয়ে ধারা নামলো তাঁর—আমি উচ্চশিক্ষিতা, কিন্তু আমার এ কি প্রফেসন হলো বলুন ত? স্কুল-কলেজে পড়তে পড়তে যৌবনের প্রথম লাবণ্যে ভাঁটা পড়লো, তারপরে চাকরি করতে করতে বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। আমার সেই 'অর্জিত ব্যক্তিত্ব' এদের আকর্ষণ করে, নিছক নারীত্ব নয়। এই ভদ্রলোক অর্থাৎ আমার তথাকথিত দ্বিতীয় স্বামী, ইনি আদিবাসী মেয়েদের উপভোগ করতে করতে ক্লান্তি অনুভব করলে তখনই intellectual companionship-এর জন্য আমাকে টেলিগ্রাফ করেন। অবশ্য প্রতিবারের জন্য আমাকে উনি টাকা দেন, মোটা টাকা দেন।

আমি একটু অবাক হয়েই ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে উনি আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছলেন, বললেন—আমার ভয় হচ্ছে—ভীষণ ভয় হচ্ছে, যে আমার সিঁথিতে সিঁদূর দিয়েছে তার জন্য। কিন্তু আমি ভয়ে মূর্ছা গেলেও তার উচিত ছিল আমাকে ডাকাতের মতো জোর করে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া! অমি সুখী হতাম—সত্যি সুখী হতাম!

—সর্বনাশ! তাই কি পারে মানুষ!

আবার এসে আমার দু'টি হাত ধরলেন তিনি, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন—পারে, নারী পারে। সত্যি বলছি সভ্যতা, শিক্ষা—এসব আমি কিছুই চাই না! এ সবই মেকী!

বললাম—আমারও যে কতখানি ভয় হচ্ছে, তা তুমি জানো না শকুন্তলা। ভয় হচ্ছে অন্নপূর্ণার জন্য।

—কেন।

বললাম—যদি কোনদিন ওর মধ্যেও তোমার এসব চিন্তা আসে!

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে, বললো—অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণাই, শকুন্তলা নয়। শকুন্তলাও শকুন্তলা হতো না, যদি না আজ এমন করে আমার সিঁথিতে সিঁদূর পরতো! যাও না একটু বাইরে, খুঁজে এসো না তাকে। হয়ত ভয়ে ভয়ে সে আশে-পাশেই ঘুরছে।

—তাকে আনলে কী করবে তুমি?

শকুন্তলা বললে—বলবো, আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাও। আমার চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই তুমি শুনো না—যারা আমার হয়ে রুখে আসবে, তোমার হাতের লাঠি পড়বে তাদের ওপর।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললাম—তোমার ভাষা সে বুঝবে না।

—চাই না আমার ভাষা তাকে বোঝাতে!—বলে উঠলো শকুন্তলা—বরং তার ভাষা আমি ধীরে ধীরে শিখে নেবো।

আস্তে আস্তে ওকে টেনে নিলাম কাছে। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—এতটা ভাবপ্রবণতা ভালো নয়। শুয়ে পড়ো। আমি জেগেই রইলাম। ভোরে বাস আসবে—আরুকুতে চলে যাবো, কেমন?

লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমার কথা শুনে ও বিছানায় শুয়ে পড়লো। আমিও ধীরে ধীরে বাইরে এলাম। রত্নম্ জেগে উঠেছিল জানি, কিন্তু সাড়া দিলো না।

আমি শুয়ে পড়ে 'ঘুমোবো না, ঘুমোবো না' করতে করতেও ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো একটু বেলাতেই। রত্নমের উত্তেজনা। বাইরে বাসের ভোঁ। জেগে উঠতেই রত্নম্ বললে—স্যর আপনার চিঠি।

—মানে?

হাতে নিয়ে দেখি, ছোট একটি কাগজ। শকুন্তলার স্বাক্ষর। লিখেছে—'সবাইকে বোলো, আমি ফিরে গেলাম।'

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—কোথায় গেছেন তিনি?

—জানি না স্যর।

—বাস?

—বাস যাচ্ছে বিশাখাপত্তনম। আপনি চলুন।

—উনি?

—বাসে ওঠেন নি।

—তাহলে?

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বাসের দিকে গেলাম। না বাসের কোন আসনেই সে নেই।

—গেল কোথায়?

মালী কোনো খোঁজ দিতে পারলো না, কেউ কোনো খোঁজ দিতে পারলো না।

বললাম—এ বাস ছেড়ে দাও। আরুকুতে যাবো।

—সে তো অনেক দেরি হবে।

—হোক অনেক দেরি।

বাস হর্ন বাজিয়ে ছেড়ে দিলো। আমি মালীকে দিয়ে সন্ধান করাতে লাগলাম আদিবাসীদের গাঁ-গুলিতে। সেই পরিত্যক্ত হাটের জায়গাটিতেও

গেলাম। খুঁজে বার করলাম সেই মালীর সঙ্গিনীটিকে। কিন্তু সেও কোনো সন্ধান দিতে পারলো না।

সন্ধান পাওয়া গেল বিকেলের দিকে। একটি ঝাঁকড়া মাথা আদিবাসী তরুণ তার মৃতদেহটি কাঁধে বহন করে আনলো। আমাদের বাংলোর পিছন দিকের উঁচু পাথরটা থেকে সে ঝাঁপ দিয়েছিল।

ধমক দিয়েছিলাম ছেলেটিকে—ওর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছিল কে?

সে কথার কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

জেওয়ার

যুদ্ধপূর্ব যুগে আন্দামান বললে পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলের বিভীষিকার কথাই আমরা আগে বুঝতাম। কিন্তু আজ আর আন্দামান বন্দীদের উপনিবেশ নয়। এখন সরকারী কাজে, জীবিকার খোঁজে বহু লোকের এখানে সমাগম হয়েছে। আর এসেছে বাংলার নিরাশ্রয়ী নরনারীর দল নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজে।

বহু ছোট-ছোট দ্বীপ নিয়ে বঙ্গোপসাগরের বারিবিধৌত এই আন্দামান, —সংখ্যায় দু'শোরও ওপরে। এর মধ্যে 'বৃহৎ আন্দামান' যাকে বলে, সেই দ্বীপটিই প্রসিদ্ধতম। রাজধানী পোর্ট ব্লেয়াবকে কেন্দ্র করে কিছুদূর পর্যন্ত সভ্যতার বিস্তৃতি, তারপর থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত গভীর অরণ্য।

এই অরণ্য আন্দামানের অন্যতম সম্পদ। সবকারী বনবিভাগেব উদ্যমে ও রক্ষণাবেক্ষণে এখানকার কাঠের ব্যবসা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। বনভূমির প্রান্তে ক্রমাগতই কুঠার পড়ছে, বনস্পতি খুটিযে পডছে মাটিব ওপর, বসতিও বাড়ছে। বনের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত ট্রলির লাইন পাতা। বিচ্ছিন্ন বৃক্ষকাণ্ডের বড়ো বড়ো টুকরো ব'য়ে নিয়ে ট্রলিগুলি সাব দিযে যাতায়াত করে। স্তূপীকৃত কাঠ পডে থাকে মাঠে, সেখান থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের দেশলাই কারখানা অথবা করাত কলে চালান যায়।

কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়, নির্বিঘ্নও নয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা যায়, বনের মধ্যে ট্রলির লাইন খোলা, লাইনের টুকরো উধাও। সরকার মহলে তখনই সাড়া পড়ে যায়, তখনই সশস্ত্র পুলিসের দল আসে। কিন্তু তাতেই শুধু হয় না, সামন্তের মতো লোকেরও দরকার পড়ে।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, জারুয়া। নানাবিধ লোক এসেছে এখানে, নানা সূত্রে। দীর্ঘ বন্দীজীবন যাপনের পর আর দেশে ফিরে যায়নি, এখানেই বাসা বেঁধে স্থায়ী হয়ে গেছে, এমন লোকও বিরল নয়। সরকারী পরিভাষায় যাদের 'লোকাল বর্ন্' বলা হয়, তাদের মধ্যে নানা সংকর জাতির এইভাবে উদ্ভব হয়েছে। বাঙালী, পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশীয়, বিহারী, মাদ্রাজী, বর্মিজ, মোপলা প্রভৃতি ছাড়া নানাশ্রেণীর আদিবাসীর সাক্ষাৎ মেলে। এরা শহরের কাছে বড় একটা ঘেঁষে না। এদের মধ্যে অনেকে কাজের খোঁজে শহরের প্রান্তে যে

এসে বাসা বাঁধেনি এমন নয়; এমন কি, ক্রমে ক্রমে এদের মধ্য থেকে এক শ্রমিক গোষ্ঠীরও যে উদ্ভব না হচ্ছে তা নয়,—তবু এদের বৃহত্তর অংশ এখনো সভ্যতা-ভীত। দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে সমাজবদ্ধ হয়ে এক সঙ্গেই এরা থাকে.—সভ্যসমাজ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। ছোট আন্দামান দ্বীপটিতে এইরকম এক-শ্রেণীর অর্ধসভ্য আদিবাসীদের দেখা যায়, তাদের বলে, অঙ্গি। আরেকশ্রেণীকে বলে,—আরুয়া। মাছ ধরা, শিকার করা, এমন কি, চাষ-আবাদও ওদের কেউ কেউ করে। কিন্তু এরা ক্ষতিকর জাত নয়। সভ্যসমাজ এদের সংস্পর্শে এসেছে।

কিন্তু অসভ্য জারুয়ারা হিংস্র। এরা আন্দামানের সব থেকে ভীষণ ও সব থেকে রহস্যময় জীব। ট্রলির লাইন উপড়ে সেই লাইনের লোহা থেকে ওরা তীরের ফলা বানায়, সেই ফলায় থাকে মারাত্মক বিষ মেশানো। সহসাই এদের দেখা যায় না, গহন অরণ্যে কিম্বা পরিত্যক্ত দ্বীপগুলিতে এদের বাস। এরা বন্য, এরা বর্বর। এদের পবনেও যেমন কোনো আবরণ নেই, মনেরও নেই আবরণ। একেবারে আদিম, উদ্দাম। অরণ্যের অন্তরালে থেকে এরা বিষমাখানো তীর চালায়, অব্যর্থ এদেব সন্ধান, মুহূর্তে সভ্য আন্দামানের নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ জাগে, বন্দুক নিয়ে ছুটোছুটি, হৈ-চৈ, হাঁকডাক। কিন্তু জারুয়াবা ততক্ষণে যেন ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে।

সামন্ত প্রত্যক্ষভাবে সরকাবী লোক না হলেও জারুয়া-শাসনে সরকারের পক্ষে অপরিহার্য। তুষনাবাদ অঞ্চলের একেবারে প্রান্তে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে কয়েক ঘর অনুগত আরুয়া ও 'রাঁচি কুলি' অর্থাৎ ভারত থেকে আগত মুণ্ডা ও কোল—এই এদের নিয়ে ওর বাস। বনবিভাগের চিহ্নিত গাছ কেটে ট্রলি বোঝাই করার ঠিকাদারীই ওর প্রধান কাজ। জঙ্গলে গাছ-কাটা কুলিদের ওপর ওর অসাধারণ প্রতিপত্তি। ওরা ওদের ভাষায় ওকে ভালবেসে বলে,—'জংলী সাহেব।'

'জংলী সাহেব' স্বভাবে-ব্যবহারে বাস্তবিকই 'জংলী'। জংলীদের সঙ্গে বাস করে করে ওদেরি মতো অর্ধসভ্য বেপরোয়া জীবনযাপন তাব। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, বয়স শেষেব দিকে হেলে পডতে পডতে এক জায়গায় এসে যেন থমকে আছে। পেশীবহুল দৃঢ় শবীব, মাথাব চুলে পাক ধবলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার দিতে, বন্দুক চালাতে সে এখনো সমান পটু। চলনে-বলনে হাঁকডাকে জরাকে যেন বহু দূরে হটিয়ে রেখেছে সে।

একটা খাটো খাকীর হাফ প্যান্ট, মোটা চামডাব বেল্ট দিয়ে কোমরে আঁটা, তার একপাশে ঝুলছে সরকার থেকে দেওয়া তার সুবিখ্যাত সঙ্গী জাপানী কোল্ট পিস্তল, পায়ে একটা বিবর্ণ কালো চামডার বুট জুতো, মাঝে মাঝে মাথায়

একটা রঙ্-চটা সোলার হ্যাট শোভা পায় বটে, কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো আবরণই নেই। এই পোশাকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র। শুধু জাহাজ আসার দিনে পোর্টব্লেয়ার অথবা এবার্ডিনের সরকারী অফিসে যখন যায়, একটা খাকীর সার্ট ঝুলিয়ে নেয় গায়ে, দাড়ি কামাবার কথা শুধু সেইদিনই মনে পড়ে। সেইদিনই পক্ষকালের মতো টাকা তুলে আনে পোস্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক্ থেকে। ওর ব্যবসার যা কাগজপত্রের কাজ, সে করে দেয় শহরের বিম্বীলাইনের একটি কেরানীবাবু। শুধু দরকার মতো কাগজপত্রে সই করে আর সেই বাবুটিকে মাসে কিছু হাত-খরচ বাবদ দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। আর কিছু ভাববার নেই।

জাহাজ-আসার দিন সব প্রবাসীরই দেশের খবরের কথা মনে পড়ে। সেই নিয়মে ও'ও আসে চাথাম জেটিতে। 'মহারাজা' জাহাজের এদিক-থেকে-ওদিকে একবার অলস দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আগ্রহশীল জনতার ভিড় কাটিয়ে ও চলে আসে সরকারী অফিসে, তারপরে সেই বাবুটির কাছে। একটা যন্ত্রের মতোই জিজ্ঞাসা করে, দেশের খবর কেয়া হায়?

সেই বাবুটিও নিয়মমত উত্তর দিয়ে যায়,—ভালোই হায়!

সামন্তর আর কোনো প্রশ্ন নেই। নিয়মমতো ঐ সংবাদ জিজ্ঞাসা ছাড়া দেশ সম্বন্ধে তার কোনো আগ্রহও নেই। দীর্ঘ দিনের আন্দামানবাসী সে, ভাষাও হয়ে গেছে বিচিত্র,—হিন্দী-উর্দুর ক্রিয়ায় ঢাকা বাঙলা শব্দ আর বাঙালী টান।

সামন্ত এককালে বাঙালীই ছিল: বীরভূম না সিংভূমে বাড়ি। শোনা যায়, একটি নারীঘটিত অপরাধে ও খুনের দায়ে এখানে আসে। দীর্ঘ কারাবাসের পর আব ফিরে যায়নি, দেশের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। বন্দী-জীবনে নিরীহ, শান্ত ও অনুগত হিসাবে তার সুনাম ছিল। পরবর্তী জীবনে জারুয়াদমনে অথবা জংলী কুলিদের বশে রাখায় সে সরকারের বিশেষ সাহায্যেই এসেছে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে সরকারী কৃপা যে তার ওপর বর্ষিত হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ওঁরা ওকে জংলীদের সর্দার বলেই মনে করেন, ওঁদের চোখে সে জংলীই আজকাল, জংলীদের মধ্যে যা খুসি সে করুক দেখবার দরকার নেই, শুধু সভ্যসমাজে বিশৃঙ্খলা না আনলেই হলো।

সামন্ত তাই সভ্যসমাজ থেকে দূরে আছে। এই জংলীদের মধ্যে, এই জঙ্গলে, শালীনতার একেবারে বাইরে, কৃত্রিমতা থেকে শত যোজন তফাতে, সে সুখেই আছে। উদ্দাম, অবারিত তার জীবন এখানে। জঙ্গলের সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক!

জঙ্গলের প্রান্তে জংলীদের মতই ওর মাচা-বাঁধা কাঠের বাসা। বাসার পরেই পাহাড়, জঙ্গল, গভীর অরণ্যানী যেন ওকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মতই আহ্বান করে।

ওর জংলীর দল নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে ও জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ে। এক-একটা গাছ যেন এক-একজন প্রবল পরাক্রান্ত সৈনিক। এক-একটা কাটা পড়ে, আর সে অদম্য উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। তারপরে দলবল নিয়ে শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই পতিত বৃক্ষকাণ্ডের ওপর, টুকরো টুকরো করে গড়িয়ে দেয় ট্রলির গহ্বরে। কিন্তু জারুয়ার ভয়ে জংলীরা, বিশেষ করে রাঁচি-কুলি অর্থাৎ কোল-মুণ্ডারা বড় সন্তর্পণে থাকে, আর সন্ধ্যা নামতে-না-নামতেই নেমে আসে জঙ্গল থেকে। মাঝে মাঝে দিনে দুপুরেই কাজ ফেলে ছুটে চলে আসে, তারা, ভীতত্রস্ত কণ্ঠে বলে,—জারুয়া!......সামন্তর হাঁক ডাকেও ফিরে যেতে চায় না। অরণ্যের কোন্ কোণ থেকে যেন গম্ভীর একটা শব্দ উঠছে—গুম্—গুম্! জারুয়াদের সংকেতসূচক ঢোলের ধ্বনি। সামন্ত তার কোল্ট্ পিস্তল দিয়ে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে,—শব্দ থেমে যায়। তবু জংলীর দল সেদিন আর কাজের দিকে ঘেঁষতে চায় না। সামন্তর প্রধান অনুচর আরুয়া বুড়ো জেঠু তার ভাষায় কাঁপা গলায় বলে,—না সাহেব, যেতে বলিস নি. ওরা এসেছে।

দু'একবার দু'একটা জারুয়া অতর্কিতে ধরাও যে না পড়েছিল এমন নয়,—একেবারে নিরাবরণ বন্য সেই মানুষ। বন্য পশুর মতোই কাঁচা মাংস খায়, জন্তুর মতোই হিংস্র, বন্যদের মতোই সন্ধানী। বাঁধন ছিঁড়ে অদ্ভুত কৌশলে তারা পালিয়ে গেছে, গুলির ঘায়েও মরেছিল কেউ কেউ। একেবারে মূর্তিমান আদিম প্রকৃতি, আমাদের সভ্যতার জাল অপসারণ করলে আমাদের চেহারাও বোধ হয় অমনি ভয়াল, দুর্দান্ত, নিঃশঙ্ক!

জংলীর দল জারুয়াদের ভয়ে ত্রস্ত। ওরা মনে করে, জারুয়ারা মানুষও খায়। আজকাল বিশেষ করে ওদের ভয়টা যেন বেশি—যখন অরণ্য কেটে বসতি বিস্তার চলছে। অরণ্যে কুঠার পড়লেই জারুয়াদের আক্রোশ যেন বাড়ে। ওরা যেন আদিম অরণ্য-সন্তান, কুঠারাঘাতে অরণ্যমায়ের দেহে যখন আর্তনাদ জাগে, ওরা তখনি বুঝি রুখে দাঁড়ায়! ওদের জনসংখ্যা আজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে; বিশেষজ্ঞরা বলেন, আজকাল একশোরও কম। তবু ওরা সভ্য জনপদের বিভীষিকা, একথা স্বীকার করতেই হবে। অরণ্যে ওদের হাত থেকে নিস্তার নেই। জামা-কাপড় পরনে দেখলেই ওরা ধনুকে তীর যোজনা করবে, আবরণের ওপর ওদের অসীম বিদ্বেষ। বন্ধুত্বপূর্ণ যতই ইঙ্গিত করো না কেন, তোমার আবরণকে কখনই বিশ্বাস করবে না। ওরা বিচিত্র।

অবশ্য যতই বন্য ওরা হোক, ওদেরও ভীতি আছে। পারতপক্ষে সভ্য বসতির ধারে ওরা ঘেঁষে না। কিন্তু তোমরা যদি ওদের বসতির দিকে হাত

বাড়াও, ওদের জীবনযাত্রার চির অন্ধকার রহস্যকে যদি ভেদ করতে গহন অরণ্যে এগিয়ে যাও, ওদের প্রতিরোধের তীক্ষ্ণ বিষ উদ্যত হয়ে উঠবে বৈ কী!

তাই সামন্ত তার যেটুকু প্রয়োজন, সেইটুকুই অরণ্য-প্রবেশ করে; ঠিক ওর অনুচরদের মতো। তার বেশি অগ্রসর হবার উৎসাহ নেই। ওরা এসে পড়ে তার এলাকায়, সে তার পিস্তল নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়তে রাজী, কিন্তু তার বেশি নয়। থাকুক ওরা ওদের বন্যতা নিয়ে গহন অরণ্যে, অনর্থক ওদের শান্তিভঙ্গ করে লাভ কী?

এপারে সভ্যজগতের ক্রমবসতি, ওপারে জারুয়াদের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ অরণ্য; সভ্য-অসভ্যের মাঝখানে সে আছে প্রহরীর মতো সীমারেখার পাহারায়! সভ্য ও অসভ্য জগতের মাঝখানে যে অদৃশ্য সীমারেখা টানা রয়েছে, ঠিক সেই-খানেই সে আর তার জংলী-দল—সভ্য ও অসভ্যের মধ্যে সেতু-বিশেষ।

কিন্তু সভ্য ও অসভ্যের মধ্যে সত্যকার সীমারেখা কি টানতে পেরেছে মানুষ? সারাদিনের ক্লান্তির পর যখন দিক্‌বিদিক্ অন্ধকারে একাকার করে দিয়ে রাত্রি নামে—তখন সীমার বাঁধন খুলে ফেলে জেগে ওঠে উদ্দাম আদিম মন,—কোথায় ভেসে যায় বিধিনিষেধের বেড়াজাল,- অরণ্যর গন্ধ আর হাওয়া তাকে পাগল করে দিয়ে যায়। কোলমুণ্ডাদের পল্লীতে মাদল বাজে, আরুয়া পল্লীতে বাজে বাঁশি। আখের গুড় থেকে গোপনে চোলাই করা মদ নিয়ে আসে আরুয়া বুড়ো জেঠু। নিরুদ্ধ যৌবন যেন জরার প্রান্তে এসেও কথা কয়ে ওঠে!

জেঠুর যেন আজকাল কেমন-কেমন লাগে। কোলেদের প্রধান লছমনকে চুপিচুপি বলে—জংলী সাহেবের রকম দেখছিস কয়দিন ধরে?

কী?

বহুদর্শী আমাদের জেঠু, বলে,—কেমন উদাস-উদাস ভাব। কেমন চুপচাপ ভাবে। কাজকর্মে আর তেমন আঠা নেই সাহেবের। হলো কী? সাঙ্গি আর যত্নআত্তি করে না নাকি সাহেবকে?

সাঙ্গি ওদেরই জাতের একটি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যুবতী মেয়ে। জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে,—আমাকে আর মনে ধরছে না সাহেবের। আমি ওর ঘরে থাকব না।

জেঠু ধমকে ওঠে,—থাকবি না ত করবি কী? ওকে রেঁধেবেড়ে দেবে কে? কে আছে আর সাহেবের?

আহা! মুখ ঘুরিয়ে বলে ওঠে সাঙ্গি। ভাবটা এই, সাহেবের মেয়ের অভাব!

জেঠু ধরেছে ঠিক, সামন্ত কেমন যেন অন্যমনস্ক প্রকৃতির হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কার ছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। একথা কাউকে বলার

নয়। বললে ওরা ভয় পাবে। সরকারী অফিসে জানাতেও মন চায় না। এখনও কোন ক্ষতি ত করেনি তারা? দেখাই যাক না। দরকার হলে বড়-সাহেবকে খবর দিতে হবে বই কি!

জেঠু বললে,—সাহেব, বাঙলাদেশ থেকে লোকগুলান আসছে, তাতেই তোর মনটা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

একটু চমকে উঠলো সামন্ত, বললো, কেন রে, একথা মনে উঠল কেন?

না, তাই বলছি।

জেঠু তাড়াতাড়ি সরে যায়। সামন্ত দেখেছে নূতন লোকগুলিকে। তারা কেউ চাষী,—পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে লাঙল চ'ষে ধান বুনবার চেষ্টা করছে। তা'ছাড়া কেউ কুমোর, কেউ ছুতোর, নানা ধরনের লোক। এ গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে এসে, অবশ্য একটু দূরে, একেবারে তাদের পল্লীর গা ঘেঁষে নয়। তাদের কাছ ঘেঁষা মানে জঙ্গলের কাছ ঘেঁষা।

লছমন বলে,—এক একটা চাষী লোক তিন-তিনটে মোষ পাইছে গো, দুটো লাঙলটানার জন্য, একটা দুধ দেবার জন্য। আর নগদ টাকাও কিছু। ঐ যে টিন দিয়ে বাসা করছে দেখছিস না?

জেঠু একদিন বলে,—আরে লছমন, ইখানে জমি নিলো কে, ই জংলী-সাহেবের জমির লাগোয়া?

চালা বাঁধছে, বাস করবে দেখছি। এরা কারা?

লছমন বলে,—পিরান পরা বাঙালীবাবুদের মতো দেখাচ্ছে যেন!

—জঙ্গলের কাছটি ঘেঁষছে, ভয়-ডর নাই?

ভয়-ডর কী? জংলীসাহেব রইছে নাই?

জংলীসাহেবের কিন্তু এসবে দৃকপাত নেই। এরা আসছে নিরাশ্রয় হয়ে,—তা আসুক, বাঁধুক এখানে ঘর। তাতে তার কী! সরকারী লোক বলে দিয়েছে,—ওদের দেখো সামন্ত, তোমারই ওপর ভার, ওরা যেন কোনো বিপদে-আপদে না পড়ে!

সামন্ত মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে এসেছে। বিপদ-আপদ এখানে কী? যদি কিছু ঘটে ত তারই ঘটবে, আর কারুর নয়।

হয়ত বিপদ আসন্ন। মনটা কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরে থাকে সব সময়। মনে হয় নিদারুণ কোন দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার জীবনে। আসন্ন বিপদের পদধ্বনি সে যেন শুনতে পেয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে তার বাসাকে ঘিরে সেই বিপদ যেন সন্তর্পণে ঘুরে বেড়ায়। একি মনের ভ্রম?

কিছুদিন আগেকার ভুলে-যাওয়া ঘটনাটি তার আবার মনে পড়ছে আজকাল।

এক সন্ধ্যায় কাজের শেষে পাহাড় থেকে নামবার মুখে অতর্কিতে এক জারুয়াকে ধরে ফেলেছিল ওরা। ম্লানায়মান অন্ধকারে ছায়ার মতোই দাঁড়িয়েছিল একটা গাছের আড়ালে। কিন্তু পালাতে পারেনি। আন্দামানের মন্দগতি জীবনে এ এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। হয়ত পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে, হাঁটতে পারছিল না ভালরকম। দলবিচ্ছিন্ন একক এক জারুয়া। তাকে বেঁধে নিয়ে এসে রাখা হয়েছিল তারই পাশের ঘরটাতে। সামন্ত তখন আনন্দে আত্মহারা হললেই হয়। সরকারে তার নাম উঠবে, ইনামও কিছু পাওয়া উচিত তার।

জেঠুর বাসা থেকে টলতে টলতে ফিরছিল সামন্ত, পিস্তল হাতে, একা। সেই ঘরটি খুলে বন্দীকে ভাল ক'রে দেখতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সামন্ত। চালের কাঠের সঙ্গে হাত দুটি শক্ত করে উঁচু করে বাঁধা, নিচে পা দুটোও বাঁধা, মুখেও কাপড় জড়ানো, যাতে শব্দ করতে না পারে বা কামড়াতে না পারে, ওদের দাঁত নাকি হিংস্র পশুর মতই তীক্ষ্ণ। জটার মতো চুল ঝুলছে কাঁধের দু'পাশ দিয়ে, চোখে ভয়ার্ত বন্য দৃষ্টি, এই প্রথম লক্ষ্যে পড়ল তার,—নিরাবরণ জারুয়াটি নারী এবং অল্পবয়সী যুবতীই হবে সে।

কিন্তু গভীর রাত্রে কী একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। পিস্তল নিয়ে বেরুতে দেখা গেল দ্রুতগতি দুটো ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎবেগে তার সামনে দিয়ে নেমে জঙ্গলে ঢুকছে। মুহূর্তে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছিল সামন্ত, প্রবল উত্তেজনায় তার পিস্তল থেকে গুলি ছুটল, একটি ছায়ামূর্তি যেন পড়েও গেল মাটিতে।

পিস্তলের শব্দে বল্লম হাতে ছুটে এলো জেঠু আর তার দল, ছুটে এলো লছমন তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই। কে বা কারা বন্দিনীকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে কৌশলে। মশাল জ্বালিয়ে পিস্তলের শব্দ করতে করতে অরণ্যে কিছু দূরে গিয়েই ফোঁটা ফোঁটা রক্তের সন্ধান পাওয়া গেল, তারপর এক জায়গায় চাপ চাপ রক্ত। সেইখান থেকে মাটিতে ভারী কোন কিছু টেনে নিয়ে যাবার স্পষ্ট দাগ। ওরা কিছুদূর গিয়েই ফিরে এলো, কাউকে দেখা গেল না। সামন্ত বুঝল, একজন ওদের কেউ নিশ্চয়ই গুলিতে মরেছে, নয়ত গুলিতে আহত।

ঘটনা এইটুকু, কিন্তু মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে গেল চমৎকার। জনৈক ইংরেজ সেনাপতির পর জারুয়া ধরায় তারই নাম বিখ্যাত হয়ে রইল! কিছুদিন কেটে গেল এইভাবে, কিন্তু তারপর থেকে কী যেন হলো সামন্তর, কিছুই ভালো লাগে না। সাঙ্গিকে ডেকে একদিন বললে, কোলেদের মতো কাপড় পরেছিস কী? তোদের সেই জাতভাইদের মতো বাকল পরতে পারিস না!

সাঙ্গি ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে! সাহেব বলে কী, বুকখোলা

জংলীদের খাটো পোশাক সাহেবের পছন্দ হবে কেন? 'জংলী সাহেব' নিশ্চয়ই মস্করা করছে!

এই অস্থিরতাও একদিন মিলিয়ে গেল সামন্তর, কিন্তু কয়েকদিন হলো তার আবার ভাবান্তর হয়েছে। সাঙ্গি বলে,—ঘুমুতে ঘুমুতে চমকে চমকে ওঠে সাহেব, পিস্তলটা তাড়াতাড়ি বাগিয়ে ধরে। বলে—শুনছিস!

তীব্র প্রতিহিংসায় কে যেন তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়ত তার গুলিতে মরে গেছে সেই বন্দিনী জারুয়া নারী, তার পুরুষ সঙ্গীটি শোকে ক্ষিপ্ত হয়ে তার সর্বনাশ সাধনের পথ খুঁজছে। সেও সতর্ক থাকে সব সময়। কিন্তু সাঙ্গিকে সরাতে হবে, ওকে ওর প্রিয়জন মনে করে ওর ওপর না ওরা কিছু ক'রে বসে। সাঙ্গিকে একদিন তাই বললে, বাড়ি যা। আর এখানে আসবি না কোনদিন।

সাঙ্গি বলে ওঠে,—সে কী, রান্নাবান্না করে দেবে কে তোর?

বেশ। দিনমানে থাকিস, সন্ধ্যা হতেই চলে যাস কাজ সেরে। বুঝলি?

সাঙ্গি কেঁদে ফেলে। সামন্ত তার চুল ধরে এক টান দিয়ে বলে, ন্যাকামী করিস না। বাসায় যা। কথা না শুনলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো!

বৃত্তান্ত শুনে জেঠু বলে, কী হ'ল সাহেব, ওকে তাড়ালি কেন?

ভাল লাগছে না কিছু, থাক না ওর বাসায় কিছুদিন।

প্রবীণ সাদা মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে জেঠু বলে, বুঝেছি। বাতাস লাগছে তোর। নতুন পরান খুঁজছিস।

চুপ কর তুই। ধমকে উঠল সামন্ত, বুড়ো বয়সে ভীমরতি। সে সব কিছু নয়, আমায় এখন কিছুদিন একলা থাকতে দে।

জেঠু আর কিছু না বলে চলে যায়। কী সে বুঝল কে জানে? সব কথা ত ওদের বলা যায় না। এখুনি ওরা ভয়-ডর পেয়ে সোরগোল তুলবে! দেখাই যাক না, কতদূর কী হয়। জানালা-দরজা বেশ ভালো করে বন্ধ করেই সে শোয়, তবু জেগে-জেগে ওঠে একটু পরে পরেই, বন্য বিরহীর দীর্ঘশ্বাস যেন তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

কিন্তু দিনের প্রখর আলোয় সব আশঙ্কাই বিলীন হয়ে যায়। জারুয়াদের জন্য সরকারী অফিসে সাহায্য চাইবার যে ব্যবস্থা সে করবে ঠিক করেছিল, তা স্মরণ ক'রে দিনের বেলায় তার হাসিই পায়। দিনে সে পূর্ণ উদ্যমে কাষ্ঠ সংগ্রহে ব্যস্ত। হাঁক-ডাক, হৈ-চৈ, গোলমালে পল্লীটি অস্থির। যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি সে কাটিয়ে এসেছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, সেই বঞ্চিত

ক্ষুধিত যৌবন জীবন-সায়াহ্নে উদগ্র হয়ে উঠেছে, যেন পেয়ালা পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে অমৃতের ধারা। তাই যুবকের চেয়েও সে দৃঢ়, যুবকের চেয়েও সে উদ্যমশীল, নির্ভীক। মধ্যাহ্নে সাঙ্গি এলো তার খাবার নিয়ে। হাতে-গড়া মোটা কয়েক টুকরো পোড়া রুটি, কিছু ফেনসুদ্ধ ভাত, আর শুঁটকী মাছ পোড়ানো, এক এক গেলাস দুধ। এই তার দৈনন্দিন খাদ্য। আহারে-বিহারে এই জংলীদের সঙ্গে তার কোনো তফাতই নেই। খালি গা প্রখর রৌদ্রে ঘামে ভিজে গেছে। মাথায় মুখে কিছু জল দিয়ে সেই অবস্থাতেই গাছের ছায়ায় খেতে বসলো সামন্ত। জঙ্গলের অনেকটা ভিতরে আজকাল কাজ চলছে তাদের। এখান থেকে রৌদ্র মাথায় করে বাসায় ফিরতে চায় না কেউ। আর সব কুলি-কামিনরা ত সেই ভোরেই মাথায় খাবারের বাটি বসিয়ে কাজে আসে। শুধু সামন্তেরই আছে সাঙ্গি। নইলে সব মেয়ে-মরদকেই জঙ্গলে আসতে হয় কাজে। কেবল বুড়ীরা থাকে বাসায় ছেলেপিলে আগলাতে। অকারণ স্ফূর্তিতে টগবগ করছিল আজ সামন্ত, সাঙ্গির খোঁপায় এক টান মেরে বলল, অমন মুখ ভার করে বসে আছিস কেন? টাকা চাই?

ছাই তোর টাকা!

তবে?

সাঙ্গি হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কাঁদিস কেন? সামন্ত বলে, নাঃ, তোরা দেখি একেবারেই সভ্য-ভব্য হয়ে গেছিস! তোদের জংলী ভাইবোনদের দেখ্ গিয়ে। মাছ ধরছে, হরিণ শিকার করছে, বল্লম ছুড়ছে, কান্না কাকে বলে তারা জানে না! নানকৌরী দ্বীপে গেছিস? তোর মতো শাড়ী পরে না মেয়েরা, গাছের বাকল।

সাঙ্গির চোখ দুটো যেন তখন জ্বলছে, বললে, তোর জন্যেই ত।

হো-হো করে হেসে ওঠে সামন্ত, বলে, আমিও তো জংলী।

সাঙ্গি রোষভরে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। ভাবটা এই—আহা তুই জংলী হতে যাবি কিসের জন্য।

দেখ সাঙ্গি, সামন্ত বলে, যাবি ঐ জঙ্গলের ভিতরে? অনেক দূরে! জারুয়াদের সঙ্গে থাকব—জারুয়াদের মতন! তোর শাড়ীও দরকার নেই, গাছের বাকলেরও না!

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে সাঙ্গি চেয়ে থাকে ওর দিকে। হয়েছে কী জংলী সাহেবের! পাগল হলো না তো!

—সত্যি সাঙ্গি, সামন্ত বলে যায়—তোদের ঘরবাড়ি, পোশাক-আশাক,

টাকা-কড়ি, কাগজপত্র কিছুই আমার ভালো লাগে না! এসব যেন ফাঁকির কারবার। ঐ জারুয়াই সাচ্চা!

এসবও সাজির বোঝবার কথা নয়, সে এর মধ্যে কী যেন আশঙ্কার সন্ধান পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, জারুয়ারা তোকে খেয়ে ফেলবে, জঙ্গলে-টঙ্গলে যাস না!

হেসে ওঠে সামন্ত, বলে, কেনরে, খাবে কেন আমাকে? কী করেছি?

তুই ওদের ওপর হামলা করেছিস না? জখম করেছিস না একটাকে? ওরা কিন্তু কিছু ভোলে না!

স্তব্ধ হয়ে যায় সামন্ত। তার অন্তরের শঙ্কায় ছায়া কি দেখতে পেয়েছে এই মেয়ে? তারও ত এই দিনরাত্রির চিন্তা!

কী ভাবছিস, সাহেব?

জংলী সাহেব হো-হো করে হেসে উঠল এবার, কী মনে ক'রে পিস্তলটা বার ক'রে ওপরে উচিয়ে শূন্যের দিকে গুলি ছুড়ে দেয় একটা। শব্দ শুনে জংলীর দল ছুটে আসে! জেঠু বলে,—কী হল সাহেব! জারুয়া?

উঠে দাঁড়ায় সামন্ত,—তোদের খালি জারুয়া আর জারুয়া। জারুয়ার ভয়ে রাত্রে ঘুম নেই। কী করবে জারুয়া? আয় কাজে চল।

একটু এগিয়ে যেতেই লছমনের সঙ্গে দেখা। বলল,—তোকে কে খুঁজছে সাহেব।

আমাকে?

নীচের ট্রলির লইনের ওপর দাঁড়িয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি-চশমা-পরা এক বাঙালী ভদ্রলোক, হাত-জোড় করে স্মিতহাস্যে বলছেন,—নমস্কার!

সাহুচর নেমে আসে সামন্ত, বলে—কে? কী দরকার?

ভদ্রলোক বলেন,—আপনি মিস্টার সামন্ত, নমস্কার। আপনার কথা খুব শুনেছি। বলতে গেলে আপনিই আমাদেব রক্ষক।

কিন্তু আপনি কে?

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের অনেক নিচে, যুবকই বলা যায়, তেমনি স্মিতহাস্যে বললেন,—উদ্বাস্তু। ঐ ত একেবারে আপনাদের গা ঘেঁষে চালা তুলেছি।

সামন্তর কণ্ঠস্বর রুক্ষ, বললো,—তা চলে এলেন কেন জঙ্গলে?

ভদ্রলোক অপ্রতিভ একটু হাসলেন, বললেন,—শহর ছেড়ে একেবারে গাঁয়ে এসে ডেরা বাঁধলাম কেন, তাই জিজ্ঞাসা করছেন? তা খানিকটা ইচ্ছা করেই এসেছি। দেখুন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে। দেশে স্কুলে

মাস্টারী করতাম। দেশ ত গেল, কিন্তু এখানেও ঐ মাস্টারী করা ছাড়া আর কী কাজ আমাদের দিয়ে হবে? ভাবছি, ছোট একটা স্কুল করবো এখানে,—এই প্রাইমারী, মানে পাঠশালা গোছের। সরকারপক্ষ থেকে সব রকম সাহায্যও পাবো এ ব্যাপারে।

স্কুল! স্কুল করবেন!—সামন্ত হেসে বললো,—কাদের পড়াবেন? জংলীদের?

না হয় এরা না-ই পড়লো, এদের ছেলেমেয়েরা ত আছে? তা ছাড়া, দেখুন না, বাঙালী উদ্বাস্তুর ছেলেপিলেরাও তো আছে!

তাদেরি নিয়ে পড়ুন। এখানে সুবিধা হবে না।

কেন হবে না!—ভদ্রলোকের চশমা রৌদ্রে ঝিকমিক করছে, বললেন,—না হবার কোনো কথা নয়। শুধু আপনি আমায় একটু সাহায্য করুন। আপনিও আমাদের মতো বাঙালী, আপনি চেষ্টা করলে…

বাধা দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সামন্ত, বললো,—ভুল করেছেন মশাই, আমি জংলী, এই এদেরই মতন। আমার সঙ্গে আপনাদের পোষাবে না! যান—যান—এই জঙ্গলের মধ্যে এসেছেন কেন, বাসায় যান।

বলেই সরে গিয়ে যথারীতি হাঁক-ডাক শুরু করলো সামন্ত,—এই মংলু, লছমন, বুধিয়া—আ যাও রে। জেঠু ওদের করাত ধরতে বল্। আর শোন, করাতের গুঁড়ো এবাব থেকে কেউ পাবে না, সব চালান দিতে হবে শহরে। বড় সাহেব বলেছে, করাতের গুঁড়ো দিয়ে শহরের বাতিঘরের বয়লার জ্বালাবে, বুঝলি?

হাঁ।

হেসে উঠলো সামন্ত,—ছাই বুঝেছিস। বয়লার কাকে বলে জানিস?

জেঠু এ রসিকতায় কান দেয় না, বলে,—জংলী সাহেব, ই বাবুটা কে?

কে আবার! তোর-আমার মতো মানুষ, তোর-আমার মতই লাল রক্ত ওর গায়। এখানে থাকবে, ঐ যে টিনের চালা উঠেছে, ঐ ওখানে। স্কুল করবে রে স্কুল, তোকে আমাকে সবাইকে পড়াবে। সব 'বাবু' হয়ে যাবো!

আবার হাসিতে ফেটে পড়লো সামন্ত। জেঠু বোকার মতো ফ্যাল্-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, এ সবের কিছুই সে বোঝে না! তারা তো জংলী, 'বাবু' তারা হতে যাবে কেন? পাগল এই জংলী সাহেবটা।

ভদ্রলোকটি ততক্ষণে ক্ষুণ্ণ মনে বাসার দিকে ফিরে গেছে। লোকটিকে হাঁকিয়ে দিতে পেরে সামন্তর স্ফূর্তি বেড়ে গেল দ্বিগুণ। হয়ত নিজেই করাতে টান দিয়ে এলো দু তিনবার। কেটে-ফেলা গাছে ডালপালা কাটছে সব কুলি-কামিনরা। তাদের মধ্যে গিয়ে হয়ত নিজেই ডাল কাটতে শুরু করলো।

গুঁড়ির টুকরো দড়ি বেঁধে ট্রলির কাছে গড়িয়ে আনছে কেউ কেউ। ও তাদের সঙ্গে দড়িতে টান দেয়, বলে—ম্যারো জোয়ান, হেঁইয়ো!

কামিনরা ছোট ছোট ডালগুলি কেটে পরিষ্কার করছে একটা গুঁড়ি থেকে, সামন্ত এসে যোগ দিলো তাদের সঙ্গে। এরা সব কোল-মেয়ে। পরনে খাটো শাড়ী, আঁচল বুকের ওপর দিয়ে টান করে কোমরে বাঁধা, মাথায় ঝুঁটি করা খোঁপা, তাতে ফুল গুঁজেছে। ওরা একটানা সুরে গান ধরেছে, আর কাজ চলেছে; গান আর কাজ একসঙ্গে। সামন্ত কারুর খোঁপা টান মেরে ভেঙে দিচ্ছে, কারুর ফুল দিচ্ছে ছিঁড়ে ছড়িয়ে। একটি গোলগাল অল্পবয়সী মেয়ে খোঁপায় হাত দিতেই রুখে দাঁড়ালো, সামন্তর হাতটা ধরে মুচড়ে কামড়ই বা বসিয়ে দেয় বুঝি। সামন্ত হেসে বলে, —বহুৎ আচ্ছা। তোর নাম কী রে?

মেয়েটি ওর মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে, বলে,—কমলি।

সামন্ত চট করে ওর চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলে,—কমল-ফুল! তা তুমি বুনোকমল, এখানে কেন? বনে যাও।

সঙ্গিনীর দল হেসে ওঠে। সামন্ত বলে, -কীরে, হাসিস কেন সব?

একটি মুখরা মেয়ে উত্তর দেয়, -সাহেব, কমল ফুল ত বনেই পড়ে আছে, তোদের ঘরে গিয়ে ত ফোটে নাই।

আবার হাসির ফোয়ারা ছোটে। সামন্ত ওদের ছেড়ে আরেকটু উঠে যায় পাহাড়ে। গুঁড়ি গড়িয়ে পড়ছে নিচে, লছমন হাঁকছে, হুঁশিয়ার!

এইভাবে কাজের দিন গড়িয়ে যায় সায়াহ্নে, ওরা দলবেঁধে সারি সারি নেমে নেমে আসে—ক্লান্ত দেহে। একটা মাটির জালায় খাবার জল রাখা হয় মাঠের ধারে। তার একটু দূরে একটি পাথরের ওপর বসে পড়ে সামন্ত। দলের লোক সব ফিরে গেলে যখন সর্দাররা বলবে, 'সব ঠিক আছে সাহেব', তখনই সে নিশ্চিন্ত মনে ফিরবে নিজের ঘরে। স্ফূর্তির জোয়ারে আজ বেশ পরিশ্রম করেছে সামন্ত, শরীর ক্লান্ত, তৃষ্ণাও পেয়েছে বেশ। ভিড় ফিকে হয়ে গিয়েছিল। একটি কোল-মেয়ে বোধহয় মাটির গেলাসে করে জল নিয়ে পান করছে, ওর দিকে পেছন-ফেরা, দেখা যাচ্ছে না মুখ। সামন্ত বললে, মিটু গ্লাস দা আগুইমে?

ফিরে দাঁড়ালো মেয়েটি, বলে উঠলো, তুই আমাদের কোল ভাষা জানিস!

সামন্ত দেখে, নিকষ কালোর লাবণ্যে ভরা সেই কমল-ফুল! উঠে দাঁড়ালো, বললো,—হ্যাঁরে ফুল, আমি যে তোদের ওদিককারই লোক!

মেয়েটি সযত্নে জলের গ্লাসটি এগিয়ে দেয় ওর হাতে। যতই ঘুরিয়ে শাড়ী পরুক, ওরা সেই বুনোই! শরীর-মনের বন্যতা কি কৃত্রিম শালীনতা দিয়ে ঢাকা

যায়! ওর চোখে-মুখে-দেহের উচ্ছলতায় সেই অবারিত আদিম বন্যতারই উদগ্র ইশারা!

লছমন এসে দাঁড়িয়েছে কাছে, বলছে,—সব ঠিক আছে সাহেব!

ঠিক আছে? আচ্ছা, চল এবার!

সন্ধ্যা নামছে, জংলীর দলটি নেমে একটু ঘুরে গেল খালের দিকে, সেখানে স্নান সেরে ঘরে ফিরবে। জংলী সাহেবও স্নান করে সেখানে জংলীদের সঙ্গে। স্নান সেরে ফিরতে ফিরতে বেশ ঘোর অন্ধকারই হয়ে গেল আজ। ভিজে গা দিয়ে জল ঝরছে, পরনের প্যাণ্ট ভিজিয়েছে আজ,—এক হাতে শুধু পিস্তলটা, অন্য হাতে জুতো জোড়া। মাথার বড়ো বড়ো চুল বেয়ে জল ঝরছে, প্রশস্ত রোমশ বুকখানায় রোমরাজি ভিজে লেপ্টে আছে। একমনেই হাঁটছিল সামন্ত, বাসার কাছে এসে একটু যেন চমকে উঠলো। বাসার মাচার নিচে ও কারা দাঁড়িয়ে!

—নমস্কার।

থমকে দাঁড়ালো সামন্ত। দুপুরের সেই চশমা-ধুতি-পাঞ্জাবি-পর উদ্বাস্তু ভদ্রলোকটি। সঙ্গে আরও কেউ হবে, সাদা সাদা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে।

কী?

ভদ্রলোক তেমনি স্মিতহাস্যে বললেন, এলাম দেখা করতে।

নিরুত্তরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললো সামন্ত, নিতান্ত অপ্রসন্ন মনেই। রাত্রির খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ অনেক রাত পর্যন্ত তার চলে জেঠুর ঘরে, কিন্তু প্যাণ্ট বদলে লুঙি প'রে নিয়ে বেরুবার মুখে এ আবার কী!

ঝাঁপটি খুলে ঘরে ঢুকলো সামন্ত, বাতি জ্বালিয়ে সব ঠিক ঠাক করে রেখেই চলে গেছে সেই কাঁচনে মেয়েটা,—সাঙ্গি।

বেশ ঘর আপনার, দুখানাই ঘর বুঝি? ভদ্রলোক নিজেই ঢুকে পড়লেন ভিতরে, পিছনে পিছনে আরেজন। সামন্ত সেইদিকে তাকাতে গিয়ে অবাক্ হয়ে গেল। শাড়ী-ব্লাউজে ঢাকা শহরের বড়কর্তাদের মেয়েদের মতো একটি মেয়ে, তাদেরি মতো সুগৌর গায়ের রং,—তারই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে! ভদ্রলোক বললেন, ইনি আমার স্ত্রী। ইনি মিস্টার সামন্ত।

—নমস্কার।

কিন্তু ভদ্রতার রীতিনীতি সবই ভুলে গেছে সামন্ত। তার নিজের দিকে শুধু চোখ পড়লো। সারাটা গা খালি—শুধু কোমরে খাটো প্যাণ্ট। প্রশস্ত রোমশ বুকখানা চরম নির্লজ্জতাই প্রকাশ করছে যেন! চট করে লুঙিটা নিয়ে ছুটে বাইরে গেল সামন্ত, যখন ফিরে এলো, স্বামী-স্ত্রী তারই বিছানার খাটটার ওপর

অতি সহজ ভঙ্গিতেই বসে কী যেন কথা বলছিলেন নিজের মধ্যে। ভদ্রলোক বললেন, আসুন। হয়ত অসময়ে বিরক্তই করতে এলাম আপনাকে।

সামন্ত তার খাকীর জামাটা মেঝে থেকে তুলে হাতে নিলো, তেমনি নিরুত্তরেই আবার গেল বেরিয়ে। জামাটা অসাধারণ ময়লা, ভদ্রলোকের উজ্জ্বল শুভ্রতার কাছে এ কিছুই নয়, কিন্তু তবু, যাহোক একটা আবরণ ত এটা!

ভদ্রলোক বললেন, সঙ্কোচ করবার কিছু নেই মিস্টার সামন্ত, আমরা নূতন এসেছি, কিন্তু আমাদেব আপনি আপনার বন্ধু বলেই জানবেন।

মহিলাটির ঘোমটা কপালের ওপব পর্যন্ত ওঠানো, চোখ তুলে তাকালেন ওর দিকে, বললেন,—আপনি বসুন আগে।

জড়োসড়ো হয়ে খাটের এক কোণে বসে পড়লো সামন্ত। ভদ্রলোক বললেন, তারপর কতদিন হয়ে গেল আপনার এখানে, এই শহীদ দ্বীপে?

কতদিন? মৃদু একটু হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে আনলো সামন্ত, বললো,—কতদিন তার কী লেখাজোখা আছে। বহুৎদিন।

একাই থাকেন?

হ্যাঁ, একাই। তবে, এইসব জংলীবা আছে।

এই জীবন আপনাব ভালো লাগে?

সামন্ত বললে—মন্দ কী?

ভদ্রলোক বললেন, আমার কথাটা ভেবেছিলেন কী?

কোন্ কথা?

সেই যে স্কুলের কথা বলেছিলাম।

স্কুল। সামন্ত বললো, বেশ ত, করুন স্কুল।

সরকার অবশ্য সমস্ত সাহায্যই করবেন, কিন্তু আপনার সাহায্যই বেশি দরকার।

আমি? সামন্ত হাসলো, আমি কী সাহায্য করবো? নিজেই লেখাপড়া ভালো শিখতে পারিনি।

দেখুন?—ভদ্রলোক কাজের কথায় এলেন একেবারে, আমার বাসার পাশে যে বড়ো চালাটা উঠছে, ওখানেই পাঠশালা খুলবো। উদ্বাস্তুদের ছেলেপিলে নিয়ে প্রথম-প্রথম বসবো, তাদের দেখাদেখি জংলীদেরও ইচ্ছা হবে, কী বলেন? দেখুন, মিস্টার সামন্ত, সত্যিকাব শিক্ষার বড়ো দরকার, না হলে দেশের উন্নতি নেই! আর এদেশ এখন আমাদেরি দেশ।

মহিলাটি এইবার একটু মৃদু হাসলেন, বললেন, তোমার স্কুলের প্রসঙ্গ একটু থামাও। অন্য কথা কিছু নেই?

আছে বই কী, ভদ্রলোক উৎসাহে বলে উঠলেন, জানেন মিস্টার সামন্ত, রস্

আইল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম কাল। ঘরবাড়ি নিয়ে দ্বীপটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে ; এক বাতিঘর ছাড়া কিছু এখন আর নেই। অথচ দেখুন, আদর্শ স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে উঠতে পারে ওখানে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেদিকে তাকাই, সমুদ্র। অদ্ভুত জায়গা !

মহিলাটি এবারও তেমনি হেসে বললেন, থামো তুমি। মিস্টার সামন্ত, আপনার জঙ্গলের কথা বলুন। খুব বড়ো জঙ্গল বুঝি এটা ?

সামন্ত বলল,—হ্যাঁ, জঙ্গলটা বড়োই বটে। ভিতরে নিবিড় বন।

জন্তু-জানোয়ার নেই ?

সামন্ত মুখ তুললো এতক্ষণে, বললে, সরকারী হিসাবে হরিণ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু আমি ভিতরে অজগর সাপ দেখেছি, তবে অন্য কোন জন্তু চোখে সত্যই পড়েনি।

মহিলাটি উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন দেখা গেল, জিজ্ঞাসা করলেন জারুয়াদের কথা, তারপরে আলোচনা ঘুরে গেল অন্য দিকে। মহিলাটি এক সময় বললেন, যাই বলুন এতবড়ো বন, এর মধ্যে বাঘ-ভালুক নেই, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না !

সামন্ত বলল, কেউ কেউ বলে, একরকম ছোট ছোট বাঘ আছে, ঝোপে ঝোপে, গাছে গাছে বেড়ায়, অতর্কিতে শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ে রক্ত চুষে খায় !

ভদ্রলোক বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জারুয়াদের কথা বলছেন।

তা জানি না, সামন্ত বলল, কেউ তাদের কোনদিন দেখা পায়নি, কিন্তু ঝোপের কিম্বা নিচু ডালপালার আড়ালে দুই তীব্র জ্বলন্ত চোখ অনেকেই দেখেছে এখানে !

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু তারা যে জেগুয়ার, তার কী প্রমাণ আছে ? হয়ত তারাও অসভ্য জারুয়া, অন্ধকারে বন্য মানুষের চোখও হয়ত অমন জ্বলে ! কিন্তু দাঁড়ান, একটা কথার মীমাংসা করি। জারুয়া আর জেগুয়ার, কথাটা এক নয় ত ? ভাবতে হবে এই নিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেগুয়ারকে সভ্যতাধ্বংসী বন্য হিংস্রতার প্রতীক বলা হয়ে থাকে, সেই অর্থে এই অসভ্য হিংস্রদের 'জারুয়া' বলা হয় না ত ?

ভদ্রলোক নিজের ব্যাখ্যায় নিজেই জ্বলে উঠলেন অদম্য উৎসাহে, স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, দেখছ লীলা, একটা অদ্ভুত সূত্র খুঁজে পাচ্ছি ; তোমায় বলেছি না, ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অনেক তথ্য পাওয়া যায় !

মহিলাটি একটু হেসে উঠলেন, বললেন, রেখে দাও তোমার ক্ষ্যাপামী ! এখন ওঠো, হয়ত মিস্টার সামন্তর আমরা বিশ্রামের ক্ষতি করে দিচ্ছি।

কিন্তু ভদ্রলোকটি এত কথায় যা পারেননি, ভদ্রমহিলার অতি সহজ অন্তরঙ্গতার স্বরে সে কাজটি হয়েছে, সামন্তর জড়তা অনেক কেটে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বললে,—না, না, কোন অসুবিধা হচ্ছে না। বসুন।

মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন, না, আপনি একটু জিরোন, গল্প তোলা রইল আরেকদিনের জন্য। সব সময়ই আসব আমরা, বিরক্ত করব, এই ত তুপা এগুলেই আমাদের বাসা। মিস্টার সামন্ত, কালকে সন্ধ্যাবেলা আসুন না আমাদের বাসায়? চা খাবেন।

চা সে সহরে গেলেই খায় বটে; কিন্তু এমন অন্তরঙ্গতার স্বরে কেউ ত তাকে কোনোদিন ডাকেনি? সে হঠাৎ-ই কোনো উত্তর দিতে পারল না। সেলুলার-জেলের সেই রুক্ষ দিনগুলি মনে পড়লে সভ্যশালীন জীবনের প্রতি সে একটা আক্রোশই অনুভব করে। ছোট্ট সেল। মাথার ওপরে একটা ঘুলঘুলি, একপাশে ক্ষুদ্র লোহার দরজা। সেলের একপাশে নর্দমা, দরজার পাশে কম্বলের বিছানা, এটুকুর মধ্যেই দিনেই পর দিন কেটে গেছে তার। সেই এক ঘেয়ে জীবনে না ছিল প্রীতি, না ছিল মমতার পরিচয়। স্নেহ-মায়া-ভালোবাসা, এসব তার কাছে কল্পনা শুধু।

সেই রাত্রে আবার যেন সেই সেলুলার জেলের ভয়াবহ বন্দীত্ব অনুভব করলো সামন্ত। ছটফট করে কাটিয়ে দিলো সারাটা রাত। সকাল হতেই এলো সাঙ্গি, তার থমথমে কাঁদো-কাদো মুখ নিয়ে। এলো জেঠু. কী হলো সাহেব, কাল এলি না?

শরীরটা ভালো ছিল না রে জেঠু। তাই আর উঠিনি।

জেঠু মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়, নিশ্চয় বাতাস লেগেছে সাহেবের। কিন্তু যায় না সাঙ্গি, বলে, সাহেব, তুই সত্যিই আমাদের লোক না।

হো-হো করে হেসে উঠল সামন্ত, ওর বাহুমূল দুটো ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে, কে বলে আমি তোদের লোক না? আরে, আমি কি লেখাপড়া-জানা বাবু? আমি জংলী!

সাঙ্গি আর্তকণ্ঠে বলে, আঃ, লাগে না আমার! জংলী কুথাকার!

বলেই এতদিন পরে হাসি ফুটে ওঠে সাঙ্গির মুখে। সামন্ত উঠে দাঁড়ায়,—বলে,—বলে, ঐ ঘরে দেখ্‌ত বোতল-টোতল একটা-আধটা আছে কি না, শরীরটায় একটু জুত করে নিই।

কাজের দিন গড়িয়ে চলে। লছমন এসে বলে, বড় সাহেব আসছে লোকজন নিয়ে, গাছে গাছে চিহ্ন্‌ৎ করবে, আরও গাছ কেটে সাফ করতে হবে, তুকে ডাকছে,—আরো লোক নাকি ইখানে আসবে।

মাথায় বিবর্ণ শোলার হ্যাটটা চাপিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে যায় সামন্ত।

সে রাত্রে জেঠুর আস্তানায় স্ফূর্তির মাত্রা একটু বেশি। জংলী সাহেব সাঙ্গির কুঠুরিতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল,—আজ আর উঠে বাড়ি যাবার ক্ষমতা নেই তার! রাত অনেক, আরুয়া পল্লী ঘুমন্ত, শুধু অভ্যাসবশেই ঘুম আচমকা ভেঙে গেল সামন্তর। দূরে বনে গুম্ গুম্ গম্ভীর আওয়াজ হচ্ছে না? হয়ত তারই মনের ভুল। পায়ের কাছে একতাল মাংসের স্তূপের মতো পড়ে আছে সাঙ্গি,—ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, কোমরের কাছের বাকল জড়ানো। একেবারে জংলী আরুয়া নারীর বেশেই আজ তার কাছে এসেছিল সাঙ্গি, কিন্তু তাতেও মন ভরেনি সামন্তের। অন্তরকন্দরে কোন বিচিত্র কামনার অগ্নিগোলক উদগ্র ক্ষুধায় জ্বলছে, তার হদিস কে জানে। সেই হাত-পা-বাঁধা নগ্নিকা আরুয়া নারীদেহকে মনে পড়ে, সেই উদ্ধত দেহছন্দ, সেই হিংস্র বিষাক্ত তীরের মতো দুটি চোখের দৃষ্টি! ... কিন্তু না, এ কোথায় কোন গহন অরণ্যের অন্ধকারে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সে। উত্তেজনায় উঠে বসেছে জংলী সাহেব,—না, না, এ হয় না, হতে পারে না। অসীম বিতৃষ্ণায় সে পায়ের কাছের মাংসপিণ্ডকে দুপায় ঠেলে সরিয়ে দেয়। সাঙ্গি তখন কোন্ সুখ-স্বপ্নের সুবাস আচ্ছন্ন, কে জানে, একবার জড়িত কণ্ঠে বলে 'উঁ', তারপরে আবার নিশ্চিন্ত ঘুম।

তারপরে আবার দিন, আবার সন্ধ্যা। বাসায় এসেই সাঙ্গিকে তাড়িয়ে দেয় ঘর থেকে। বলে, যা তুই তোর ঘরে। শিগগির যা?

করুণ কণ্ঠে তাকায় সাঙ্গি, বলে,—বারে আলো জ্বালব না!

আমি আলো জ্বালছি। যা তুই। বেরো শিগগির। কাপড় পরেছে দেখ! অসভ্য জংলী!

কান্না সম্বল করে সাঙ্গি আবার ফিরে যায় তার ঘরে। সামন্ত নিজের হাতে আলো জ্বালে, খাকীর জামাটা গলিয়ে দেয় গায়ে এবং তারপরে আকাঙ্ক্ষিত সেই কণ্ঠস্বরই দরজার কাছ থেকে শোনা যায়,—নমস্কার।

ঘরের শ্রী দেখে লীলা নিজে থেকেই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তারপরে বলে—মিস্টার সামন্ত, সেদিন চায়ে এলেন না? আমরা অনেক আশা নিয়ে বসেছিলাম!

বাতির স্বল্প আলোয় অপরূপ দেখায় হাস্যোজ্জ্বল লীলার মুখখানা। সামন্ত সহ্য করতে পারে না সে উজ্জ্বলতা, সে মুখ নামায়, কিছু বলে না।

ভদ্রলোক বলে ওঠেন, পাঠশালা শুরু ক'রে দিলাম মিস্টার সামন্ত, বেশ সাড়া পাচ্ছি। এবার ক্রমশ আপনার জংলীদের ছেলেপিলেদের ভিড়িয়ে দিন।

নিশ্চয় দেবো !—উৎসাহিত হয়ে ওঠে সামন্ত, লেখাপড়া শেখা খুবই দরকার ! কিন্তু কোথায় করেছেন স্কুল, বড়ো চালাটা ত এখনো ওঠেনি !

ভদ্রলোক অদম্য প্রেরণায় উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, স্কুল আপাতত আমাদের ঘরেই বসছে। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, দুটি ত মাত্র প্রাণী। মিস্টার সামন্ত, হাতে হাত দিন, আপনার কাছে এই-ই চেয়েছিলাম। আপনার অদ্ভুত কর্ম আর সংগঠন শক্তির কথা শুধু শুনিই নি, নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেছি। আপনার সাহায্য যদি পাই,, আমি বলে দিচ্ছি মিস্টার সামন্ত, আমি এখানে সোনা ফলাবো! কী জানেন, দেশে ছেড়ে এলাম মনমরা হয়ে, কিন্তু এখানে এসে সত্যিই কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছি। সত্যিকার শিক্ষার বীজ বপন করতে হবে, কোনরকম ভেদবুদ্ধি যেন মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে।

লীলা হেসে উঠলো, বললো, তোমার বক্তৃতা একটু থামাও। মিস্টার সামন্তকে পাবে বই কী, ওঁকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাও, সে কাজ উনি নিশ্চয়ই করে দেবেন। নয় কী, মিস্টার সামন্ত ?

নিশ্চয়।

লীলা বলল,—দেখুন, আজ আর বসবো না। কাল সন্ধ্যায় অতি অবশ্য আসবেন, একেবারে রাতের খাওয়া শেষ ক'রে ফিরবেন, বুঝলেন ? না-না, কোনো ওজর-আপত্তি শুনব না। আমার কথায় রাজী হ'তেই হবে আপনাকে। আর শুনুন, কাল সকালে আপনার জঙ্গলে যাবো কিন্তু।

একটু অপ্রস্তুতের মতো হেসে ফেলে সামন্ত, বলে,—জঙ্গল ? জঙ্গল আপনাদের জন্য নয়।

হেসে উঠে লীলা বললে,—কিন্তু জঙ্গল কেটে ফেলার পর তখন সেটা ত আমাদের জন্য ?

সামন্ত উত্তর দেয় না। লীলারা বিদায় নেয়—কিন্তু যে সৌরভ রেখে যায় ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে, সে কী সহজে বিদায় নেবার ?

রাত বাড়তে থাকে, আকাশে চাঁদ ওঠে,—ফিকে জ্যোৎস্নায় ভরে যায় মাঠ-বাট। সামন্ত ঘর বন্ধ ক'রে মাতালের মতো টলোমলো পা ফেলে এগুতে থাকে,—আফ্রয়া পল্লীতে নয়, কোল পল্লীর দিকে। প্রধানের ঘরেই ভিড়টা বেশি। মাদলের তালে তালে নাচের আসর জমেছে।

'জংলী সাহেব'কে অতর্কিতে পেয়ে আনন্দের জোয়ারে প্লাবন ব'য়ে যায়। দু' একটি মেয়ে নাচ থামিয়ে কাছে এগিয়ে আসে, বলে,—কারে খুঁজিস গো ! কমলফুল ?

হেসে ওঠে প্রগলভার মতো। কিন্তু যার খোঁজে আসা, সে জংলী সাহেবকে

দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়ে কী এক অছিলায় নাচ ছেড়ে সরে গিয়েছিল—একেবারে এক ধারে একটা নারিকেল গাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল চাঁদের দিকে মুখ করে। ডোরাকাটা ফর্সা শাড়ীটা আঁট ক'রে পরা,—কালো খোপায় একগুচ্ছ সুগন্ধ সাদা ফুল! খুঁজতে খুঁজতে এক সময় তার কাছে সরে আসে সামন্ত, বলে,—কী করছিস ওখানে?

চাঁদ দেখছি, সাহেব।

ওর হাত টেনে নেয় হাতের মধ্যে সামন্ত, বলে—ওদিকে আয়, পাথরটার ওপরে বসি। কেমন হাওয়া দিয়েছে দেখেছিস?

পাথরের দিকে যেতে যেতে আপন মনে হেসে ওঠে কমলি বলে, তুই যে এলি আমার ইথানে?

এলাম। ওর ছোট্ট হাতের মুঠি নিজের হাতে টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সামন্ত, কিছু বলে না—চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে মনের মধ্যে কেমন যেন পুঞ্জীভূত বেদনার ভার জমতে থাকে।

কমলি গুণ গুণ করে কিসের যেন সুর তোলে, তারপরে এক সময় নিজেই থেমে যায়। তারপরে নীরবতা অসহ্য লাগতে ব'লে ওঠে,—সাহেব, সাঙ্গিকে তাড়িয়ে দিয়েছিস?

কোনো উত্তর নেই। ওর চোখের দিকে চেয়ে একটু হেসে ওর কাঁধের ওপর মাথাটা এলিয়ে দেয় কমলি, তারপরে কেমন এক অস্পষ্ট অস্ফুট কণ্ঠস্বরে ব'লে ওঠে,—সাহেব, এ গাঁ-গুলান ভালো না। শহরে গিয়ে থাকবি? আমাকে নিয়ে? ভালো ভালো সব কাপড় দিবি, জামা দিবি, জুতা দিবি, ও?

সামন্ত আদর করে ওকে আরও কাছে টেনে নেয়—কিন্তু এবারও কিছু বলে না।

কমলি আবার কথা বলে, সেই আশ্চর্য অস্ফুট কণ্ঠস্বরে,—আমাকে বিহা করবি, সাহেব?

সাহেব এবারও কথা বলে না, একটু হেসে ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এ নীরবতা নির্মুক্ত নির্বাধ কোল-মেয়ের কতক্ষণ সহ্য হবে, এক সময় উঠে দাড়ায়, বলে,—চল সাহেব, ওরা খুঁজবে।

ওর হাত তখনো সামন্তর হাতে, বলে,—কমলি? আমাকে একটু চা খাওয়াতে পারিস?

হেসে ওঠে খিলখিল করে কমলি, চা কী গো! চা কুথায় পাবো? চল্, আয়, হাঁড়িয়া খাওয়াবো।

অসীম বিতৃষ্ণায় কমলির হাত ছেড়ে দেয় সামন্ত, বলে,—আজ চলি।

রাত যায়, আবার দিন আসে। সেই কাজ, সেই হাঁকডাক। সেই সাঙ্গির খাবার নিয়ে আসা, অভিমানে চোখের জল ফেলা। কমলির খোঁপায় টাটকা ফুলের গন্ধ, চোখের কোণে আমন্ত্রণের ইশারা। কিন্তু সব কিছুই নিরর্থক আজ, সব কিছুই মিথ্যা—'জংলী সাহেব' একটা গুডির ওপর চুপচাপ বসে থাকে, কাজ ছাড়া আর কোনদিকে খেযাল নেই যেন তাব।

সন্ধ্যায় উদ্বাস্তু-দম্পতির দুয়ার খুলে যায়, লীলা বলে,—আসুন মিস্টার সামন্ত।

ভদ্রলোক একরাশ বই নিয়ে বসে আছেন। বলেন,—আসুন।

পডছেন।—সামন্ত বলে,—পড়েন বুঝি খুব?

এবার্ডিন থেকে কিছু বই জোগাড কবে নিয়ে এসেছি সেদিন। অনেক কিছুই জানবার আছে এ জায়গাব সম্বন্ধে। জানেন? এনসাইক্লোপিডিযা ব্রাঁ নিকা বলছে, —আন্দামান পুরাণ-বর্ণিত দ্বীপ। সংস্কৃত হনুমান শব্দ মালযেব ভাষায হণ্ডুমান, সেই থেকে আন্দামান হযেছে। আব বাঙলা-মঙ্গলকাব্য ওকে আরও সুন্দর নাম দিয়েছে,—আন্ধারমানিক। বহির্বাণিজ্যেব পথে সওদাগবেবা এই 'আন্ধারমানিক'-এরই দর্শন পেতো।

থামো তুমি।—লীলা ঝঙ্কাব দিযে ওঠে,—যত সব তত্ত্ব-কথা। মিস্টার সামন্ত, কাল উনি শহবে যাচ্ছেন, আমি যাব জঙ্গল দেখতে, বুঝলেন?

সে বাত্রের স্মৃতি কখনো ভুলবাব নয়। ঐ বকম খাবার তার ভাগ্যে জোটেনি কত দিন—কত বছব। আব তাঁদের স্নেহের স্পর্শ। কত দীর্ঘদিন সে পাযনি এর আস্বাদ। চোখেব পাতা অকারণেই যেন ভিজে ওঠে।

পরদিন সকালে জঙ্গলের মধ্যে সত্যিই চলে এলো লীলা। গোলাপী শাড়ী তন্বীদেহটা পাক দিয়ে দিযে উঠেছে। আজ আর ঘোমটা নেই,,—খুশি উচ্ছল ঝলোমলো একটি তরুণী মেয়ে।

মিস্টাব সামন্ত, এই বুঝি ট্রলির লাইন? কী ছোট ছোট, বাবে?·· কী বড়ো বড়ো গাছ, না?···বাব্বাঃ, কী বিবাট বিবাট সব করাত আপনাদের···! ঝর্ণাব মত কলকল কবে উঠেছে লীলা।

······ওবা কাজ করুক, চলুন না একটু উপবে উঠি?

সামন্ত বলে,—পারবেন?

কেন পারবো না? সেদিন মাউন্ট হ্যারিয়টে উঠিনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে?

খুব জঙ্গল কিন্তু ওখানে। আর তাছাড়া······

তাছাড়া? কী?

জারুয়াদেরও ভয় আছে।

আছে নাকি? লীলা একটু হেসে ওর দিকে তাকায়, বলে,—আপনি ত আছেন পাশে, ভয়টা কিসের?

কিন্তু সত্যিই আর বেশি ওঠা হয় না। বড়ো বড়ো পাহাড় ওদিককার। লীলা বসে পড়ে একটা পাথরের ওপর। সামন্ত চারিদিকে তাকায়।

অকস্মাৎ তার হাত ধরে টান দেয় লীলা, বলে,—বসুন না? দেখছেন নিচে কী ছোট ছোট দেখাচ্ছে ওদের? যেন পুতুল!

সামন্ত শুধু বলে,—এবার চলুন। এসব জায়গায় দল বেঁধে আসা উচিত নয়। কিন্তু নামতে গেলে হড়কে যায় পা। সামন্তর বাহুতে ভর করে কোনক্রমে নামতে থাকে লীলা, নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়।

•

কিন্তু অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রি অতিকায় দানবের মতো তার বুকের ওপর চেপে বসেছে যেন। এপাশ-ওপাশ করে, ঘুম আসে না। বালিশের নিচে তার ছোরা, হাতের কাছে পিস্তল! তবু সে চমকে ওঠে। বিপদের সুস্পষ্ট পদধ্বনি যেন হৃদপিণ্ডে জেগে ওঠে সামন্তের। জেঠুর পল্লী ছেড়েছে সে, ছেড়েছে কোলদের আস্তানা। সাঙ্গির কান্নার রাত্রি উত্তাল হয়ে উঠেছে, কমলির দেহমন প্রতীক্ষাশীর্ণ। কিন্তু ওদের থেকে সম্পূর্ণই ছিঁড়ে এনেছে নিজেকে। জেঠু বলে, তুই এখন বাবু।

সামন্ত উত্তর না দিয়ে ধমক দেয়। শহর থেকে জামা-কাপড় এনেছে কিনে, এনেছে ধুতি-পাঞ্জাবি। লীলা বলেছে,—ধুতি-পাঞ্জাবিতে আপনার একটা ফটো তুলিয়ে আসুন শহর থেকে।

তার চিত্তের সামনে আজ দুটি চিত্র,—এক সভ্যতার মূর্তিমতী প্রতীক, লীলা, —আর একদিকে রাত্রির সেই গম্ভীর গুমগুম শব্দ, সেই অনাবৃতা জারুয়া-নারী! জানে, জারুয়ারা তাকে কিছুতেই ভুলবে না, উদ্যত বিপদ তার শিরে। লীলাদের সংস্পর্শে এসে ক্ষুধিত জেগুয়ারদের কথা আরো বেশি করে মনে হয়। যেন দুদিক থেকে দুটি তীর এসে তার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে! সেই দুর্যোগের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সামন্ত।

এক তন্দ্রাচ্ছন্ন রাত্রে সত্যিই উঠলো চিৎকার, বেজে উঠলো জারুয়াদের ভেরীনাদ, মশাল জেলে বল্লম হাতে বেরিয়ে পড়লো জেঠুলছমনের দল! বিদ্যুতের বেগে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে সামন্ত, হাতে তার উদ্যত গুলিভরা পিস্তল! জেঠু আর্তকণ্ঠে বলে—জারুয়া!

কোথায় জারুয়া!

ঐ জঙ্গলের দিকে।—মেরে ফেলেছে গো মেয়েটাকে, তীর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলেছে বুকটা!

কে? কে সে মেয়ে—?

ঠিক এমনি একটা দুর্ঘটনার আশা করছিল সামন্ত, তাকে পারবে না, তার প্রিয়জনকে নেবে হয়ত, ওদের এই রীতি।

কে? কে মেয়ে? সাঙ্গি?

না গো।

তবে? কমলি?

না গো।

তবে কে?—জেঠুর চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে থাকে সামন্ত, তারপর এক সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়,—এবার যেন সব বুঝতে পারে সে! কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র। তারপরেই উন্মত্তের মতো ছুটে চলে যায় অরণ্যের দিকে।

একলা যাস না সাহেব,—একলা যাস না!—জেঠু চিৎকার করে ওঠে।

কে শোনে সে চিৎকার? সামন্ত অরণ্যের মধ্যে পাগলের মতো ছুটতে থাকে! উঠতে থাকে পাহাড় ঠেলে। পা ছড়ে যায়, কেটে যায়, ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্ধকার রাত্রির বুকে জোনাকি জলতে থাকে,—তারই ক্ষীণ চমক গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছায়ামূর্তির মতো সেই ছায়া লক্ষ করে গুলি ছুঁড়তে থাকে সামন্ত। নিচে, দূরে সঞ্চরায়মান মশালের আলোগুলি বিন্দুর মতো ঘুরতে থাকে, জেঠুদের কোলাহল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। একটু থেমে আবার ছুটতে থাকে সামন্ত। অরণ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত যাবে সে! জারুয়াদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে এইবার! উদ্যত মৃত্যুর মতো পিস্তল হাতে দাঁড়বে তাদের সামনে! ক্রমাগত পিস্তল ছুঁড়ে যেতে থাকে সামন্ত।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে গিয়ে এক সময় চাঁদ ওঠে। কতো সময়, কতো প্রহর পার হয়ে গেছে কে জানে, সামন্ত এতক্ষণে বুকে হাঁপ ধরে মাটিতে পড়ে যায়। জায়গাটা একটু ফাঁকা মতন। কিছুক্ষণ নির্জীবের মতো পড়ে থাকার পর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সামন্ত। কোথায় সেই জারুয়ার দল? বনস্পতিরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে অনধিকার-প্রবেশকে যেন তিরস্কার করছে! তারি ফাঁকে ফাঁকে ছায়ার মতো হয়ত দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই হিংস্র অরণ্য-সন্তান উগ্র প্রতীক্ষায়,—সুযোগ বুঝে চুপি চুপি এগিয়ে আসবে একসঙ্গে, অতর্কিতে তাকে ঘিরে ফেলবে চারিদিক থেকে! শঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে আবার পিস্তল ছোড়ে সামন্ত, কিন্তু পিস্তলও এখানে নীরব। সর্বনাশ, কখন যেন তার গুলি ফুরিয়ে গেছে!

যেন হিম হয়ে গেল সর্বাঙ্গ! ঐ বুঝি ওরা এগিয়ে এলো এইবার! চারিদিক থেকে এসে ধরবে চেপে, ছিঁড়ে নেবে একে একে তার হাত, তার পা। তার সমস্ত শরীরটাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে!···ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে হাত-পা! কণ্ঠে স্বর ফোটে না! শেষ পর্যন্ত নিদারুণ ভয়ে হাতের পিস্তলটাই ছুঁড়ে মারে সামন্ত,—একটা গাছের গায়ে ঠক করে একটু শব্দ হয়, কোথায় গিয়ে ওটা ঠিকরে পড়ে, কে জানে!

কিন্তু ততক্ষণে ছুটতে শুরু করছে সামন্ত ভয়ার্ত পশুর মতো,—দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য! পিছনে পিছনে সমস্ত ছায়ারা যেন উল্লাসে ছুটে আসছে! বনান্তরাল পার হয়ে প্রাণপণে পালাতে থাকে সামন্ত! নিজের পায়ের শব্দকেও যেন আর বিশ্বাস নেই! যেন সারা অরণ্যে অকস্মাৎ পদধ্বনি জেগেছে,—সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে আসছে যেন তারা!

ছুটতে ছুটতে পাহাড়ী ঢালের মুখে হঠাৎ পা ফস্‌কে গেল সামন্তর, মুহূর্তে কী হতে কী হয়ে যায়, মাটি, পাথরের টুকরো. ঘাস আর ঝোপের ওপর দিয়ে সমস্ত দেহটা গড়াতে গড়াতে নামতে থাকে। খণ্ডিত বৃক্ষকাণ্ড যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়লো এসে একেবারে নিচে!

ওঠবার ক্ষমতা নেই, শরীরটা যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে! কপালের কাছটা ভিজে ভিজে, হয়ত কেটে গিয়ে রক্তপাত হচ্ছে ওখান থেকে!

বন এখানে তত ঘন নয় দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্না এখানে অবারিত! অদূরে বোধ হয় কয়েকটা কাটা গাছের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে! সে-ই ত কেটেছে ওদের! তীক্ষ্ণ কুঠারের দাঁত দিয়ে, নৃশংস পশুর মতো সে-ই ত খণ্ড খণ্ড করেছে অরণ্যকে। বনস্পতিরা তাই বাতাসে মাথা দুলিয়ে হাহাকার করছে, গভীর দীর্ঘশ্বাসও উঠছে যেন কোথা থেকে! অরণ্যের শাখায় শাখায় উদ্যত অভিশাপ! জোনাকির চমকে চমকে তীব্র সম্মোহন! আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো সামন্ত। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, একটু পরেই নির্জীবের মতো একটা কাটা গুড়ির ওপর এলিয়ে দিলো নিজেকে! মাথার ওপরে দুলছে বনের শাখা, একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ উঠেছে যেন কোথা থেকে। অনাস্বাদিত-পূর্ব স্নিগ্ধতায় ভরে যাচ্ছে চারিদিক। সেই ভীতিকর ছায়ারা কখন মিলিয়ে গেছে। বনের প্রতিটি তরুলতার সঙ্গে যেন একাকার হয়ে গেছে সামন্ত!

দণ্ড নয়, পল-অনুপল নয়, যেন যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে এইভাবে! কিন্তু বন্য জারুয়ারা টের পেলো কী করে ওর মনের কথা? ওদের আদিম চোখে কি আদিম রক্ততরঙ্গের ভাষা সহজেই ধরা পড়ে? কেমন করে চিনতে পারলো ওরা ওর সত্যিকার প্রিয়জনকে!

কিন্তু প্রচণ্ড ওদের আক্রোশ এই সভ্যতার প্রতি! ওরা হয়ত জানে—সভ্য আবরণের নীচে কী পৈশাচিক হিংসা, নির্মম বর্বরতা আর অন্ধ স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে শাণিত হয়ে!

চুপ-চাপ পড়ে থাকে সামন্ত। এমনি করে আরও কতো সময়, কতো প্রহর, কতো যুগ কেটে যাবে! হয়ত একদিন দেখা যাবে, তার দেহ আর দেহ নেই, শাখা তুলে বনস্পতির মতো নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে· সে এখানে দাঁড়িয়ে যুগের পর যুগ! কিন্তু ওরা আসবে, তীক্ষ্ণ কুঠার দিয়ে আঘাত করবে তার দেহে, মাথায়, বুকে! ওঃ! কী নিদারুণ সে যন্ত্রণা! সেই অনাগত যন্ত্রণা যেন তার ক্ষতবিক্ষত দেহে একসঙ্গে জ্বলতে শুরু করেছে!

নাঃ, উঠে দাঁড়াতে তাকে হবেই কোনক্রমে। একটা ক্ষীণ কোলাহল যেন এতক্ষণ পরে তার কানে ভেসে আসছে না? দূরে দূরে বিন্দুর মতো এগিয়ে আসছে না কীসের আলো! তবে কী, আবার আসছে সেই জারুয়া!—না—না, ওরা জারুয়া নয়,—ওরা আসছে জনপদ থেকে, তীক্ষ্ণ কুঠার হাতে! কাটবে অরণ্য, গড়বে বসতি, মায়াহীন, সাম্যহীন, মমতাহীন, দয়াহীন সংসার,—পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় ঘেরা নিঃশ্বাসরোধী লৌহ কারাগার!

উঠে দাঁড়ায় সামন্ত। কোমরের লুঙিটা গড়াবার সময় আলগা হয়ে কোন্ ডালের গায়ে জড়িয়ে গেছে কে জানে! অরণ্য তার আবরণ ছিঁড়ে ফেলেছে! অদ্ভুত উল্লাসে অকস্মাৎ ভরে গেল সারা মন! সে এবার সত্যিকার জংলী—সত্যিকার জারুয়া, নির্বাধ-নির্মুক্ত-নিরাবরণ, অরণ্য-মায়ের আদিম সন্তান! হাতে ভর দিয়ে কোনক্রমে এগিয়ে চললো সে শ্বাপদের মতো সেই আলোকবিন্দুর দিকে। গাছের পাতার আড়ালে, কোণের ধারে জ্বলতে লাগলো জনপদ-ধ্বংসী দুটি ক্ষুধিত চোখ!

আলোর বিন্দু ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামন্তর বিহ্বল চোখের সামনে যেন ভেসে উঠলো অত্যুজ্জ্বল এক শুভ্র দেহ,—গোলাপী শাড়ী তন্বীদেহটা পাক দিয়ে দিয়ে উঠেছে, খুশির হিল্লোলে দুলে দুলে উঠছে সে,—পরম আগ্রহে দুটি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এগিয়ে আসছে তারই দিকে,—এক নূতন জগৎ ক্রমাগত আহ্বান জানাচ্ছে তাকে,—এসো, এসো!

কিন্তু দ্বিগুণ হিংস্রতায় জ্বলে উঠলো সামন্তর দুটি চোখ, মুহূর্তে পাশ থেকে একটা পাথর তুলে নিলো হাতে।—কেন এসেছিলে সামনে ঐ রূপ নিয়ে! নিরাবরণ আদিম নারীর মতো কেন এসে দাঁড়াওনি কাছে! তোমার ঐ পরিচ্ছন্ন আবরণ নিয়ে এসেছে বিদ্বেষ-কুটিল জনপদের স্বাক্ষর, নিয়ে এসেছে

রঙীন-আলোয়-ঢাকা যুদ্ধ- বিগ্রহের বিভীষিকা,—সম্পদলোলুপ শ্বাপদদলের উন্মত্ত কোলাহল—অত্যাচার-অবিচারের অন্ধ নিষ্ঠুরতা,—অসাম্যের তীক্ষ্ণ নখাঘাত !

উদগ্র হিংস্রতায় সজোরে ছুঁড়ে দিলো সে হাতের পাথরখানা, যেন বন্য জারুয়ার তীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীর ছুটে গেল ঐ লীলা-চঞ্চল ছায়াময়ীর দিকে ! তীব্র আনন্দে উন্মত্তের মতো হেসে উঠলো সামন্ত !

কিন্তু কোথায় কে ? পাথরের খণ্ডটি অতর্কিতে এসে পড়লো মশালধারীদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত কোলাহল জাগলো,—জারুয়া—জারুয়া—জারুয়া !

শুধু বহুদর্শী জেঠু এক কোণ থেকে বলে উঠলো কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা গলায়,—জারুয়া নয় রে, জারুয়া নয়। আমাদের জংলী সাহেব! কিন্তু হুঁশিয়ার, জংলী সাহেব একেবারে পাগল হয়ে গেছে !

মৎস্যকন্যা

সমুদ্রের ওপর হুমড়ি-খেয়ে-পড়া পাহাড়টার শীর্ষদেশে পুবদিকে মুখ করে দাঁড়ালে সমুদ্রের কোনো চাঞ্চল্যই চোখে পড়ে না, কানে ভেসে আসে না একটি ঢেউয়েরও ভেঙে পড়ার শব্দ, দিনের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত এখানে বসে থাকলে আদিগন্ত একটা রঙের বিবর্তন চোখে পড়ে শুধু। আশ্চর্য সেই রঙ! রাত-জাগা কুয়াশার অস্পষ্টতা ভেদ করে দেখা দেয় লাল-লাল আভার আভাষ, পর মুহূর্তেই সোনায় সোনায় যেন ভরে যায় চারিদিক্, দিনের কর্মচাঞ্চল্য যত বাড়ে, গাঁয়ের পালতোলা নৌকাগুলো সার বেঁধে এগিয়ে গিয়ে যতই কতগুলো শুভ্র বিন্দুর সমষ্টিতে পরিণত হ'য়ে অবশেষে দৃষ্টির বাইরে বিলীন হ'য়ে যায়, ততই নীল হয়ে ওঠে সমুদ্রের রঙ, ফিকে নীল থেকে গাঢ় নীল, কখনো-সখনো এখানেওখানে তীর-থেকে-স্রোতে-টেনে-আনা বালির মিলনে কোথাও বা ঘোলাটে, কোথাও বা কেমন সবুজ-সবুজ, তারপরে সূর্য যত পশ্চিমে হেলে পড়ে, নৌকোর বিন্দু আবার যতই স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়, গাঢ় অতি গাঢ় হয়ে ওঠে সেই নীল রঙ্, ক্রমে সন্ধ্যার কালিমায় ঢেকে যাবার আগে গোধূলি-বেলায় কয়েকটি মুহূর্তের জন্য আবার সোনা হয় যেন হঠাৎ-খুশি-হওয়ার চাঞ্চল্যে, পরক্ষণেই দুরন্ত লজ্জার আরক্ত লালিমা, কালো রাত্রির অশ্লেষ আসন্ন।

সারাটা দিন পাহাড়ের-পাহাড়ে নেশাচ্ছন্ন একটা বন্য প্রাণীব মতই যেন কাটায় 'পাইড়তালি'। 'পাইড়তালি' শব্দটাকে 'পাহাড়তলী' বলে ভুল করার সম্ভাবনা, কিন্তু চল্‌তি তেলেগুতে এ'নাম যার রাখা হয়, আমাদের দেশে সে 'মাণিক' বা 'সোনা'। দেড়কুড়ি বয়স হতে চললো—বুড়ো বাপ তখনো আদর ক'রে 'পাড়ু' বা 'সোনা' ব'লে ওকে ডাকে।

গাছপালা তেমন জন্মেনি এ পাহাড়ে, এদিকে-ওদিকে দু'একটা একক গাছ তপস্বীর মতো দাঁড়িয়ে আছে, সমস্ত পাহাড় জুড়ে শুধু লতাগুল্ম, সাদা হলদে আর বেগুনী রঙের খুব ছোট ছোট ফুল ফোটে মাঝে মাঝে,—পায়ের তলায় নির্মমভাবে পিষে ফেলে এক-এক সময় উৎকট একটা আনন্দ পায় সে, পরমুহূর্তেই কিন্তু সেই দলিত ছিন্নবিছিন্ন নাম-না-জানা নিরপরাধ ফুলগুলির দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে, ফুলহারা লতামায়ের নির্বাক আর্তনাদ যেন তার একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করে! বুনো শিকারীর বিচিত্র ধনুকের জ্যা-মুক্ত তীরের মতো ছিটকে চলে আসে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায়, একটা খাঁজ-কাটা গৈরিক পাথর লতার

বেষ্টন থেকে আশ্চর্যভাবে নিজেকে আজো মুক্ত করে রেখেছে, সেই পাথরের ওপরে এসে ও ধপ করে বসে পড়ে। সামনে তাকায়, দিগন্ত থেকে চোখ ফিরে আসে পাহাড়ের নিচে। প্রথম-প্রথম উঁচু থেকে এভাবে নিচের দিকে দৃষ্টি ফেললে মাথা ঘুরে উঠতো, আজকাল সয়ে গেছে, নিথর শ্লেটের নিচে যেখানে শুভ্র তরঙ্গে-তরঙ্গে পড়ছে বলিষ্ঠ রেখাপাত, সেইদিকে চেয়ে চেয়ে মনের মধ্যে আবার জেগে ওঠে একটা দুর্বোধ্য হিংস্রতা। মুহূর্তের পদস্খলন। যদি হঠাৎ সে গড়িয়ে দেয় নিজেকে এখান থেকে? কিছুই না, অবিরাম তরঙ্গরেখায় শুধু মুহূর্তের বিঘ্ন ঘটবে। নিচে, পাহাড়ের গায়ে নিশ্চিন্ত নীড়ে শাবকদের মুখে খাবার তুলে দিতে দিতে হয়ত একমুহূর্তের জন্যই চমকে উঠবে 'সী-গাল্' পাখীরা,—হয়ত ডানা ঝাপটিয়ে একবার ঘুরে দেখে আসবে কী হ'লো কোথায়,—তারপরেই সব চুপচাপ। যথানিয়মে আবার পাহাড়ের পায়ে পায়ে ফিরবে শাদা ঢেউপরীরা, সন্ধ্যার মুখে আসবে মাছ-শিকার-করা তাদের গাঁয়ের ছোট ছোট নৌকোর বিন্দু, ছাগলগুলো চরা শেষ করে গাঁয়ে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তারই অপেক্ষা করবে কিছুক্ষণের জন্য, সাড়া না পেয়ে হয়ত শেষে নিজেরাই সারি সারি দল বেঁধে গাঁয়ে নেমে যাবে, ঘোর হয়ে আসবে সন্ধ্যা, নৌকো তীরে ভিড়তেই ঝাঁকা মাথায় ছুটে যাবে গাঁয়ের মেয়েরা, বুড়োরা জাল-কাঠি হাতে হাতজাল বুনতে বুনতে এগিয়ে এসে ঝাঁকার চারিদিকে উবু হয়ে বসে দেখবে, কী কী মাছ পড়লো আজ, দু'চার জন জেলে প্রকাণ্ড 'ছোবাচাপা' বা 'শার্ক' জাতীয় বিরাট মাছগুলি পরস্পরের কাঁধে ফেলা বৈঠার মাঝখানে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে বিজয়ী সৈন্যদলের মতই নির্বাক মহিমায় এগিয়ে যাবে ঘরের দিকে, আর তার বুড়ো বাপ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে এসে তাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকবে, কিন্তু কোনো উত্তর আসবে না, ছাগলগুলো একে একে নেমে যাবে শুধু।

কিন্তু ঘটে না পদস্খলন। মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় একটু অসাবধান হ'লেও তার অভ্যস্ত পা শক্ত হ'য়ে মাটি আঁকড়ে থাকে, পড়তে দেয় না। লক্ষ করে একটা উদ্দাম খুশির হাওয়া জেগে ওঠে মনে, সরে এসে হাতের তেলচুকচুকে পাচন-বাড়িটা শিশুর মতই শূন্যে ছুঁড়ে আবার ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নেয়। সমুদ্রের দিকটা ছেড়ে চলে আসে বিপরীত দিকে।

এখানে পাহাড়টা শেষ হয়ে নিচে নেমে গেছে। গাছপালা ঘেরা ছোট একটা বন সেখানে, বনের মধ্য থেকে সামনে উঠে গেছে আরেকটা পাহাড়, তারপরে আরো পাহাড়, পাহাড়ের সারি। পায়েচলা একটা খুব সরু পথ তার মধ্যে এঁকে-বেঁকে ক্রমশ বিলীন হ'য়ে গেছে। কোনো অজানা মেয়ের সিঁথির মতো পড়ে থাকা এই জনবিরল পথটি দিয়ে মাঝে মাঝে লোকালয়ে আসে পাহাড়ী

মেয়েরা মাথায় জ্বালানী কাঠকুটোর ঝাঁকা বেঁধে, পাহাড়ী ছেলেরা টুকিটাকি কত-কী-জিনিস নিয়ে, বুনো হাঁস, খরগোস, টিয়া, পাহাড়ী সরু বাঁশ আঁটি বাঁধা। পত্তনের হাট থেকে ফিরে আসে বিকেল পড়তে না পড়তেই। হয়ত ছেলে আর মেয়ে হাত ধরাধরি করে গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে উচ্চহাসির লহর তুলে। হয়ত ছেলেটির হাত ছাড়িয়ে পালাতে-পালাতে খসে গেছে মেয়েটির বুকের আঁচল, ছেলেটি সেই আঁচলটা খপ করে ধরে আকর্ষণ করতে থাকে, মেয়েটি বাহু দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় তার নিরাবরণ বুক, হাতের আড়াল দিয়ে লাজারুণ মুখ।...কিন্তু নিরাবন্ধন মুক্ত হবার আগেই সরে আসে পাডু, দুর্বোধ্য একটা ক্রোধবহ্নিতে বুঝিবা জ্বলতে থাকে সমস্ত শরীর, পাঁচন-বাড়ি দিয়ে চঞ্চল ছাগশিশু-গুলিকে অনর্থক তাড়না করতে থাকে।

এক-একদিন ডানহাতটা হঠাৎ অসাড় হয়ে যায়, চেষ্টা করেও বেশ কিছুক্ষণ নাড়তে পারে না। এক-একদিন কণ্ঠও হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে আসে, কোনো স্বরই ফোটে না। ইচ্ছা থাকলেও হাতটা নাড়তে পারছে না, কথা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না,—সে যে কী নিদারুণ নিঃসহায় অবস্থা, তা বলার নয়। সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে, বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে, সমস্ত মেরুদণ্ডে সিরসির করে কী যেন উঠছে নামছে—তার আতঙ্কে বিহ্বল ভীরু পাখীর মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে মন। বেশ কিছুক্ষণ পরে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে অবরুদ্ধ আর্ত চিৎকার, ডান হাতটা আবার স্বাভাবিক ভাবে নড়ে ওঠে। অবসন্নভাবে বসে পড়ে গৈরিক পাথরটার ওপর। এরই জন্য গলায় তার কালো সুতো-বাঁধা বড়ো তামার মাদুলা, এরই জন্য সীমাচলমে বছরে একবার গিয়ে মানসিক-করা মাথার চুল ফেলে দিয়ে মুণ্ডিত মস্তকে ঘরে ফেরা, এরই জন্য তার বুড়ো বাপের পত্তনে গিয়ে 'কনকলক্ষ্মী' মাকে নারিকেল উৎসর্গ করে কর্পূর আর ধূপ জ্বালিয়ে প্রতি সপ্তাহে পূজা দিয়ে আসা। কিন্তু এ অজ্ঞাত ব্যাধির উপদেবতা কি তাকে একেবারে ছেড়ে গেল? বেশ কিছুদিন ভালো থাকবার পর আবার শুরু হয়েছে উপদ্রব।

বছর কয়েক আগে সেই যে পত্তনের লোকেরা বলতে লাগলো, যুদ্ধ বেঁধেছে, সেই যে অতিকায় কলের পাখী গর্জন করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে যখন তখন চলাফেরা করতে লাগলো, সেই যে সরকারী বাবুরা বন্ধ করে দিলো তাদের সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরা, সেই যে আটক করলো তাদের নৌকো, তাদের ছোট্ট গাঁয়ের লোকেরা পেটের দায়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো, সরোজার মতো মেয়েও চলে গেল শহরে, সে এলো গাঁয়ের অন্য অনেকের মতই পত্তনের ডকে কাজ করতে, জাহাজ থেকে জিনিসের বোঝা ওঠানো-নামানোর কাজ। কত রকমের জিনিস।

কখনো-সখনো জাহাজের খোল থেকে যুদ্ধের বোমাও বটে। এই কাজ করতে করতেই একদিন ডকের সেই বুক-কাঁপানো বাঁশীটা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলো, অমনি যে-যেখানে পারলো জাহাজ ছেড়ে পালাতে লাগলো এদিক-ওদিক। কিন্তু হঠাৎ কোথা-থেকে কী হলো, একটা ভয়ানক শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ চিৎকার। পরক্ষণেই মনে হলো, সমুদ্রটা ক্ষেপে গিয়ে যেন পত্তনটাকে একেবারে মুহূর্তে ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়গুলি খসে খসে পড়ছে তার মাথার ওপরে। একথা সত্যি, হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে তার এক-এক সময় মনে হতো, তার মাথাটাই নেই, পাহাড়ের চাপে একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে। আর ডান হাত? প্রথমটায় ছিল অসহ্য বেদনা, পরে সেটা না থাকলেও বহুদিন তা পটা সে দাঁড়াতে পারেনি।

যুদ্ধ-টুদ্ধ শেষ হয়ে গেল একদিন, আবার গাঁয়ের কিছু-কিছু লোক ফিরে এলো গাঁয়ে। তা বলে সবোজা যে হঠাৎ ফিরে আসবে, এ কেউ ভাবে নি। সঙ্গে গাঁয়েরই পুরানো এক ছেলে, হাসান। তিনদিকে পাহাড় একদিকে সমুদ্র, বিস্তীর্ণ বালুবেলার ওপরে শুকনো তালপাতার ছাউনি-ফেলা ছোট্ট পাদের গ্রাম। পাহাড় ধুয়ে মাটি নেমে এসে বালুর ওপর বিছিয়েছে মাটির আস্তরণ, সেইখানে নানারকম সব্জির ফসল বুনলো কেউ কেউ, আর সবাই অনেক খেটে ভাগের নিয়মে 'তেপ্পা' নৌকো আর জাল তৈরী করে শুরু করলো মাছের ব্যবসা। হাসান যুদ্ধের সময় শহরে থেকে কাঠের মিস্ত্রীর কাজ শিখে এসেছে, ও ধরলো তেপ্পাগুলোর মেরামতের কাজ। গাঁয়ে অনেকেরই আছে ছাগল, ওর বাপেরও আছে, এই ছাগল চরানোর ঝক্কি বাজাটা নিতে হলো তাকে, ওর বা ধগ্রস্ত দেহ নাকি ভারী কাজের ভার আর সইতে পারবে না, ব'লে গেছে গাঁয়ের প্রধান বা কুলপেদ্দার গুরুদেব—সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীবাবা।

সন্ন্যাসীবাবা খুবই ভালো লোক। ক্ষুদ্র মন্দিরটার সামনে লণ্ঠনের আলোয় যখন সুর করে 'শ্রীরাম কথালু' পড়েন, তখন চমৎকার লাগে পাইডতালির। 'বীজম্' বা চাল-এর দর হু হু করে বাড়ছে, মিলছেও না বীজম্, অন্যান্য জিনিসপত্রের দামও আগুন, হাহাকার পড়ে গেছে সারা গাঁয়ে, —সন্ন্যাসীবাবা বলেন, শ্রীরামে বিশ্বাস রাখো, বীজম্ না পাও, 'কর্‌রা প্যাণ্ডেলম্' (ট্যাপিওকার মূল) কিম্বা 'কন্দমূলম্' খেয়ে দিন কাটিয়ে দাও ধৈর্য ধরে, সুদিন অবশ্যই আসবে।

কুলপেদ্দার নিতান্ত অনুগত হচ্ছে 'প্যাণ্টাইয়া' বা 'প্যাণ্টা' বা বাংলায় বলতে গেলে ফেলু। সহজেই সে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'শ্রীরাম কথা' শুনে সবার আগে কেঁদে ভাসায়। আর ঠিক এর বিপরীত চরিত্র হচ্ছে হাসান। চুপচাপ সে সব শুনে যায় বসে বসে, কোনো মন্তব্য করে না। প্যাণ্টাইয়া গদগদকণ্ঠে

হাতজোড় করে বলে ওঠে, প্রভু, সুদিন যে আসছে, এ আমরা বুঝব কী করে ?

হাসান হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় এ-সময়, নীরবেই সভা ত্যাগ করে চলে যায়। মেয়েদের দিকে ভালো করে সেই সময় তাকালে দেখা যেতো, সরোজাও নিঃশব্দে চলেছে তার পিছনে পিছনে মন্ত্রমুগ্ধ কোনো আচ্ছন্ন জীবের মতো। সন্ন্যাসী একটু হেসে ততক্ষণে বলতে শুরু করেছেন, আমাকে বলতে হবে না কিছু, তোমরা তা নিজেরাই বুঝবে।

কে যেন বলে ওঠে,—আর যে সহ্য হয় না প্রভু !

অন্য একজন বলে,—গাঁয়ে যারা ফিরে এসেছিল, আবার তারা চলে যাচ্ছে, গাঁ যে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে, বাবা !

'বাবা' বললেন—কেন, তোমাদের মাছ ধরা ?

লোকটি বলল, কয়জনের জাল আছে ? কয়জনের আছে ভেপ্লা ! তা-ও বেশির ভাগই মহাজনের কাছে বাঁধা। সারাদিন খেটে মাছ ধরে নিয়ে আসি, অমনি মহাজনের লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, সুদ-হিসাব করে নিয়ে যায় ঝাঁকা থেকে প্রায় সব, বাকি যা থাকে তা দেবতার সেবার জন্য আলাদা করে রেখে কী-ই বা থাকে আমাদের জন্য ?

ধমকে ওঠে প্যাণ্টা, এই, চুপ, দেবতার কাছে বসে এ কী কথা ? দেবতার সেবার জন্য মাছ ?

—মাছ না হয়, মাছ বিক্রীর টাকা ত ?

—চুপ চুপ !

সন্ন্যাসী হেসে দু'টি হাত প্রসারিত করে ইঙ্গিতে বলেন সবাইকে নীরব হতে। বলেন,—আজ তোমাদের একটা খবর দেবো। পত্তনের আশেপাশের 'জালারী' বা জেলে-গাঁও থেকে যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই অদ্ভুত এক ব্যাপার দেখে এসেছে,—কানাকানি পড়ে গেছে আজ সারা পত্তনে। কিন্তু এসব কথা আমার মুখে নয়, তোমাদের কুলপেদ্দার মুখেই শোনো। এসব সে নিজের কানে শুনে এসেছে।

কুলপেদ্দার বয়স অনেক হলেও দেহের বাঁধুনি ঈর্ষা করবার মতো। সন্ন্যাসী বাবার পাশে এসে বসে বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে যা বলতে লাগলো, রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে শুনতে লাগলো সমাগত জনমণ্ডলী, বিশেষত প্যাণ্টার দুটি বিস্ফারিত চোখে যেন আর পলক পড়তে চায় না। এ কী সত্যি ? অবিশ্বাসের কথা ভাবতেও হৃৎকম্প হয় ! বংশপরম্পরায় এ খবর তারা ছোট বেলা থেকেই শুনে আসছে। সূর্যের মতো চন্দ্রের মতো, গ্রহতারার মতো এ সংবাদ অবিসম্বাদীরূপে সত্য এই মৎস্যজীবীদের

কাছে! শুনতে শুনতে হাসি ফুটে ওঠে এই অভাবগ্রস্ত, অবহেলিত, বঞ্চিত লোকগুলির মুখে, জ্বলে ওঠে আশার আলো, মুহূর্তের জন্য মনে হয়, নিরাবরণ, শিশুগুলিকে দিতে পারবে এক টুকরো করে কাপড, মুখে দিতে পারবে দু' বেলা বীজন্, মেয়েদের দিতে পাববে একখানা করে বাডতি শাড়ী।

তাঁরা দেখা দেন কখন? যখন ফুলে-ফলে ভবে উঠবে দেশ, শস্যে শস্যে সারাদেশ হয়ে উঠবে শ্যামল, থাকবে না অভাব, আসবে না মারী, জাগবে না দুরন্ত ঝড সমুদ্রদেবতার বুকে। স্রোতে ভেসে যাবে না তাদেব 'তেপ্পানৌকো', জাল পাতলেই অজস্র রুপোর মতো ধরা পডবে রুপোলী মাছ।... তীব্র উত্তেজনা আর কোলাহলের মধ্যে সভা ভেঙে যায়। সবারই প্রশ্ন,—কে দেখেছে? পত্তনের কোন ধারের জেলে পল্লীর লোক? রুপোব ছটায তাদের চোখ কি অন্ধ হ'যে যায় নি? কেমন দেখতে তাঁদেব? কী রূপে কী ভঙ্গিতে দেখা দিয়েছেন তাঁরা? জলের ওপর ভাসতে ভাসতে মাথা তুলেছিলেন, না, তীবে ব'সে নিচ্ছিলেন বিশ্রাম? কুলপেদ্দাকে ঘিবে দাঁড়িয়ে অজস্র লোকেব প্রশ্ন। মেয়েদেব মধ্যেও ছড়িয়ে পডলো কথাটা। ঘবেব কাজ ফেলে তারাও ছুটে আসতে লাগলো দলে দলে।

কুলপেদ্দা বলে—বেশমেব মতো কোঁকডানো কালো চুল কোমব ছাপিয়ে নেমে এসেছে, যাবা দেখেছে তাবা বলেছে,—জলে সাঁতাব দিতে দিতে মুখ তুললেন কতোবাব। কী রূপ সেই কন্যাদেব। যেন ঠিকরে পডছে! কোমবেব নিচটা সোনালী আঁশ ঢাকা,—যেন হাজাব হাজার সোনাব মোহব গেঁথে লজ্জা নিবারণ ক'বে বযেছেন!

সারা গাঁযে ফিসফিস আর কানাকানি। প্যাণ্টার ব্যস্ততাই সব থেকে বেশি। তবে সবই নিম্নকণ্ঠে। কন্যারা যখন দেখা দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই এসেছেন গাঁয়ের কাছে,—তাঁরা যদি শুনতে পান? শুনে চটেও ত যেতে পারেন। তাই এ সব কথা জোরে বলা ঠিক না।

তাই সেই গৈবিক পাথরটিতে বসে পাড্ডুও ভাবছিল এ সব কথা। নিচের দিকে বাবে বাবে তাকাচ্ছিল, সেই রেশমের মতো এক কোমর কোঁকড়ানো কালো কেশের রাশি ত একবারও চোখে পড়ে না? পড়লে হাতজোড় করে ভিক্ষা চাইত, নিম্নদেশের পবিচ্ছদ থেকে ছিঁড়ে একটি মোহরও তাঁদের কেউ যদি তাব দিকে ছুড়ে দিতো ত বড়ো কোনো ডাক্তারকে সে দেখাতো গিয়ে,—কেন এমন হয় তার মাঝে মাঝে? কথা বলতে বলতে হঠাৎ-ই বলতে-না-পারা, হাত নাড়তে নাড়তে হঠাৎ না-নাড়তে-পারা?

সন্ধ্যা হয়ে আসতেই চমক ভাঙে, অবাধ্য ছাগ শিশুদের তাড়না ক'রে দলের

সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, তারপরে নামতে থাকে ওদের পিছনে পিছনে. হাতে খালি খাবারের বাটিটা। ওর বুড়ো বাপ ততক্ষণে গাঁ পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে এসে 'ডাক' দিতে থাকে,—পাড়ু-পাড়ু......পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকে নাম-শেষের স্বরবর্ণটা, উ-উ-উ!......মুখের কাছে হাত নিয়ে পাড়ুও সাড়া দেয়,—'নয়না! (বাবা)......শোনা যায়, আ-আ-আ!

গাঁয়ের ঘরে ঘরে উনুন জ্বালা ধোঁয়া পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, নামতে নামতে দেখতে পায় পাড়ু,—বালুবেলায় 'তেপ্পা'গুলি উঠিয়ে রেখে জেলেরা চলে গেছে, মেয়েরা কেউ কেউ ঝাঁকা নামিয়ে পাইকারদের সঙ্গে তখনো দরদস্তুর করতে ব্যস্ত। ধোঁয়ার আবছা আড়াল থেকে মেয়েদের গাঢ় লাল বা নীল শাড়ীগুলো অতি অদ্ভুত-ই দেখায়! ওদের মধ্যে হয়ত সবোজ্বা-ও আছে, দূর থেকে অবশ্য চেনা যায় না,—হতেও পারে, না-ও হতে পারে! মাছ-আসামাত্র এক একদিন ঝাঁকা নিয়ে গিয়ে নৌকোর কাছে উপস্থিত হয়, কস্তু কে আনবে ওর জন্য মাছ? পরের মাছেই ভাগ বসায়। জগলুর বউ, কম্বা গুরুলুর বউ, ওদের কাছ থেকে চেয়ে চন্তে ধার নেয়,—নয়ে নিজে গিয়ে বিক্রী করে আসে 'ডলাফল নাক' পাহাড়টা পেরিয়ে নিচে নেমে খাড়ির ধারের পাইকারদের কাছে, ফিরতে ফিরতে ওর রাত হয়ে যায়! বকীর পয়সা অবশ্য গুরুলুর কি জগলুর বউ ছাড়ে না, লাভের পয়সাটুকুই ওর সম্বল। কস্তু তাতেই বা হয় কতো? অথচ, শাড়ার বাহার ত কম নয়! গাঁয়ের একেবারে প্রান্তে পাহাড়টা ঘেঁষে ঝুপড়ি বেঁধে ও থাকে, ঝক্‌ঝকে করে দাওয়া নিকোয়, খড়ির আল্‌পনা আঁকে, মুরগীও পুষেছে গোটা কয়েক।

হাসানের সঙ্গে ওর যে ঠিক কী সম্পর্ক,—তা' নানাভাবে ওদের লক্ষ্য করেও গাঁয়ের কেউ কোনো সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে পারেনি। এখানে বলা কর্তব্য, নামে 'হাসান' হলেও ছেলেটা সবার মতই হিন্দু। ছোট থেকেই মহরমের দলে বাঘ সেজে নাচত বলে কী করে যে ওর ডাকনাম হয়ে গেল 'হাসান', সে এক ইতিহাস। মহরমের সময়ে 'পিউড়ি' গুলে সারা গাটা হলদে করে নিতো, তারপরে ভুষো-কালি দিয়ে বাঘের গায়ের মতো কালো-কালো চাকা-চাকা দাগ আঁকত,—কোমরের হলদে জাঙিয়াটা গায়ের রঙের সঙ্গে একেবারে মিশে থাকত, কোমর থেকে ঝুলতো মানানসই খড়ের লেজ,—মুখখানা বিচিত্র রঙে বাঘের মুখের মতো আঁকা,—মহরমের ঢোলে কাঠি পড়ত, কড়্-কড়্-কড়্-কড়াং-কড়্-কড়্-কড়্-কড়াং! আর সে হাত দুটো থাবার মতো দুলিয়ে-দুলিয়ে বাঘের শিকার ধরার ভঙ্গিতে তালে তালে নাচত...মহরমের সময়ে বহু হিন্দু 'জালারী' ছেলে ভিন্ন পাড়া থেকে বেরিয়ে এসে

তাজিয়ার মিছিলের মধ্যে মিশে বাঘ সেজে নাচে, অন্ধ্র দেশে এ ঘটনায় কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। আবার হিন্দুদের পরবেও মুসলমান-ছেলেরা অনুরূপভাবে বাঘ সেজে নাচে,—কোনো দ্বিধা নেই।

গাঁয়ে ফিরে এসে হাসান তেপ্পো-মেরামত করে। কাজপাগলা ছেলে, লোকের সঙ্গে কথা বলে কম, সারা দিনমান বালুবেলায় হয় তেপ্পার 'কাঁধ' তৈরী করছে,—নয় ত সারা গাঁ থেকে চাঁদা ওঠানো-পয়সায় তৈরী করা ভাগের বড়ো নৌকোটাকে বালির ওপর উঠিয়ে নৌকোর খাঁজে খাঁজে দড়ি দিয়ে পাকানো খড় গুঁজে দিচ্ছে, কখনো বা নৌকোর নিচে বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছে।

ওর এক বুড়ী মাসী ওর ঘর সংসার দেখা-শুনা করে, সেই আসে দুপুরবেলায় মাথায় ওর জন্য খাবারের বাটি বসিয়ে, কাছে ব'সে ওকে খাওয়ায়, কোন দিন বা আপন মনে গজগজ করে বুড়ী, বিয়েসাদি করবি না! এ কাল আর হাঁড়ি ঠেলব আমি!

হাসান কিছু বলে না। কিন্তু পরদিন বুড়ী খাবার নিয়ে এসে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যায়। আরেকটা বাটি থেকে গম্ভীর মুখে পা-ছড়িয়ে বসে খাবার খাচ্ছে হাসান, আর অদূরে চুপচাপ বসে আছে সরোজা। বুড়ী ক্ষোভে দুঃখে রাগে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নেয়, বড়ো ভয় করে বুড়ী ঐ হাসান ছেলেটাকে। রেগে মেগে যদি তাকে ঘর থেকেই দেয় বার করে? সে যাবে কোথায়? খাবে কী? দু'দুটি ছেলে তার যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসে নি, কে আছে তার আর এই হাসান ছাড়া? কিন্তু তা' ব'লে ঐ নষ্ট বজ্জাত একঘরে মেয়েটার হাতে খাবে শেষকালে হাসান, এই বা সহ্য হয় কী করে? শুধু কি খাবার খাওয়া? আর কিছু নয়? বুড়ী কি জানে না কিছু? অথচ করবারও কিছু নেই, ছেলেটাকে নানা কারণে ভয় করে সবাই, শুধু রাগী ভারী ব'লে নয়, শুধু দস্যি চেহারার জোয়ান ছেলে ব'লে নয়,—ও না এলে এ গাঁয়ের মাছের ব্যবসা উঠে যেতো, নৌকো মেরামতি করতো কে ওর মতো? তা'ছাড়া, শহর-ঘোরা ছেলে, ও জানে শোনে কত! বাবুরা এলে তাদের সঙ্গে ও-ই হাত নেড়ে কথা বলে,—কুলপেদ্দা নিজে পর্যন্ত ওকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। কেন, মনে নেই সেই পঞ্চায়েতীর কথা?

সরোজার গাঁয়ে ফিরে-আসার খবর শুনে সব থেকে খুশি হ'য়েছিল আমাদের 'পাইডতালি' বা 'পাড়ু'। সঙ্গত কারণও ছিল সে খুশির। পাকাদেখা-পাতি পত্রের মতো এদেরও একটা ব্যাপার আছে। ছোটবেলায় সম্বন্ধ ক'রে ছেলে ও মেয়ের বিয়ের মত একটা অনুষ্ঠান হয়, ঠিক বিয়ে নয়, বিয়ের অঙ্গীকার।

বড়ো হ'লে এই অঙ্গীকার হয় কার্যে পরিণত, তখন বৃহত্তর অনুষ্ঠান দিয়ে বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় ।……সরোজার সঙ্গে পাইড়তালির শৈশবে এই সম্বন্ধই হ'য়েছিল,—কিন্তু "পেল্‌লী" অর্থাৎ 'পাকাপাকি বিয়ে' হবার আগেই যুদ্ধের কালোছায়া পড়ে গ্রামের আকাশে,—সরোজার মা সরোজাকে নিয়ে আসে ওদের ঘরে, কিন্তু ওরাই তখন খেতে পায় না, অপর একটি প্রাণীকে খেতে দেবে কী ? পাড়ু নিজে যায় পত্তনে কুলি খাটতে, মায়ের হাত ধ'রে সরোজাও যায় শহরের জনারণ্যে হারিয়ে। সেই মা আর ফেরেনি, ফিরল শুধু সরোজা। কিন্তু কেন ?

'ডল্‌ফিন নাক'-পাহাড়টায় তখন ছাগল চরাতো পাড়ু। মাছের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে নীল শাড়ীটা প'রে ও যখন বুড়ো অশথ্-গাছটার ছায়ায় পত্তনের দিকে নেমে যাচ্ছিল, নিস্তব্ধ নির্জন পায়ে-চলা-সরু লাল পথটির ওপর মৃদু মৃদু বাজ্‌ছিল ওর পায়ের মল দুটি,—ঝম্‌ঝম্—ঝম্‌ঝম্, পাড়ু ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে। 'শ্রীরামের' কৃপায় 'অসুখ' হয়নি সে সময়, কণ্ঠও রুদ্ধ হয়নি, হাতটাও আড়ষ্ট হয়ে যায়নি,—ওর হাত দু' হাতে টেনে নিয়ে কতো-কী কথা বলেছিল, অশথ্‌গাছের ছায়ায় মুখোমুখি ব'সে সরোজাও ব'লেছিল বিহ্বল-কণ্ঠে,—আমি তো তোর বউ, আমাকে ঘরে নে। তোর ঘরে থাকব ব'লেই ত গাঁয়ে এসেছি !

তার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল সরোজা, ব'লেছিল,—শিগ্‌গির বাপকে বল্, তোদের বাপ-বেটার ঘরে আমাকে বাতি জ্বালাবার হুকুম দে। কিনে দে মোটা শাড়ী,—তোর দেওয়া শাড়ী পরে আমি এ' বাহারে শাড়ী ছুঁড়ে ফেলে দেবো !

—কে দিলো তোকে, এ শাড়ী ?

শক্ত হয়ে যায় যেন সরোজার সর্বশরীর, বলে,—সেই বাঘটা।

—বাঘ !

—হাসান।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পাড়ু ব'লেছিল—তবে গাঁয়ে যে কথা উঠেছে, সে সব সত্যি ! বিয়ে ক'রেছিস্ হাসানকে ?

—ছিঃ—ছিঃ !

পাড়ু বলে,—এসেই জগলুদের বাড়ি উঠলি, হাসানের ঘরে উঠিস নি, সেটা সবাই জানে। কিন্তু শাড়ী-টাড়ী……

ওর মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়েছিল সরোজা,—তোর মুখ দিয়ে যেন এসব খারাপ কথা না বেরোয়,—হাসান দেবতা।

হেসে উঠলো পাড়ু, বললো,—এই বললি বাঘ, এখন বলছিস দেবতা!

—বনের বাঘকে পাহাড়ীরা 'দেবতা' বলে, তা' জানিস? ও আমার কাছে বাঘও বটে, দেবতাও বটে।

ব'লেই ফিক ক'রে হেসে ফেলে মেয়েটা, বলে,—নারে, তুই যা ভাবছিস তা নয়, ও আমাকে ছোঁয় না। শুধু ওঁত পেতে বাঘের মতো আড়ালে ব'সে আমার ওপর নজর রাখে। এই নজর থেকে তুই আমাকে বাঁচা। কেনই বা তা' করবি না, তুই না আমার বর?

কিন্তু বিয়ের কথায় উঠলো নানান গোল। বসলো পঞ্চায়েত। সে পঞ্চায়েতীর কথা আজও ভোলেনি পাইড়তালি। কটা ভোজের প্রতিশ্রুতিতেই মিটে যাচ্ছিল সব, পঞ্চায়েত সরোজাকে একবাক্যে বউ ব'লে রায়ও যাচ্ছিল দিতে,—ঠিক এমনি সময়ে ভিড়ের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালো হাসান, বললো,—একটু দাঁড়ান, আমার একটা কথা বলারি আছে।

বাঘের মতোই ওকে দেখাচ্ছিল বটে সেই রাত্রে জলন্ত মশালের আলোয়,—পাড়ুর বুড়ো বাপকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে উঠল,—যাকে বউ ক'রে ঘরে নিয়ে যাচ্ছ,—তার পুরোনো কথাটা জেনে তারপরে তাকে বউ করো। কেননা, নেবার পরে কানাকানি শুনে যে ওকে হেনস্তা করবে, সে আমি সইব না।

—পুরোনো কথা?

—হ্যাঁ, পুরোনো কথা একটা আছে। যুদ্ধের সময় পেটের দায়ে পত্তনে গিয়ে আমি ছুতোরের কাজ শিখতুম, তোমরা তা জানো। কাজ করি, হাতে বেশ পয়সাও আসছে,—আমি বাজে লোকের সঙ্গে মিশে ব'য়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এ মেয়েটাও যে ব'য়ে গিয়েছিল জানতাম না, যে-সব গলিতে মুখে রঙ মেখে মেয়েরা দাড়াতো, তারই এক গলিতে,—আমি এক রাত্রে অমনি একটি মেয়ের ঘরে ঢুকে দেখি,—ও,—ঐ সরোজা!

নিদারুণ একটা উত্তেজনা জাগল সভার মধ্যে,—কুলপেদ্দা চেঁচিয়ে উঠল,—এই আস্তে আস্তে, সবাই চুপ করো।

—আমি অনেক কষ্টে যাদের বাসা, তাদের টাকা-পয়সা খাইয়ে ওকে বার ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি গাঁয়ে। কেন জানো, ও গাঁয়ের নাম ডোবাচ্ছিল ব'লে! আমি ওকে প্রথমটায় চিনতে পারিনি। যখন জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার নাম কী? বলল,—সরোজা। চমকে উঠলাম, জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার গাঁ? অম্লানবদনে ব'লে বসল,—এড়েডা। ও পথে পা দিয়ে যে নামধাম ভাঁড়াতে হয়, সেটা শিখতে পারেনি দেখে বুঝলুম, পিছলে সবে এসেছে। একই গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে আমরা, মনটা কেমন ক'রে উঠল! পেটের জন্যই ত আমার

কারখানায় হাতুড়ী পেটা, আর ওর রঙ্ মেখে দরজায় দাঁড়ানো!······সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দুজনে শেষ পর্যন্ত চ'লে এলাম গাঁয়ে। ভাবলাম, আসাই দরকার।

শুরু হ'লো পঞ্চায়েতী কোলাহল। তারা ওকে সমাজে স্থান দিলো না, এমন কি গাঁয়েও না। উঠে দাঁড়ালো হাসান, বললো,—বেশ। তাই হবে। গাঁয়ের বাইরেই থাকবে ও।

মেয়েদের মধ্যে এক ধারে নতমুখী বসেছিল সরোজা, তার কাছে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল,—এই, উঠে আয়।

মেয়েটি উঠে গেল ওর পিছনে-পিছনে। এবং আশ্চর্য কাণ্ড, এমন কাণ্ড সারা গাঁয়ের ইতিহাসে কেউ কখনো শোনেনি। গ্রাম ছেড়ে প্রায় পাহাড়ের কাছ ঘেঁষে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে রাতারাতি ঘর তুলতে বসল হাসান আর সরোজা। বড়ো-বড়ো চার পাঁচটা মশাল জ্বালিয়ে আনলো তার ঘর থেকে হাসান, পুঁতে দিলো মাটিতে। অত রাত্রে তালগাছে উঠে কেটে আনল তালপাতা,—মাটি কাটল কোদাল দিয়ে। সকালেও চলছে ওদের কাজ, কুলপেদ্দা এসে অবাক্ হ'য়ে বলল,—করছিস কী হাসান?

—ঘর দিচ্ছি তুলে। ভয় নেই,—এ ঘর তোমার গাঁয়ের সীমার বাইরে।

—ইজারাদার খাজনা চাইতে আসবে না?

—সে বুঝব আমি। এ আলাদা হিসাব, তোমার খাতায় ঢুকো না।

এ নিয়ে অবশ্য আর বিশেষ-কিছু হ'লো না, হাসানের ভয়েই সম্ভবত আর-কেউ উচ্চবাচ্য করল না। পাকা ইদারা থেকে খাবার জল নিতে গেলে মেয়েরা সোরগোল তুলেছিল প্রথম-প্রথম,—কিন্তু তা-ও হাসানের শাসানিতে নীরবতায় ডুবে গেল। ইদারাটা সরকার থেকে ক'রে দেওয়া,—সবারই অধিকার আছে ওর ওপরে, কেউ বাধা দিতে এলে থানা-পুলিস পর্যন্ত করবে হাসান।

আস্তে আস্তে নিভে এলো উত্তেজনার বহ্নি। অর্থনৈতিক সমস্যাটাই যেখানে প্রধান, সেখানে এ ঢেউ কলরব করতে পারে কয়দিন? ব্যাপারটা ক্রমে সহজ হ'য়ে এলো গাঁয়ের লোকদের কাছে। সরোজা যে গাঁয়ের বাইরে থাকে, বাইরের মেয়ে,—একথা কারুর মনেই রইল না—যেন গাঁয়েরই সীমানা বেড়ে ওর তালপাতার খপরীর আঙিনা পর্যন্ত চ'লে এলো। জগলুর বউ, গুরুলুর বউ,—ওদের কাছ থেকে মাছের বন্দোবস্ত নিয়ে রীতিমত জাত-ব্যবসাই শুরু করল জেলের মেয়ে।

কিন্তু গুরুতর পরিবর্তন ঘটল পাড্ডুর মনে। সরোজা 'ডলফিল নাক' দিয়ে পত্তনে যায় ব'লে, ও পাহাড় ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের এদিককার নির্জন পাহাড়টায় ছাগল চড়াতে এলো পাড্ডু। এসে পাহাড়ের অভিনব পারিপার্শ্বিকে নিজেকে

যেন হারিয়ে ফেলল,—শিশুর মতো, বুনোর মত কয়েকটি বন্ধ দিন কাটল একটা নতুন স্বাদে মগ্ন হয়ে। কিন্তু কয়দিন? হঠাৎ দেখা দিল সেইপুরোনো অসুখটা।

ভলফিল নাকে যেদিন দেখা হয়,—ঝাঁকা মাথায় তেমনি ঝমঝম করতে করতে নীলশাড়ী প'রে যাচ্ছিল, পাড়ু পথে গিয়ে দাঁড়াতে কী গর্বভরেই না কথাগুলো বলেছিল মেয়েটা! ব'লেছিল,—পঞ্চায়েতের ভয়ে নিজের বউকে ঘরে তুলতে পারে না, খু-ব মরদ!

—পঞ্চায়েতের ভয় আমি করি না!

—তবে?

গম্ভীর কণ্ঠে পাড়ু ব'লেছিল, —তুই আছিস্ হাসানকে নিয়ে?

তুটি চোখ যেন মুহূর্তে ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠল সরোজার, বলল,—যদি থেকেই থাকি, তোর কী?

—এ গাঁয়ে উবার চোখের ওপর ওসব চলবে না!

—ঈস্, আবার চোখ রাঙানো হ'চ্ছে! বুকের পাটা থাকে ত বলিস্ এ কথা হাসানকে!

ব'লে তুমদাম পা ফেলে গর্বভরেই এগিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা!

এ পাহাড়ে কয়দিন বেশ কেটেছিল,—কিন্তু বুকের ভিতরটা কীসের বেদনায় আবার গুম্‌রে-গুম্‌রে ওঠে! পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা হাত-ধরাধরি ক'রে বনের পথ ধ'রে চলে যায়,—আর ওর বুকের মধ্যে যেন বাজতে থাকে মল-পরা তু'টি চরণ-মঞ্জীর—ঝমঝম—ঝমঝম!......ঘর করতে ইচ্ছা যায় পাড়ুর,—কিন্তু কে তাকে মেয়ে দেবে? একে গরীব, তায় সারা গাঁয়ে রটনা হ'য়ে আছে তার এই বিচিত্র ব্যাধির কথা! তুর্বোধ্য ব্যাধির ভয় উপদেবতার ভয় হয়ে গাঁয়ের লোকগুলির চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে,—এর মধ্যে তার মনের কথা বোঝবার লোক কোথায়? সরোজা ওদিকে একান্তে জিজ্ঞাসা করে হাসানকে,—পাঁক থেকে নিয়ে এলি, ঘর বেঁধে দিলি, এবার কী বিয়ে করবি?

হাসানের চোখে যেন মুহূর্তের জন্য ফুটে ওঠে বাঘের মতোই কোনো বন্য পশুর লালসা-দীপ্তি, কিন্তু মিলিয়ে যায় পরক্ষণেই। যেমন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে সে ওর সঙ্গে আলাপ করে, তেমনি কণ্ঠেই বলল,—বিয়ের অভাব কী? এ গাঁয়ের অনেকেই আমাকে মেয়ে দিতে রাজী।

হেসে ফেলে সরোজা, বলে,—সে খবর কী জানি না? কুলপেন্দার মেয়ের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হচ্ছে, সে দেখতে আমার চেয়ে......

—থাক্,—বাধা দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় হাসান, তারপরে দ্রুত চলে যায় ওর ঘরের আঙিনা ছেড়ে।

এক-একদিন মাছ এনে দেয়, চাল এনে দেয়, সব্‌জি এনে দেয়, মসলাপাতি এনে দেয়, বলে,—আমায় রেঁধে খাইয়ে আসবি দুপুরে।

আসে। কোন কোনদিন ভালো শাড়ী কিনে এনে দিয়ে বলে,—প'রে আয়।......শাড়ী কেন, ছোট্ট-খাট গয়নাও। কিন্তু ওর কথামতো সেজেগুজে বাইরে এসে সরোজা দেখে,—সে নেই, কখন চলে গেছে!......লোকটাকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না সে। তার 'প্রথম বিয়ের বর' যদি তাকে না নেয়, ত, ও-ই তাকে বিয়ে করুক না কেন? কথাটা মনে হ'তেই শিউরে ওঠে, না—না, তা কী হয়? গাঁয়ে এসেছে যখন, তখন আর কিছু চলে না। অমঙ্গল হবে না গাঁয়ের?......কিন্তু গলায় একরাশি তাবিজবাঁধা লোকটাই বা তাকে অতো ঘৃণা করবে কেন? কী দোষ সে করেছে? মা ত প্রথমে তাকে কুপথে ঠেলেনি, প্রথমে ত ওদেরই ঘরে তাকে দিতে এসেছিল মা। শহরে না খেতে পেয়ে মরতে ব'সেছিল ব'লেই ত । ভাবতে ভাবতে হঠাৎ-ই আরেকটা কথা মনে প'ড়ে যায়। তার সেই পাপের জন্যই কী হাসান অমন মুখ ফিরিয়ে থাকে? তা-ই হবে। এ কথাটা এতদিন তার মনে হয়নি কেন? সঙ্গে সঙ্গেই একটা অব্যক্ত ক্রোধের জ্বালায় জ্বলে ওঠে সর্বশরীর! এর জন্যও দায়ী ঐ ছাগল-চরানো লোকটা! ও যদি বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেও ওকে ঘরে জায়গা দিতো, ত, কিছুতেই যেতো না সে শহরে। পাপ তাকে ছুঁতেও পারত না। কিন্তু এখনই বা তাকে নেয় না কেন? ও কী চায় ওর পায়ে সে মাথা কুটে মরুক! তা-ই যাবে সে! যাবে ওর ঐ পাহাড়টায় চূড়ায়!

সত্যি সত্যিই একদিন চলে আসে সরোজা, পাহাড়ে উঠে সেই গৈরিক পাথরটার ওপর বসে থাকে।

আর তাকে হঠাৎ ওখানে ওভাবে আবিষ্কার ক'রে নিদারুণ বিস্ময়ে চমকে ওঠে পান্ডু। বলে, তুই এখানে কেন?

কী হতে কী হয়ে যায়, পায়ে মাথা কুটে কাঁদতে এসে ওর কথা শুনে দপ করে জ্বলে ওঠে দর্পিতা মেয়েটি, উঠে দাঁড়ায়, শক্ত হয়ে বলে,—এটা তোর কেনা জায়গা নাকি? বেশ করব আসব!

পান্ডুরও উত্তেজনার সীমা থাকে না, বলে,—এটা আমার নয় বটে, তা ব'লে তোর হাসান-মহারাজেরও কেনা জায়গা নয়!

দেখ্, হাসান-হাসান করিস্ না বলছি! তার পায়ের নখেরও যোগ্য তুই ন'স্।

—কী বললি! বড্ড বাড় বেড়েছে তোর, নয়?

—বাড় তোরও কম বাড়েনি! হাসানকে দিয়ে তোর মুখ জুতিয়ে না ছিঁড়লে তুই সায়েস্তা হবি না।

বলেই তরতর করে নেমে যায় সরোজা। আর এদিকে নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলতে থাকে পাইড়তালি, দুটো একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে থাকে প্রাণপণে, কিন্তু কাঁপা হাতের পাথর একটাও যায় না মেয়েটার ধার দিয়ে!

বেলা যেমন ক্রমশঃ বিষন্ন, ম্লান হয়ে আসে, ক্রোধবহ্নিও নিস্তেজ হয়ে নিভে আসে। তখন পাহাড়ে সেই গৈরিক পাথরের ওপরে বসে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে পাড়ু, ভাবে, কী হতে কী হলো! ওকে দেখে ভাবলাম, ওকে কাছে ডেকে নেবো, বলব, হাসানকে ছেড়ে আমার কাছে আয়, পঞ্চায়েত না মানলে আমরা ভিনগাঁয়ে চলে যাব, আমি তোর বর,—একথা তুই ভুলিস না!

বাড়ি এসে সরোজাও ভাবে ঠিক তেমনি ক'রে। আমি রাগ করলাম কেন? আমি যদি ওর পায়ে কেঁদে পড়ি, ওর সাধ্য কি আমাকে ছেড়ে থাকবে! গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়, ওর হাত ধরে না হয় চলে যাবো আবার পত্তনের দিকে, দিনমজুরী করে দিন কাটাবো, আর বড়ো হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ওর চিকিৎসা করাবো! সবাই বলে ওর দেহে নাকি কী রোগ আছে। দিন-দিন চেহারা হয়ে যাচ্ছে না কী-রকম কী-রকম? যখন ভোরে ঐ অদূরের পথটি ধরে পাহাড়ে যায়, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে না সে কোনদিন? কিন্তু ভোর বেলা ওর কাছে গিয়ে কথা বলতে ভয় হয়, যদি কেউ দেখে ফেলে? হয়ত গরীব বাপ ব্যাটার ওপর নির্যাতন করবে পঞ্চায়েত। সব থেকে বড়ো কথা, হাসান যদি দেখে ফেলে। দুর্দান্ত লোক, ক্ষেপে গেলে কী-ই না করতে পাবে সে! হাসানকে ভয় করে বইকি!

একদিন হাসানকে হেসে-হেসে বলে, তুই আমাকে শাড়ী-টাড়ি দিস কেন?

সেই ক্ষণিকের জন্য চোখ তুলে বন্য লালসায় ওকে লেহন করা! তারপরেই স্তব্ধতা। একটু পরে বলে, গাঁয়ের অবস্থা দেখছিস? খেতে পাচ্ছে না লোকে!

—আর তুই আমাকে শাড়ী দিচ্ছিস, 'গাজু' (হাতের চুড়ি) দিচ্ছিস।

আবার জ্বলে ওঠে দুটি চোখ, বলে, তোকে না গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পঞ্চায়েত বসিয়ে? তোকে ত তাড়ায়নি, আমাকেই চাবুক কসিয়েছিল! কী চাই জানিস? গাঁয়ের সবাই তোর কাছে এসে হাত পাতবে! গাঁয়ের সবাই 'মুন' খেয়ে একবেলা কাটায়, তোর ঘরে আমি 'বীজম্' এনে রেখেছি!

—আমার ভয় করে! একা থাকি, যদি চুরি ডাকাতি হয়?

—চুরি ডাকাতি! ছোরাটা রেখেছিস্ ত লুকিয়ে! আমার কাছেও একটা রয়েছে। এই হাসানের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কে তোর ঘরের দিকে এগোয়, একবার দেখব!

—কিন্তু কেন এসব!

একটু হাসে যেন হাসান, বলে, তোর আমি বিয়ে দেবো। হ্যাঁ, তোর বরের সঙ্গেই আবার বিয়ে।

হেসে ওঠে সরোজা, আর তোর নিজের বিয়ে?

মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় সমস্ত মুখখানা, রাশভারি দুর্দান্ত লোকটাকে ভয়ানক অসহায় মনে হয়, কী করুণ, কী ব্যথাতুর! পায়ে পায়ে ওর কাছে সরে আসে সরোজা, ধীরে ধীরে ওর হাতটা হাতে তুলে নেয় উপযাচিকার মতো, বলে, কাজ নেই। এ-ই বেশ।

—কেন!

—না-না!

হাতটা ছেড়ে ছুটে যেতে চায়, কিন্তু শক্ত করে ধ'রে থাকে হাসান, বলে,—পাইডতালিকে তুই ভালবাসিস, আমি জানি।

বলেই ওকে ছেড়ে দেয়, বলে,—দেখ্, আমি ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবোই, যেমন করে পারি। আমি তোকে গাঁয়ে ফিরিয়ে এনেছি, তোর সুখ আমার না দেখলে চলে!

বলতে-বলতে গলাটা কেমন ধরে যায় হাসানের, একটু থেমে থেকে একটু সামলে নিয়ে বলে,—হয়েই যেতো বিয়েটা, পঞ্চায়েতির সময়ে হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওসব কথা!

—তাতে কী হয়েছে?

ওর মুখের দিকে হাসান তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক, অস্ফুট কণ্ঠে বলে, বিয়ে তোকে দিতেই হবে।

বলতে বলতে চলে যায় আঙিনা থেকে জোরে জোরে পা ফেলে। মুরগীর ছানাগুলো পায়ের তলায় চাপা পড়বার ভয়ে চিকচিক করতে করতে এদিক-ওদিক সরে যায়।

ঠিক এমন দিনেই শোনা যায় সেই কন্যাদের কাহিনী। সারা গ্রামে সাড়া পড়ে যায়, কানাকানি চলতে থাকে। বইতে থাকে একটা অদম্য উদ্দীপনার হিল্লোল! হাসান অবাক্ হয়ে সব দেখে, আর অদ্ভুত একটা অনুভূতি এসে তাকে আচ্ছন্ন করে। যে বুড়িরা ঘৃণায় কথাই বলত না সরোজার সঙ্গে, তারা পর্যন্ত ওর ঘরে এসে বসে, কণ্ঠ নিচে নামিয়ে বলে, শুনেছিস?

—হ্যাঁ।

—পরনে নাকি সোনা! মোহর আর মোহর!

বুড়োদের মধ্যে বৈঠক বসে। পত্তনের লোকদের কন্যাদর্শন হয়েছে তাতে ওদের কী? ওদের কেউ যদি চোখে দেখতে পারত ত গাঁয়ের হতো কল্যাণ,

দুঃখ হতো দূর। সন্ন্যাসীবাবা রামায়ণের দুটো-একটা কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার পর কন্যাদের কথা বলতে শুরু করেন। তাঁরা যখন এদিকে আসছেন, হয়ত দেখা দেবেন গাঁয়েও। চোখ রেখো সমুদ্রে। আর ঘরে ঘরে ঠিক রেখো শঙ্খ, ঘণ্টা। দেখা মিললে একটা নতুন কাপড়, একছড়া কলা, নারিকেল, এসব একটা পিতলের থালায় করে ধূপদীপ জ্বালিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হয় তাঁদের, তবেই ত তাঁদের আশীর্বাদ পড়বে এ গাঁয়ে।

উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'যে উঠে প্যান্টাইয়া, বলে,—দেখা তাঁরা দেবেনই, গাঁয়ের এই অবস্থা দেখে কখনো তাঁরা স্থির থাকতে পারেন। অবশ্য ভক্তিভরে যদি আমরা ডাকতে পারি।

সকালে উঠে তোলা-জলে স্নান সেরে ঘরে এসে চুল আঁচড়াচ্ছিল সরোজা, গায়ে শুধু শাড়ীটা জড়ানো, তখনো 'ববিকা' (ব্লাউজ) পরা হয়নি, হঠাৎ মনে হলো, দরজার কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। একবার কেঁপে উঠল বুকটা। চোরটোর নয়ত? পরক্ষণেই কী মনে ক'রে হেসে ফেলল সরোজা। হাসান এক-এক সময় এসে অমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। পুরুষদের ব্যাপার বোঝা যায় না সময়-সময়। সন্দেহের বশেও হয়ত। 'ববিকা'টা হাতে নিয়ে আঁচলটা খসিয়ে দিয়ে বলে, দাঁড়া, আসছি।

'ববিকা'টা প'রে আঁচলটা ঠিক ক'রে বাইরে এসে দেখে, কোথায় হাসান? দ্রুত পায়ে আঙিনা পার হয়ে পাচনবাড়ি হাতে পাহাড়ের দিকে চলেছে পাইডতালি। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে সরোজা। শেষ পর্যন্ত ও-ও এলো ওর দরজায়। না-না, আর নয়, এখুনি যাবে সে পাহাড়ে, বলবে,—রাগ করিস না। আমার কোনো দোষ নেই। মাথাটাই খারাপ হয়ে যায়।...

একটু পরেই ঝোলা হাতে আসে হাসান, বলে,—সারা গাঁটা যেন আজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। দলাদলি নেই, ঝগড়া-ঝগড়ি নেই, নিন্দা-কুৎসা নেই, সবারই এক চিন্তা—কে প্রথমে দেখবে কন্যাদের।

—তা, ও-ঝোলায় কী?

—তরকারী আর ডাল। মাসি মুখ ঝামটা দিয়েছে কাল, আজ তুই রেঁধে নিয়ে গিয়ে আমাকে খাওয়াবি, কেমন?

—পত্তনে যাব না?

—শুকনো মাছের ঝাঁকা নিয়ে? থাক আজ, কাল যাস।

চলে যায় হাসান সমুদ্রের দিকে। আর অদ্ভুত একটা সুর যেন আজ বাজতে থাকে প্রাণের মধ্যে। দেখা হলে কন্যাদের পায়ে প্রণাম জানিয়ে এই প্রার্থনাই সে করবে, তাবিজ-পরা লোকটার শরীর ভালো করে দাও, আর কিছু চাই না।

উনুনে আঁচ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সরোজা, লঘু পায়ে দ্রুত উঠতে থাকে পাহাড়টা বেয়ে। একেবারে সেই গৈরিক পাথরটার কাছে গিয়ে থামে। নিচে নিথর সমুদ্র, ছাগলগুলি ইতস্তত চরছে, কিন্তু কোথায় লোকটা? ভালো করে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ নজরে পড়ল পাহাড়-চূড়ার অন্যধারে বনের দিকে চেয়ে প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। ধীর পায়ে চুপিচুপি এগিয়ে এলো সরোজা, এভাবে তন্ময় হয়ে কী দেখছে ও? আর কোনদিকে চোখ নেই?... পিছন থেকে এসে বনের দিকে চোখ ফেলতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ওর মুখ। একটা ঝোপের আড়ালে একটি পাহাড়ী ছেলে আর মেয়ে। ছিঃ-ছিঃ! নির্লজ্জের মতো ওদিকে চেয়ে দেখছে কী লোকটা!

ছুটে চলে এলো সরোজা, আর পায়ের শব্দে চমকে উঠল পাড়ু। এত সকালে সরোজাকে সে এভাবে কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু কী চায় ও? ও কি দেখা হলে তার সঙ্গে ঝগড়াই করবে? গৈরিক পাথরটার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সরোজা, ওর কাছে সরে আসতে লাগল পাড়ু।

সরোজাই কথা বললে প্রথমে,—আজ ভোরে হঠাৎ আমার দরজায় যে? চুপি চুপি চুরি করতে গিয়েছিলি বুঝি?

—চুরি! পাড়ু একটু হেসে বলতে গেল, হ্যাঁ, তোর মন চুরি! কিন্তু হায়রে. কথা ফুটল না, কণ্ঠ হঠাৎ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। প্রাণপণে সে কথা বলতে চেষ্টা করছে, পারছে না, কণ্ঠের শিরা ফুলে উঠেছে, মুখচোখ লাল হয়ে গেছে, মুখের আকার হলো বীভৎস, ভয় পেয়ে চিৎকার করে দু-পা পিছিয়ে গেল সরোজা, বলে উঠল—অমন করছিস কেন। আমায় মারবি নাকি!

বিস্ফারিত হয়ে গেল পাড়ুর চোখ, হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ধরতে গেল, ওকে, কিন্তু, হাতটা শক্ত অসাড় হয়ে গেল! ভয় পেয়ে আরও পিছিয়ে গেল সরোজা!......

সারাটা সমুদ্র-তীরে যেন সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে। প্যান্টাইয়ারই উল্লাস সব থেকে বেশি! উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে নেমে এলো পাড়ু,—একদিকে, যেখানে তার নতুন তৈরি ছোট্ট নৌকোটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল হাসান, সেইখানে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়ল পাড়ু। হাসান বললো, অত অস্থির হচ্ছিস কেন? ধীরে ধীরে তাকিয়ে দেখ্‌। ঐ যে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসছে আর ডুবছে। ক্রমেই দূরে নিয়ে যাচ্ছে! ঐ দেখ্‌।

নৌকোটা ঠেলতে ঠেলতে পাড়ু বলতে লাগলো, নৌকোটা জলে নামা হাসান, সর্বনাশ হয়ে গেছে! পাহাড় থেকে পড়ে গেছে সরোজা!

—কী বললি!

কোনরকমে ওকে ব্যাপারটা বোঝালো পাড়ু, দুজনে মুহূর্তে নৌকাটাকে ভাসিয়ে ঢেউ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করল নিমজ্জমান দেহটার কাছে! তেমন ঢেউ ছিল না আজ—সহজেই নৌকো নিতে পারলো সমুদ্রে! থরথর করে হাতটা আজ কাঁপছে হাসানের, বৈঠা দিয়ে ঠিকমত হাল ধরতে পারছে না সে!

পাড়ুরই চোখ পড়ল সবার আগে। রেশমের মতো একরাশ কালো চুলই বটে! চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে ভাসছে আর ডুবছে! পাড়ু ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই তাকে গিয়ে ধরলো হাসান। নৌকোটা একবার কাত হয়ে টাল সামলাতে-সামলাতে স্রোতে যেতে লাগল ভেসে, চিৎকার ক'রে উঠল পাড়ু, ছেড়ে দে, ও যে তলিয়ে যাচ্ছে, দেখছিস না? ভাঙা-ঢেউ পেরিয়ে গভীর জলে এসে পড়েছে, ঐ দেখ্, ও যে ডুবে গেল।

বৈঠার শাসনবিহীন নৌকোটা দ্রুত অন্য দিকে ছুটে গেল। আবার দুজনে নৌকোটাকে আয়ত্তে এনে শুরু করলো খোঁজার পালা। কিন্তু কাকে খুঁজবে?

•

খুঁজতে খুঁজতে সারাটা দিন প্রায় কেটে গেল। দিনের শেষে অবসন্ন দুটি নির্বাক প্রাণী আসতে লাগলো গ্রামের দিকে ঢেউ ঠেলে ঠেলে! তীরে তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভিড়। শাঁখ বাজছে। সন্ন্যাসীবাবাকে ভিন গাঁয়ের শ্মশান-প্রান্ত থেকে ডেকে আনা হয়েছে। কপালে ফোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্যাণ্টাইয়া, গলায় মালা দিয়ে কুলপেদ্দা, হাতে তার পেতলের থালা, নতুন শাড়ী, এক ছড়া কলা, আর নারকেল।

চেঁচিয়ে কী যেন বলতে গেল পাড়ু, কিন্তু তার মুখে হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলো হাসান, নিজেও রইলো নীরবে। কথা বলার কিছু নেই। যে গেছে তার খোঁজ কেউ করবে না, সবাই ভাববে নষ্ট মেয়েটা আবার নষ্ট হয়েছে পত্তনে গিয়ে।

গ্রামের ঐ আশা-উদ্বেল লোকগুলোর দিকে চোখ পড়লো তার, গাঁয়ের এই ছেঁড়া কাপড় পরা, আধপেটা খাওয়া লোকগুলোর বিশ্বাস এখন ভাঙা চলবে না। হয়ত বিশ্বাসের জোরেই দুঃসময় কাটিয়ে উঠবে ওরা। অতএব, ওরা জানুক, ওরা যা দেখেছে, সেটাই সত্যি। মৎস্যকন্যাই বটে।

সপ্তদ্বীপ

মনোহরদাস তড়াগ-এর উত্তর তীর ধরে ময়দানের মধ্যে এক শিবিরের দিকে সেদিন বিকেলে যাচ্ছিলাম কোন এক ক্রীড়াবিদ্ বন্ধুর সন্ধানে। চৌরঙ্গী অঞ্চলের এই মনোহরদাস তড়াগটি পথশ্রান্ত পথিকের পিপাসা-নিবারণের জন্য অতীতে প্রস্তুত হলেও তা ক'জনের তৃষ্ণা নিবারণ করে জানি না, তবে চার-পাশের চারটি গম্বুজ যে বহু ভবঘুরেকে আশ্রয় দান করে, এটা জানা ছিল। উত্তর দিকের প্রথম গম্বুজ, যেটি ট্রাম রাস্তার ধারে, সেটাও পার হয়ে দ্বিতীয়টির কাছাকাছি হয়ে, ক্রমে সেই গম্বুজটিও ছাড়িয়েছি, এমন সময় কে যেন পিছন থেকে হঠাৎ ডেকে উঠলো আমার পদবী ধরে। পদবী ধরে সম্বোধন করলেই যে নিশ্চিতরূপে সে লক্ষ্য আমি,—একথা মনে করার কারণ নেই, তবু স্বাভাবিক নিয়মেই থমকে দাঁড়ালাম। গম্বুজের মেঝে থেকে লোকটি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কালো ছিট দেওয়া ছিটের একটা সার্ট আর ঘন নীল রঙের ট্রাউজার্স পরণে মধ্যবয়সী লোকটি ধীরে ধীরে আমারই কাছে এসে দাঁড়ালো। মুখে খুশি হওয়া একটু হাসির রেখা। বললো,—চিনতে পারেন?

একটু অবাক হয়েই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছোট-ছোট করে মাথার চুলগুলি ছাঁটা। কপাল—চোখের কোণ—নাসিকানিম্নের দুটি পাশ আর চিবুক—এসব জায়গাকার রেখাগুলি দেখা দিয়েছে গভীর হয়ে, দেহের বর্ণও রোদে-পোড়া জলে-ভেজা,—তামাটে। আমাকে নিরুত্তর দেখে লোকটি অল্প একটু হাসলো, বললে—আমি কিন্তু চিনেছি। আপনি পারলেন না? বোস। ডি. কে. বোস। আন্দামানের! মনে নেই?

চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে মুখে আর কথা সরছিল না। আমার আন্দামানের অভিজ্ঞতা ১৯৪৯ সালের। তারপরে কেটে গেছে দশ-দশটা বছর! পরিবর্তনের প্রাথমিক স্রোতটা লক্ষ্য করেই এসেছিলাম, কিন্তু তারপর আরও কত সম্প্রসারণ হয়েছে জনপদের, আরও কত নতুন মানুষ ওখানে গিয়েছে তাদের সঠিক সংবাদ আমি জানবো কেমন করে? কিন্তু যেটুকু প্রত্যক্ষ করে এসেছিলাম, তা কখনই ভোলবার নয় এবং সেই ভুলতে-না-পারা মানুষগুলির মধ্যে এবাডিনের এই ডি. কে. বোস অন্যতম। আমি যে কাজ নিয়ে ওখানে গিয়ে-ছিলাম, তা সাময়িক, কিন্তু ডি. কে. বোস গিয়েছিল চাকরি নিয়ে, আমি

যাবার ঠিক আগের বছরটিতে! বিথী লাইনের ব্যাচেলার-মেসটিতে সে থাকতো। ঘোরাঘুরির নেশা ছিল, থিয়েটারের বাতিকও ছিল। মোটামুটি হৈ হৈ-করা প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তাকে আমার বিশেষভাবে মনে রাখবার কারণ ছিল অন্য। কোন-কিছু ঘটনা বর্ণনা করার ভঙ্গি ছিল তার অদ্ভুত। শোনা কথাও সে চোখ বড় বড় করে, হাত নেড়ে এমনভাবে বলতো, যেন সবই সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। জাপানীরা ওখানে শেষ যে বাঙালী ভদ্রলোকটিকে মাত্র গুপ্তচর সন্দেহ করে সেলুলার জেলে ফাঁসি দিয়েছিল, তাকে সে নিজে প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু তার মানসিক অবস্থা, তার বেঁচে থাকবার অদম্য বাসনা, তার ফাঁসির দড়ি দেখে আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠা, এসব সে সেদিন এমনভাবে বর্ণনা করেছিল, যে মনে হচ্ছিল, সেই বাঙালী ভদ্রলোক, মিস্টার ব্যানার্জি তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি!

এ ছাড়া, আরও একটা কারণে ডি কে. বোসকে আমার ভোলা উচিত নয়,—সেটা হচ্ছে ওর এক বিচিত্র মানসিকতা। এখানে জনান্তিকে বলে রাখা ভালো, ওর অবাঙালী বন্ধুবান্ধব, যাদের সঙ্গে ওর প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ, যাদের সঙ্গে ওর এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপে সুযোগ বুঝে ঘুরে বেড়ানো, তারা প্রায় সকলেই ব্যাচেলার হলেও নারীসঙ্গ-বিবর্জিত ছিল না। কিন্তু ভিন্ন ধরনের লোক ছিল ডি. কে. বোস। বলতো,—হাতে কিছু পয়সা জমুক, চাকরির একটু উন্নতি হোক, একেবারে দেশ থেকে বিয়ে করে মেয়ে নিয়ে আসব! ভালো মেয়ে। মনের মত মেয়ে। তার আগে দেহটাকে অপবিত্র করবো না।

বন্ধুরা হেসে উঠতো। কেউ-বা বলে উঠতো, তা বিয়েই করো না? এটা দ্বীপান্তর বলে কি এখানে মেয়ে নেই?

না, নেই, ডি. কে. বোস বলতো, আমি বিয়ে করবো কলকাতায় গিয়ে। কলকাতার মেয়ে নিয়ে আসবো, রীতিমত পড়াশুনো করা মেয়ে।

যাই হোক, ওকে দেখে এক মুহূর্তকালের মধ্যে আমার সব-কিছু মনে পড়ে গেল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলাম,—আরে ডি. কে.! তুমি এখানে?

একটু হেসে বললে,—এসেছিলাম। চলে যাচ্ছি।

মানে?

বললে,—হ্যাঁ। আমার ত কেউ ছিল না, এক জ্যেঠামশায় ছাড়া। তাঁর ওখানেই এসে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ চলে যাচ্ছি।

ছুটি নিয়ে এসেছিলে বুঝি? ফুরিয়ে গেল ছুটি?

না, বললে, ছুটি এক মাসের! এখনও দশ দিন বাকি। তবু যেতে হচ্ছে।

কেন?

বললে, শুনতে চান? তাহলে আমার সঙ্গে জাহাজে চলুন। চাঁদপাল ঘাটে এম-ভি আন্দামানস দাঁড়িয়ে আছে। কাল ভোরে ছাড়বে।

বললাম, আমার একটু কাজ ছিল! আচ্ছা, তা হোক, চলো তোমার সঙ্গেই যাই। তা তোমার চেহারা এমন হলো কেন? কী সুন্দর চেহারা ছিল তোমার! অথচ……

ম্লান একটু হেসে বললে, বুঝেছি, এই জন্যই চট্ করে চিনতে পারেননি! তা চেহারার আর কী হবে? এগারো বছর ওখানে থাকতে থাকতে একেবারে জংলী হয়ে গেছি!

এর মধ্যে একপারও আর দেশে আসোনি?

না।

বিবাহ?

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ময়দানের সেই স্তম্ভটার কাছে এসে পৌঁছেছি ততক্ষণে, যার সামনে, দুটি সৈনিকের মূর্তি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে! এদিক ওদিক লোকজন বসে আছে। ওরই মধ্যে একটু নিভৃতি খুঁজে নিয়ে বসলাম, বললাম, জাহাজে একটু পরে যাচ্ছি। ততক্ষণে একটু বসে নিলে হয় না?

বেশ।

অতএব স্তম্ভের ধারে বসলাম দুজনে। একটুক্ষণ থেমে থাকবার পর একটু ম্লান হেসে এক সময় বললে,—এগারো বছর পরে ঐ বিবাহ করতেই আসা।

উৎসুক হয়ে বললে উঠলাম,—তারপর?

বললে,—তারপর আর কী? জ্যেঠাইমার উদ্যোগই বেশ। তাঁর দূর সম্পর্কের ভাইঝি। হলো সম্বন্ধ। চিঠি পেয়ে ছুটিছাটা নিয়ে আমিও এলাম। পাকা দেখার কথা ছিল কাল। আমারই যাবার কথা ছিল। শুনেছি ভালোই দেখতে মেয়েটিকে। বি-এ পড়ছে। কিন্তু যত কাছে আসতে লাগলো তাকে দেখার মুহূর্ত, ততই ভিতরে-ভিতরে একটা আতঙ্ক জাগতে লাগলো। মনে হলো, আমি কি সভ্যজগতের কেউ? এ মেয়ে কি ওখানে গিয়ে সুখী হবে? তাই আজ চুপি চুপি এজেন্টের সঙ্গে দেখা করে, সব বন্দোবস্ত করে, জাহাজে উঠে বসেছি। ওরা কেউ এখনও জানে না যে আমি পালাচ্ছি। জাহাজ থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এতদূর এসেও ট্রাম লাইনের ওদিকে যেতে পারছিলাম না, চেনাশোনা যদি কারুর সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়।

চেনাশোনা মানে, বিয়ের এই ব্যাপারের সঙ্গে যারা জড়িত। আপনার মতো লোকের কথা নয় অবশ্য।

বললাম, কিন্তু এ পলায়নের কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এতে ঠিক পালাবার মতো কী অবস্থা হলো?

বললে, "এগারো বছর পরে কলকাতা এলাম। দেখি সব বদলে গেছে। মানুষগুলোও। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই, স্বার্থ নিয়ে টানাটানি, হানাহানি। মানুষের মন যেন আরও ক্ষুদ্র, আরও নিচ হয়ে গেছে। চারদিকে, মানুষের আচারে-ব্যবহারে অদ্ভুত এটা কৃত্রিমতা। আমি হাঁপিয়ে উঠলাম।

বললাম, "বুঝেছি তোমার কথা। কিন্তু এর সঙ্গে বিযে না কবার কী সম্বন্ধ? এভাবে পালানোই বা কেন চুপিচুপি?

ও স্থির মনে কথাগুলি শুনছিল আমার। একসময় বললো,—আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে গেলে আপনাকে একটা গল্প শোনাতে হয়।

গল্প? ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে উঠলাম, কী গল্প? বেশ, শোনাও।

হঠাৎ এই সময় ঘুর্ণি একটা হাওয়া জাগলো। আমরা মাথা নিচু করে থেকে, সেটাকে পার করে দিয়ে আবার স্থির হয়ে বসলাম দুজনে।

ও বললে,—কার নিকোবরের কথা আপনার মনে আছে? যাকে আমাদের প্রাচীনেরা নাম দিয়েছিলেন, নগ্নদ্বীপ? যেখান থেকে দ্বীপের অধিবাসীর দল চল্লিশ মাইল সমুদ্রের ঢেউ ঠেলে ঠেলে নৌকো কবে যায় চাওড়াদ্বীপে?

বললাম,—তা হবে। কিন্তু কী বলতে চাও?

ডি. কে. বললে, কার-নিকোবরের সমুদ্র-তীরবর্তী একটা গ্রাম, নাম, ধরুন, লাপাতি। এই লাপাতি গ্রামের একটি মানুষের কথা আমার আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে। তার কথা যখন এবার্ডিনে বসে প্রথম শুনি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে, তখন নিছক একটা কাহিনীই শুনে গেছি, কিন্তু আজ, তার মধ্যে একটা তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছি। এই যে এই শহরে এত মানুষ পথ দিয়ে যাচ্ছে আর আসছে, এদের মুখের ভাব—এদের চলাফেরা—এদের সব-কিছু, এত কৃত্রিম,—এত ছকে-ফেলা,—যে, তা আপনাদের চোখে পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের চোখে বড্ড লাগে। বড্ড মেকী মনে হয়।

অবাক হয়ে ডি. কে.-র কথা শুনে যাচ্ছিলাম। এবার্ডিনে ওর সঙ্গে যখন মিশেছি, তখন ওকে দেখেছিলাম অন্য মানুষ, তুচ্ছ মান-অভিমান কিংবা ছোট ছোট আঘাত আর দুঃখ, যা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মানুষের সঙ্গে মানুষ থাকলেই এসে পড়তে বাধ্য,—সেসব ও কোনও দিন গায়ে মাখত না, বহু মানসিক আঘাত অথবা বঞ্চনার স্পর্শ ও হেসেই সেদিন উড়িয়ে দিয়েছে বলা চলে। কিন্তু আজ

ওর কথার ধরন অন্যরকম। কী এক অভাবনীয় আত্মমগ্নতায় ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অবশ্য এগারো বছরের ব্যবধান, এর মধ্যে মানুষের জীবনে কত রকমই না পরিবর্তন আসতে পারে! ওর চেহারারও কি পরিবর্তন এসেছে কম? এখন দেখলে মনে হয়, ও বুঝি বাঙালীই নয়, অন্য দেশের মানুষ।

ডি. কে. একটুখানি থেমে থেমে তারপরে শুরু করলো, দ্বীপান্তরে থেকে যে আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের জন্য মন কাঁদতো, কলকাতায় এসে দেখি, তারা ভিন্ন মানুষ। তাদের সঙ্গে আমার সমস্ত সংযোগের সূক্ষ্ম তন্তুগুলিকে কে যেন কখন সবার অজ্ঞাতে হঠাৎ ছিন্ন করে দিয়েছে! যে সব পরিবারে আমার আগে অবারিত দ্বার ছিল, সেখানে কেমন যেন একটা সতর্কতার ভাব। মেয়েরা, অর্থাৎ, আমার বোন, বৌদি, মাসি-পিসীর দল—যারা সর্বক্ষণ আমাকে ঘিরে একদিন গল্পগুজব করত,—আজ তারা কাছে আসতেও যেন ভয় পায়! কতজন ত সামনেই এলো না!

ডি. কে. থেমে গেল। আমিও চুপ করে বসে আছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে নেমে এলো অন্ধকার।

এক সময় ডি. কে. আবার বলে উঠলো, আপনাকে দেখে ভয়ানক আনন্দ হলো, পিছন থেকে ডেকেও উঠলাম, কিন্তু পরক্ষণেই ভয় হলো, মনে হলো, যদি আপনিও মুখ ফিরিয়ে চলে যান।

বললাম, এটা তোমার বুঝবারও ভুল হতে পারে। আজ যাঁরা সহজেই তোমার কাছে আসতে পারেন নি, বহুদিনের অদর্শনের জন্য তাঁদের পক্ষে সামান্য একটু লজ্জা অথবা সংকোচ হওয়া স্বাভাবিক। আরও দিন কয়েকের পরিচয়ে হয়ত এ জড়িমা কেটে যেতে পারতো।

না-না! ডি. কে. ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, সেটা আমিও ভেবেছিলাম। তাই মিশতে গিয়েছিলাম আরও আপনার হয়ে। কিন্তু আমাকে ওরা কেউ ভাবতে পারে না আপনার বলে। অথচ আমার স্বপ্ন ছিল, কলকাতায় আসবো, এখানেই বিয়ে করবো।

বললাম, হ্যাঁ, তা আমি জানতাম। তুমি বলেছিলে।

বললে, বিশ্বাস করুন, আমার দেহ আজও পবিত্র। আমি বিয়ে করবো বলে কখনও কুসংসর্গ করিনি, কুকাজ করিনি, কোন নেশা পর্যন্ত ছিল না আমার।

বললাম, কিন্তু এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, সেই বিয়ে যখন স্থির হলো, তখন সে কাজ শেষ না করে তোমার এভাবে চলে যাবার অর্থ কী?

ডি. কে. চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললে, তাহলে কার-নিকোবরের লাপাতি গ্রামের সেই অধিবাসী মানুষটির কথাই শুনুন। নারিকেল

বন ঘেরা সেই ছোট্ট দ্বীপ, চারদিকে দিগন্ত বিস্তৃত উধাও সমুদ্র, সেই সমুদ্রপথে একদিন গ্রামের ধারে এসে লাগলো দুটি ছোট্ট মোটর লঞ্চ, একটা খাড়ির মধ্যে বোটগুলি রেখে, বোটের সেই অচেনা মানুষগুলি গ্রামের ভিতরে চলে গেল গাঁওবুড়োর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর।

একটু দূর থেকে এ সবই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল সেই লোকটি। মাথায় ছোট ছোট কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, কোমরে লেংটির মত একটু করে কাপড় ছাড়া আর কোথাও কোন আবরণ নেই দেহে! মিশ্‌কালো নাতিদীর্ঘ দোহারা চেহারা।

গাঁওবুড়ো আর তার দলবল আগন্তুকদের নিয়ে গাঁয়ের অভ্যন্তরে মিলিয়ে যেতেই, লোকটি নিম্নকণ্ঠে ডেকে উঠলো, গাং?

কাছেই যে বারোয়ারী ঘরটি রয়েছে কয়েকটি মোটা মোটা খুঁটির ওপরে আশ্রয় করে, যার নাম, এল্‌পানাম্‌, যার নিচে রাখা আছে গাঁয়ের নৌকোখানা, তার পাশ থেকে উঠে এলো অনুরূপ বর্ণেরই একটি লোক। কাছে এসে বললে, কী? ডাকলে কেন?

গাং-এর চেহারা ঐ লোকটির থেকে অনেক মজবুত। বয়সে সে যথেষ্ট তরুণও বটে। তার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে লোকটি বললে, গাঁয়ে আবার নতুন 'তারিক' এলো, দেখলি ত?

হ্যাঁ, দেখলাম। কিন্তু 'তারিক' কোথায়? ওদের আমাদের মত হাত-পা মাথা বলে কি ওরা আমাদের মত 'তারিক'? ওদের পোশাক আশাক দেখলি না? ওরা 'লাও',—শয়তান।

শয়তান, ত' গাঁওবুড়ো অত খাতির করে ওদের ভিতরে নিয়ে গেল কেন?

গাং বললে, খাতির না করে উপায়? ওরা রেগে গেলে কি আর রক্ষে আছে?

কেন?

গাং এবার বিরক্ত হলো। বললে, সেসব দেখবার আমাদের দরকার কী? গাঁওবুড়ো যা করবে আমাদের ভালোর জন্যেই করবে। আমরা যে কাজে লেগে আছি সে কাজেই থাকি। আয়, সাঁঝ হয়ে এলো।

লোকটির নাম মারো। মারোর দেহের মাংসপেশীগুলি শিথিল হয়ে গেছে, মুখেও বলিরেখার চিহ্ন। বয়স কোন না ষাটের কাছাকাছি? কিন্তু এসব নিয়ে ওরা তেমন মাথা ঘামায় না।

"এল্‌-পানাম' বা বারোয়ারী ঘরের কাছে সমুদ্রের দিকটা ঘেঁষে কঞ্চি আর পাতাসুদ্ধ একটা বাঁশ পোতা আছে, তার কাছে গিয়ে ওরা হাঁটু গেড়ে বসলো।

মাথা নিচু করে দুটি হাত বুকের উপর রেখে চুপচাপ বসে রইলো ওরা বহুক্ষণ। এই পাতাসুদ্ধ বাঁশ ওদের কাছে দেবতার প্রতীক। ইনি ওদের সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন।

ধীরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কুটিরের কাছে কাঠের গুঁড়ি জড়ো করে দিনের বেলাতেই আগুন জেলে রাখা হয়েছিল। এই আগুন আনা হয়েছিল গ্রামের ভিতর থেকেই। সেই আগুনের শিখা রাত্রের অন্ধকারে আরও উজ্জল হয়ে দেখা দিল। ইতিমধ্যে আরও একটি ছায়ামূর্তি এসে সেই আগুন থেকে আগুন জ্বালালো একটি ডাবের খোলের মধ্যে সঞ্চিত চর্বিতে। তারপরে প্রদীপের মতো সেই শিখান্বিত ডাবের খোলা নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেল বারোয়ারী ঘরের দিকে।

মারো আর গাং এলো এবারে বারোয়ারী ঘরেব নিচে, তাদের সযত্নে রক্ষিত নৌকোটার কাছে। হাতে ছোট্ট মশাল। সেটা একটু দূরে বালিতে পুঁতে রেখে, তারই আলোয় তারা ভালো করে দেখছিল নৌকোটিকে। এই বিচিত্র নৌকোটি করেই তারা বছরে একবার কবে তীর্থযাত্রার মত 'চাওড়া' দ্বীপে যায়। এই নৌকোটির সঙ্গে বহু স্মৃতি তাদের বিজড়িত।

এক সময় নৌকোর পাশেও ওরা অনুরূপভাবে হাঁটু মুড়ে বসে বইলো কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নৌকো ওদের 'ইয়োম'। অর্থাৎ পিতামহ। নৌকোরও প্রাণ আছে, নৌকোও জীবন্ত। ওঁর রীতিমত পরিচর্যা করতে হয়।

সন্ধ্যাকালীন সেই পরিচর্যার পালা শেষ করে ওরা আবার এসে বসলো ওদের সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে। সমুদ্রগর্জনের সঙ্গে মিশে একটানা একটা ড়ুম্ ড়ুম্ শব্দ ভেসে আসছে এতক্ষণে। ওরা নীরবে ওদের খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ করলো। সে খাদ্য তালিকায় ওদের অতি প্রিয় 'কাঁকড়া' নেই। কারণ, কাঁকড়া খাওয়া ওদের এখন নিষেধ। ওরা এখন হচ্ছে 'ইয়োম-আব', অর্থাৎ নৌকোর পরিচর্যাকারী। ওরা নৌকা ছেড়ে কোথাও যেতে পাববে না, 'কাঁকড়া জাতীয়' কিছু খেতে পারবে না, এমনকি কাঠও চিরে নিতে পারবে না, কারণ তাতে 'ইয়োম' বা নৌকোর অমঙ্গল হতে পাবে।

মারো প্রশ্ন করলো, ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না? ড়ুম-ড়ুম-ড়ুম? তাহলে 'কা-না-আনহাউন' আরম্ভ হলো, কী বলিস?

গাং বললে, হ্যাঁ, তা হলো।

'কা-না-আন-হাউন' বা 'কান-হাউন' ওদের জীবনের সব থেকে বড় উৎসব। প্রত্যেক নিকোবরী পল্লীর 'টুহেট' বা সারি সারি কুটিরগুলির সামনে দেখা যাবে,

বিরাট একটা কাঠের গুঁড়ি সোজা দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে, আর তাতে ক্রুশের মত করে পর-পর কাঠের বা বাঁশের টুকরো বাঁধা আছে ওপর থেকে একেবারে নিচে পর্যন্ত। সেই ক্রুশ-এর বাহুগুলিতে ঝুলছে নানারকম বিশুষ্ক খাদ্যদ্রব্য, শুকনো শুয়োরের মাংস বা নানারকম শুকনো ফল। মাথায় ত্রিশূলের মত তিনটি কাঠি। একে ওরা বলে, 'হ্যাম্না-আন-কু-পা'—অতি পবিত্র বস্তু। গাঁয়ের যারা মারা যায়, তাদের উদ্দেশ্যে ঐ ক্রুশে ঝুলিয়ে রাখা হয় খাদ্যদ্রব্য। বছরের শেষে এই 'কান-হাউন' উৎসবে ওগুলিকে নামানো হয়, নামিয়ে নতুন খুঁটি পোঁতা হয়! আর পুরোনো দিয়ে সুরু হয় উৎসব। আসলে, ওটি মৃত আত্মাদের স্মরণোৎসব। কিন্তু, এর নৃত্যগীত ও ভোজের আয়োজন যে কোন নিকোবরীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এবং এজন্য গাঁয়ের প্রতিটি নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ গিয়ে যোগ দেয় এই উৎসবে। একমাত্র 'ইয়োম্-আব' ছাড়া। ঢাকের 'ড্রুমড্রুম-ড্রুম' শব্দ ওদের প্রবলভাবে আঁকর্ষণ করলেও, ওদের ওখানে কোনও রকমে যাওয়ার উপায় নেই। 'ইয়োম' ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তাতে আগামী 'চাওড়া' যাত্রার সঙ্গে প্রত্যেকটি নিকোবরী যুবকের ভাগ্য বিজড়িত। 'চাওড়া'য় যে যায়নি, এমন যুবকের হৃদয়ের আবেদন কোনো নিকোবরী রমণীর হৃদয় স্পর্শ করে না।

মারো বললে, বেনোবুড়ীকে একবার ডাক না?

কেন?

জিজ্ঞাসা করি, তিরিন্ কেমন আছে? বাচ্চা হলো কিনা?

গাং অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, তিরিনের বাচ্চা হলে কি আর বেনোবুড়ি ছুটে আসবে না খবর দিতে?

মারো মুখ তুলে 'এল-পানাম' বা বারোয়ারী ঘরটার দিকে তাকালো! কোনও সাড়াশব্দ নেই, শুধু দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে ড্রুম-ড্রুম-ড্রুম-ড্রুম!

মারো বললে, বেনোবুড়ি সাঁঝের বেলা আগুন নিয়ে একবার ঘরে গেল না?

তা গেল।

মারো হেসে উঠলো, ঠিক হয়েছে, বুড়িও আজ আচ্ছা জব্দ, কান-হাউন-এ যেতে পারলো না।

গাং বললে, বেনো ত বুড়ি। কিন্তু তিরিনের কী অবস্থা বল? যুবতী মেয়ে, কোথায় গিয়ে নাচের আসরে পা ছড়িয়ে বসে গানের ধুয়া ধরবে, রে-লে-লেলে! তা না, এল্ পানামে আটকে রইলো।

মারো বললে, তাতে কী! বাচ্চা আসছে না! আচ্ছা, কী বাচ্চা ওর হবে বলতো? ছেলে, না মেয়ে?

গাং বললে, তা নিয়ে তোর অত মাথা বাথা কেন? তিরিনের মরদ ওদিকে কান-হাউনে গিয়ে মেতেছে, তার কোনও খেয়াল নেই, আর ইনি করছেন এখানে বসে মাতব্বরী! বুড়ো হলে মানুষের এই দশাই হয়।

চটে উঠল মারো, বললে, এই খবরদার। বুড়ো বলবি না?

না, বলব না! নিজের শরীরের দিকে চেয়ে দেখেছিস! চামড়া ঝুলে পড়েছে। বেনোবুড়ির দশা হলে বলে!

কী এক অদ্ভুত আবেগ এসে হঠাৎ কণ্ঠরোধ করলো মারোর, প্রথমে ইচ্ছা হলো, গাং-এর টুটি টিপে ধবে। কিন্তু ও জোয়ান, ওর সঙ্গে শক্তিতে ও পারবে কেন? পরক্ষণেই মনে হলো, কী এক অব্যক্ত হাহাকাব যেন বুকের মধ্যে দাপাদাপি করে মরছে।

ওকে নিরুত্তর দেখে, গাং-এব মনটাও নরম হলো। গাং বললে, কত বয়স হলো?

কে জানে! তিন কুড়ি হবে হয়ত। এমন আর কী।

আবার সব চুপচাপ। সমুদ্রের ঢেউ কিন্তু অক্লান্তভাবে তীরভূমিতে এসে ক্রমাগত ভেঙে পড়ছে। কিছুক্ষণ পরে মারোই ভঙ্গ করলো ওদের নীরবতা। বললে, "আমি কতবার 'চাওড়া' গেছি বলত? আট-আটবাব। আমার কি বিয়ে করার কোনও বাধা ছিল? কোনও মেয়ের মন পাওয়া কি কঠিন ছিল আমার পক্ষে? এই বেনোবুড়ি, বুড়ি তখনও সে হয়নি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কতবার। আমি রাজি হয়নি।

কেন? সারাজীবন বিয়ে না করে কাটালিই বা কেমন করে?

মারো বললে, সারাজীবন কাটালাম কোথায়? এখনও কি বিয়ে করতে পারি না? খুব পারি।

তাহলে করছিস না কেন?

হঠাৎ চুপ করে গেল মাবো। মাথাটা নিচু করে কী এক প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল সে। যেমন প্রতিটি নিকোববী তরুণ যথানিয়মে বিয়ে করে, তেমন মারোও হয়ত বিয়ে করত, যেমন সবাই জীবন কাটায়, তেমনি জীবন কাটাতো কিন্তু, হঠাৎ তার মনে জাগলো অদ্ভুত এক অভিলাষ!

তখন টুপি মাথায় সাদা চামড়ার মানুষগুলি এ দ্বীপে আসতে আরম্ভ করেছে।

কত কী উপহার নিয়ে আসত তারা। এখনও পুরানো নিকোবরী ঘরে সেসব জিনিস সযত্নে রক্ষিত আছে, দেখা যায়।

একদল তরুণ ক্ষেপে গিয়েছিল, বলেছিল, "ওরা 'তারিক' বা 'মানুষ' নয়, ওর 'লাও', শয়তান। কচ্ছপ-মারা বর্শা দিয়ে ওদের বিঁধে ফেলবো।"

গাও-বুড়ো ধমকে উঠেছিল, "ওদের হাতে কী রয়েছে দেখছিস না? চোখের কাছে উঠিয়ে দারুণ শব্দ করে, আর পাখীগুলো কিম্বা বুনো শুয়োরগুলো ছটফট করে মরে যায়। তোরা ঐসব বর্শা আর তীরধনুক দিয়ে ওদের সঙ্গে যুঝবি কতক্ষণ? আর, তাছাড়া, লোক ত ওরা খারাপ নয়। ওরা ত বন্ধু। তোদের কোনও ক্ষতি করছে না ওরা।"

এইরকম তখন তিন চারবার এসেছিল সেই সাদা চামড়ার লোকগুলো। তাদের গাঁয়ে দু তিন দিন থেকেও যেতো।

দিন যায়। একদিন এলো গাঁয়ের একটি মেয়ে এল্ পানামে। সেদিন আজকের মতই 'ইয়োম-আব' হয়েছিল মারো। শেষ রাত্রের দিকে কান্না শোনা গেল কচি কণ্ঠের। সকালবেলা, গাঁওবুড়োর সঙ্গে কুটিরের ওপরে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে সেই বাচ্চাটিকে দেখে মারোর দুচোখে আর পলক পড়তে চায় না। বাচ্চাটা মেয়ে সন্তান। কিন্তু কী চমৎকার নাক, আর চোখ-মুখের গড়ন। গায়ের রঙ লালচে নয়, বেশ সাদা, ধবধবে।

সেই থেকে অদ্ভুত এক অভিলাষ জেগে উঠেছিল মারোর মনে। তখন তার এক কুড়ি বছর বয়স, সবে একবার 'চাওড়া' ঘুরে এসেছে, বেনোর মত কত মেয়ে তার ঘর করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয়নি। মনে মনে তখন সে স্থির করেছিল, ঐ মেয়ে বড়ো হোক, ওকেই সে বিয়ে করবে।

বড়ো হল মেয়ে। ওরা নাম দিল, হানা। কিন্তু তার কাছে ঘেঁসবে সাধ্য কার? গাঁওবুড়ো তাকে সব সময় কাছে কাছে চোখে-চোখে রাখে। কতো নিকোবরী তরুণের ইচ্ছা তাকে বিয়ে করে। মারোও আকারে ইঙ্গিতে গাও-বুড়োকে জানিয়েছিল তার মনের কথা। কিন্তু সবার সব কথাই বুড়ো হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, সাদা মেয়ে আরও একটু বড়ো হোক, তখন, ভাববো বিয়ের কথা।

হানা আরও বড়ো হলো। এক কুড়ি বয়স হল তার। কিন্তু কেউ তাকে পেলো না। আজকে ঐ যে 'যন্ত্রের নৌকো' এসেছে, ঐ রকম একটা নৌকো এসে দ্বীপে লাগলো, এলো সব সাদা চামড়ার দল, তাদের সঙ্গে যন্ত্রের নৌকো করে কোথায় যেন চলে গেল হানা।

দিন যায়। আরও একদিনের কথা। মারোর তখন দু-কুড়ি বয়েস।

ইতিমধ্যে সেই সব সাদা মানুষগুলো আরও আসতে লাগলো দ্বীপে। এল্-পানামে আরও একটি প্রসূতির বাচ্চা হলো। এটিও সেই রকম সাদা-ধবধবে। এটিও মেয়ে। এটিকে দেখে এবারও প্রতিজ্ঞা করলো মারো, বিয়ে যদি করতেই হয়, একেই সে করবে।

এইভাবে, তিন কুড়ি বয়সে এসে পৌঁছেছে মারো। আর, সেই সাদা মেয়েটির নাম ওরা রেখেছে, 'বালা'। এক ধরনের পাখির নাম, সেও আজ বিশ বছরের তরুণী। অন্য সবার মত মাথা কামানো নয়, কাঁধ পর্যন্ত তার মাথার চুল। কী সুন্দর দুটি চোখ, নাক, আর ঠোঁট? এটি যেন আগেরটির থেকেও সুন্দর।

সেই পুরানো গাঁওবুড়ো আর নেই, নতুন গাঁওবুড়ো সেই বুড়োরই ভাই। তাকে সে মনের কথা খুলেই বলে রেখেছে। বালাকে তার চাই-ই।

বালার মন জয় করবার জন্য সে আরও কয়েকবার 'চাওড়া' গিয়েছে, বালাকে সে এনে দিয়েছে কচ্ছপের খোল, নানান রকমের ঝিনুক, শঙ্খ আরও কত কী।

গাং বললে, "কী চুপ করে আছিস যে?"

মারো বললে, "বিয়ে করবো বালাকে।"

গাং হেসে বললে, "সে ত গাঁওসুদ্ধ সবাই জানে।"

মারো বললে, "গাঁওবুড়ো বলেছে, তার আপত্তি নেই। বালা রাজী হলেই হয়।"

"তা বালা কি রাজী নয়?"

"কে জানে? যতবার বলি, সে শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে।"

গাং পরামর্শ দিলে, "তুই জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর।"

মারো বললে, "ছিঃ! তা কখনও হয়! ওরা মন না দিলে ওদের পেতে নেই।"

গাং বললে, "বাজে কথা। বিলিকু যখন প্রথম মানুষ 'মিথে'কে সৃষ্টি করলেন, মিথে মাটি দিয়ে একটা পুতুল তৈরি করেছিল। সেই পুতুল আগুনের তাত পেয়ে হল মানুষ। মেয়েমানুষ। সে প্রাণ পেয়ে মিথের দিকে চেয়ে একটু হেসেছিল। বলেছিল, 'তুমি আমাকে তৈরি করেছো, তুমিই আমাকে নাও। আমাতে তোমারই অধিকার শুধু।' মিথে গ্রহণ করেছিল তাকে, কিন্তু তখন কি মিথে তার মনের সত্যিকার কথাটা ভেবেছিল?

মারো বললে, "সে ত মিথের নিজের হাতের তৈরি। বালা ত আমার হাতের তৈরি নয়। ওর মনের ওপর আমার কী অধিকার?"

ওরা কথা বলছে, এমন সময় দূর থেকে ঢাকের 'দুম-দুম-দুম' শব্দের সঙ্গে মিশে এক সঙ্গে অনেকগুলি লোকের মাটিতে পা ফেলার ধুপধাপ শব্দও শোনা গেল।

সঙ্গে কী এক তীব্রস্বরের গানের স্বর। একটুক্ষণ চলে একটানা সেই স্বর, তারপরেই ভেসে আসে মিশ্রিত স্ত্রী-কণ্ঠের গানের ধুয়া, রে-লে-লে-লে!'

কিছুক্ষণের জন্য ওদের বুঝি অভিভূত করে দিলো ওদের সেই চিরপরিচিত সঙ্গীত। ওরা চুপচাপ বসে বসে শুনতে লাগলো।

একটুক্ষণ পরে মারো বললে, "বালার গলার স্বর ভেসে আসছে না?"

গাং বললে, "স্বপ্ন দেখছিস নাকি? একসঙ্গে মেয়েগুলি চেঁচাচ্ছে, তার মধ্যে বালার গলার স্বর কোনটা চিনে বার করবে কে?"

"ওর মা এই গাঁওবুড়োর মেয়ে। তাই বালা গাঁওবুড়োর কাছে থাকে। অন্য কারুর বাড়িতে থাকলে আমি ঠিক ভাব জমিয়ে নিতাম।"

গাং বললে, "তুই যা না লুকিয়ে গাঁয়ের মধ্যে। আমি আছি। দেখে আয় কী করছে বালা।"

"ছিঃ!" মারো বললে, "আমি ইয়োম আব। নৌকো ফেলে কখনই যাবো না।"

গাং বললে, "তুই আচ্ছা বোকা কিন্তু। বালার জন্য বিয়েটা পর্যন্ত করলি না? সারাটা জীবন এমন একা-একা কাটিয়ে দিলি?"

মারো একটু হাসলো, বললে, "বোকা নই, আমিই চালাক। আমার কথা ত সবাই জানে। কে আমার মতো বিয়ে-না করে দিন কাটাতে পেরেছে? তুইত আমার সবই জানিস। হানা বোঝেনি, কিন্তু বালা ত বুঝবে? বালা ত বুঝবে, আমি কী মন নিয়ে তার জন্য বসে আছি।"

"কিন্তু, আজ যারা যন্ত্রের নৌকোয় এসেছে, তারা?

মুহূর্তে একটা কালো ছায়া খেলে গেল মারোর মুখের ওপর দিয়ে। সে একটুক্ষন থেমে থেকে তারপর বললে, "জামাকাপড় সেই রকম পরলেও ওরা ঠিক সেই সাদা 'লাও'দের মত নয়। তাই না?

"হবে। কিন্তু, বালাকে নিয়ে যদি ওরা চলে যায়?"

উত্তেজিত হয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো মারো, বললে, "তাহলে সত্যি বলছি গাং, আমার ঐ মাছ-মারা বর্শা দিয়ে আমি ওদের মেরে ফেলবো একেবারে! গাঁওবুড়োর কোনও নিষেধ আমি শুনবো না!"

বলতে বলতে, গলাটা ধরে এলো মারোর। ধীরে ধীরে বসে পড়লো সে। তারপরে অদ্ভুত করুণ কণ্ঠে বলে উঠলো, "ঠিক এই কথাটাই আমি ভাবছি গাং। মেয়েদের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুতেই যেতে চায় না গাঁয়ের মাতব্বররা। বালা যদি বলে, সে ওদের সঙ্গে যাবে, তাহলে? গাঁওবুড়ো ত বাধা দিতে পারবে না!"

"হানা কি এমনি করে নিজের ইচ্ছায় চলে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। পুরানো গাঁওবুড়ো ত আমাকে তাই বলেছিল।"

"তাহলে?"

মারো বললে, "ওরা কান-হাউনে সবাই মত্ত। ঐ নতুন মানুষগুলো বালাকে নিয়ে কী করছে বলো ত? কী তাকে বোঝাচ্ছে কে জানে! আমি এখন যেতাম ত বাজপাখির মত ছিনিয়ে নিয়ে আসতাম।"

"তাই যা না?"

"কী করে যাবো? আমি যে ইয়োম-আব!"

বলে দু-হাতে মাথা গুঁজে স্থাণুর মত কিছুক্ষণ বসে রইলো মারো।

গাংয়ের মনটা দেখতে দেখতে করুণায় ভরে গেল। সে বললে, "আমি যাবো? দেখে আসবো?"

মুখ তুললো মারো, বললে, "তুই কী করে যাবি! তুইওত ইয়োম-আব। না-না, নৌকোর দেবতাকে চটিয়ে সারা গাঁয়ের অমঙ্গল ডেকে আনিস না।"

কিছুক্ষণ আরও কেটে গেল নীরবে। এক সময় মারো বললে, "দেখ, হানার ঘটনার পবে বিশ বছর কেটে গেছে। ঐ নতুন মানুষগুলি আগের চেয়ে আরও সভ্য হয়েছে না? হয়ত ওরা এবার কিছুই করবে না।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে গাং বলে উঠলো, "তুই ত আচ্ছা মানুষ! নিজে কালো, সাদা মেয়ের দিকে ঝোঁক কেন?"

"কে বললে সাদা মেয়ে?" মারো বললে, "ও ত আমাদের মেয়ে। আমাদের দ্বীপেব মেয়ের গর্ভে জন্ম। ঐ এল্-পানামে।"

রাত্রি বোধহয তখন শেষের দিকে। হঠাৎ এল্-পানাম থেকে ভেসে এলো একটি শিশুর কলকণ্ঠ।

গাং চমকে উঠে বললে, "বাচ্চা হলো বুঝি তিরিনের।"

বেনোবুড়ি ছুটতে ছুটতে এলো একটু পরেই। বললে, "মেয়ে হয়েছে গো, মেয়ে। আমি গাঁয়ে যাচ্ছি মেয়ের বাপকে খবর দিতে। গাঁওবুড়োকে খবর দিতে।"

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল রাত। গাঁয়ের মধ্যের উৎসব ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সমুদ্রের ধারে আসতে লাগলো লোকজন।

ভোরের বাতাসে ওরা দুজন বোধ হয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। হঠাৎ রৌদ্রের তেজ মুখে অনুভব করে ধড়মড় করে উঠে বসলো গাং, তারপর অদূরের মোটর-বোটের ওপর চোখ পড়ায় কী দেখে বুঝি অবাক হয়ে গেল।

পরক্ষণে সম্বিৎ ফিরে আসতেই তাড়াতাড়ি টেনে তুললো নিদ্রিত মারোকে। বললে, "ঐ দেখ ?"

কী দেখলো মারো ? সেই নতুন মানুষগুলি গাঁওবুড়োর হাত থেকে বালাকে নিয়ে তাদের নৌকোয় গিয়ে উঠলো। নৌকো নোঙর তুলে শব্দ করতে করতে মুখ ফিরিয়ে খাড়ি থেকে এখুনি সমুদ্রে পড়বে।

তীব্র বেগে গাঁওবুড়োর কাছে ছুটে এলো মারো। বললে, "একী করলে ! বালাকে ওদের হাতে সত্যি তুলে দিলে ?"

গাঁওবুড়ো ওর দিকে মুখ ফেরালো, বললে, "তুলে দিলাম, না ওরা নিয়ে গেল ? পারবো আমরা ওদের সঙ্গে জোরে ? আমাদের ওরা মেরে ফেলবে না ?"

ইচ্ছা করছিল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকার গতির মুখ সে আটকায়। একটা চিৎকার করে সে বোধ হয় জলে ঝাঁপও দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু চারদিক থেকে লোকজন এসে ধরে ফেললো তাকে।

কিছুক্ষণ পাগলের মত ঝটাপটি করে অবশেষে শান্ত হয়ে গেল মারো। কাকে সে আটকাবে ? কাকে সে ধরবে ? ওদের যন্ত্রের নৌকো তখন অনেক দূরে চলে গেছে। নির্জীবের মত বসে পড়েছে মারো। কী করবে সে ? তারা সেন্টিনেলিজ বা জারোয়াদের মত দুর্দ্ধর্ষ নয়, তারা শান্তিপ্রিয়, অপেক্ষাকৃত নিরীহও বটে।

এমন সময় বেনোবুড়ি এলে ডাকলো গাঁওবুড়োকে।

"এল-পানামে আয়। তিরিনের বাচ্চা হয়েছে যে !"

সবাই ছুটে গেল নবজাতককে দেখতে। গাঁওবুড়ো জোর করে মারোকেও টেনে নিয়ে গেল। ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটি। মেয়ে। মারো বিস্মিত-বিমুগ্ধ চোখে দেখতে লাগলো, কী সুন্দর চোখ, কী সুন্দর টিকোলো নাক, কী সুন্দর ঠোঁট। আর, গায়ের রঙও লালচে নয়, ধবধবে সাদা।

দরজার কাছ থেকে নিচে এসে গাংকে সঙ্গে করে আবার সে বসলো সমুদ্রের ধারে নারকেলপাতার ছায়ায়। সমুদ্রের ঢেউ তেমনি অক্লান্ত তীরভূমিতে এসে ভেঙে পড়ছে ! সেইদিকে তাকিয়ে মারো বললে, "ঠিক হয়েছে। বালা গেছে যাক। এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করবো, এ যখন বড়ো হবে।"

গাং কী বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। সে বলতে চাইছিল, এ মেয়ের বয়স যখন এক কুড়ি হবে, তখন তোমার বয়স হবে কত ? তখন তুমি বেঁচে থাকবে কী ? বেঁচে থাকলেও নতুন করে ঘর পাতবার সামর্থও আর তোমার থাকবে কী ?

কিন্তু ওর দুটি স্বপ্নালু চোখের দিকে তাকিয়ে গাং তা আর বলতে

পারলো না। সে বললে অন্য কথা। বললে, "তখনও যদি এই ঘটনা ঘটে? নতুন লোক এসে এইভাবে ওকে নিয়ে যায়?"

কী-এক আবেগে আবার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল মারোর। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা বলতে পারলো না। তারপরে, অনেক পরে নিজেকে কোনক্রমে সামলে নিয়ে সে বললে, "তখন? তখন কী হবে জানিস? ঐ নতুন মানুষগুলি—আরও সভ্য হয়ে যাবে, তারা এভাবে মানুষ হয়ে মানুষের ওপর আর অত্যাচার করবে না!"

সেই স্তম্ভ, যার সামনে দুপাশে দুটি পাথরের সৈনিক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে বসে বসে ওর কাহিনী শুনতে শুনতে ওর সর্বশেষ কথাটা কানে আসতেই চমকে উঠলাম।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে ডি. কে.। বললে, "রাত হয়েছে। বাড়ি যান। আমিও জাহাজে যাই।"

ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। বললাম, "তোমার কী হলো? তুমি অত্যাচারিত হলে কোথায় যে, এভাবে চলে যাচ্ছ?

ম্লান হেসে ডি. কে. বললে, "বোঝানো শক্ত। তবুও বোঝাতে হবে। ওখানে থাকতে থাকতে আমিও বুঝি দ্বীপান্তরের মানুষ হয়ে গেছি। এগারো বছর পরে কলকাতায় ফিরে এসে দেখছি, আমার বিয়ের সত্যিকার লগ্ন আসেনি, যে-পাওয়া মানুষের কাছে পরম পাওয়া, সে পাওয়ার স্বর্ণ মুহূর্ত আজও আসেনি আমার জীবনে। এখানে এসে কী দেখলাম জানেন? মারোর অনুমান মিথ্যা! মানুষ আজও সভ্য হয়নি। তার সমস্ত আদিম বৃত্তিগুলিই রয়ে গেছে। এত শিক্ষা, এত সামাজিকতার মধ্য দিয়েও তা ঢাকা পড়েনি। পাগল মারোর সেই প্রেয়সী যখন বুড়ো হবে, তখন আবারও যাবে আরেক নতুন দল নগ্নদ্বীপে, নিজেদের আদিম প্রবৃত্তিগুলি আমূল উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে আসতে!

চলে গেছে ডি. কে.। কিন্তু তার কথাগুলি নয়, তার অদ্ভুত চরিত্রটিই আমাকে দোলা দিয়ে গেছে সব থেকে বেশি। সে আর তার পাগল 'মারো', একই ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ এক হয়ে গেছে আজ, কোথাও কোনও প্রভেদ খুঁজে পাচ্ছি না।

খুঁজে-ফেরা আলো

রাত্রের অন্ধকারে সমুদ্র আর আকাশ যখন একাকার হয়ে যেত, সেই সময় বাতিঘরের খুঁজে-ফেরা আলো দেখতে দেখতে মনে হতো, ঐ যে আলোর রশ্মি সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে পড়ছে, ঘুরছে, আর সরে যাচ্ছে, ও শুধুই আলো নয়, যেন কার নিঃসঙ্গ মন, আর-এক মনকে অন্বেষণ করছে।

কী জানি কেন, আন্দামানের রস্‌দ্বীপে যে নিঃশব্দ বাতিঘরটি দেখেছিলাম, অন্ধকার রাত্রে তার সেই সেদিনকার খুঁজে-ফেরা আলোর কথাই নতুন করে মনে পড়ছে আজ। কলকাতা থেকে রওনা হয়ে 'মহারাজা' জাহাজ ক্ষুদ্র রস্‌দ্বীপের ধার দিয়ে 'চাথাম' জেটিতে গিয়ে ভিড়েছিল। 'চাথাম'ও বলতে গেলে ক্ষুদ্র এক দ্বীপ, পোর্ট ব্লেয়ারের সঙ্গে একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত।

সে আমার লেখক-জীবনের প্রথম অধ্যায়,—এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে আন্দামান গিয়েছিলাম। কোথায় আকুজীঅ্যাণ্ড সন্স, কোথায় কৃষ্ণস্বামী অ্যাণ্ড সন্স, কোথায় গোবিন্দ রাজুলা অ্যাণ্ড কোং—এই সব ব্যবসায়ীদের সংস্রবে ব্যবসায়িক কথাবার্তায় দিন কাটে, মাঝে মাঝে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা লক্ষ করি। আর অবসরমতো ঘুরে বেড়াই বার্ডস লাইন থেকে টেম্পল্‌ মাউ। কখনও বা রস্‌দ্বীপে। ব্রিটিশ আমলে এটাই ছিল চীফ কমিশনার ও বড় বড় অফিসারদের থাকবার জায়গা। অধুনা পরিত্যক্ত বলা চলে। পাওয়ার হাউসটি আছে শুধু, আর আছে বাতিঘর।

অবশ্য, ঠিক এখন কী অবস্থা হয়েছে জানি না, আমি যখন গিয়েছিলাম তখনকার অবস্থা ছিল এই। বড় ভালো লাগতো নির্জন রস্‌দ্বীপটা। খাওয়া-দাওয়ার পর মধ্যাহ্ন আর অপরাহ্ণ ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় আদিবাসীদের নৌকো চড়ে কতদিন ফিরে এসেছি দ্বীপটি থেকে। যেদিকে তাকাই—সমুদ্র! উধাও সমুদ্রের বুকে কূর্মপৃষ্ঠের মত ভেসে আছে রস্‌দ্বীপ। বাতিঘরের বাঙালী কর্মচারীটির সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে ঘুরতে বেরুতাম এদিক ওদিক। এক কিনারে, বাতিঘরের একেবারে বিপরীত দিকে দু-একটা কুঁড়েঘর ছিল আদিবাসী আরুয়াদের। ওরা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়তো, কখনও বা যেতো পোর্ট ব্লেয়ারের হাটে-বাজারে, কখনও দেখতাম ওদের নৌকাটির পাশে আরও নৌকো এসে ভিড়েছে!

ঘুরে বেড়িয়ে বিকেলের দিকে বসতাম 'বাতিঘরে। ছোট্ট কেবিন—অফিসও বটে, ঘরও বটে। ভদ্রলোক বিকেলের দিকেই আসতেন ডিউটি দিতে। তিনি একে বাঙালী, তার ওপরে আমার স্বজাতি, হৃদ্যতা হয়েছিল সহজেই। কিন্তু যে অদ্ভুত রাত্রিটির কথা আজ আমার মনে পড়ছে, তার আগে পর্যন্ত সত্যিকার পরিচয় আমি পাই নি তাঁর। খাকী রঙের প্যাণ্ট আর শার্ট পরা সেই তো দোহারা চেহারার কালো লোকটি, বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে, কথা অবশ্য বলতেন কম, সাড়া দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখতাম, স্মিত হাস্যে ভরে যেত তাঁর মুখ, বলতেন, বসুন।

ছোট টেবিলের একপাশে কিছু ফাইল আর কাগজপত্র, কার্বনপেপার আর পেনসিল, অন্য পাশে সিগন্যালিংয়ের যন্ত্রটা—বড়ো ক্যামেরার মতো দেখতে, কেবিনের জানালা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে লেন্স-বসানো নল, সেইখান দিয়ে সমুদ্রে জোরালো আলো ফেলে অপেক্ষমান অথবা চলমান জাহাজের আলোক-প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। আলোকরশ্মি ফেলে আর নিভিয়ে নির্বাক প্রশ্ন-বিনিময়। হয়তো গিয়ে বসেছি, ভদ্রলোক দু-একটা কথা বলার পরই তাঁর যন্ত্রটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ আলো জ্বালা আর নিবানো চললো। যন্ত্র ছেড়ে চেয়ারে ভালো করে বসতেই জিজ্ঞাসা করতাম, কে?

বলতেন, মাদ্রাজ থেকে এসেছে। "মারিয়া-এল্"। ভাড়া করা গ্রীক জাহাজ। মালবাহী। বলছে—পোর্টে ভিড়বো। পাইলট চাই। এজেণ্ট—আকুজী।

বলেই ফোনটা তুলে নিতেন, হ্যালো!

পোর্ট-অফিস আর এজেণ্ট-অফিসে দিতেন সংবাদ। কিছুক্ষণের ব্যস্ততা, আবার সব চুপচাপ। ফাইলের কাগজে কী সব লিখতেন, প্যাডের কাগজের নীচে কার্বন বসিয়ে পেনসিলে লিখতেন বোধ হয় জাহাজের নাম আর পরিচয়, তারপরে হাফ-প্যাণ্ট-পরা ঘোর কালো বর্ণের আন্দামানী আদিবাসী বেয়ারাটার হাতে চিঠি দিয়ে তাকে পাঠাতেন এবার্ডিনের পোর্ট-অফিসে।

বলতাম, আচ্ছা, আপনি সব সময়ে এই দ্বীপে থাকেন, এবার্ডিনে যান না কখনও?

একটু হেসে বলতেন, যাই বইকি। মাইনের দিনে। আর কখনও-সখনও অফিসে ডেকে পাঠালে।

বলতাম, না না, তা বলছি না। কত বাঙালী রয়েছেন এবার্ডিনে, বিঘীলাইনে সরকারী প্রেসের ওপরেই তো তো রয়েছে বাঙালীদের ক্লাব, কখনও তো আপনাকে দেখি না ওখানে!

না! আমি কোথাও যাই না। বেশ আছি দ্বীপে।

একা একা ভালো লাগে আপনার?

একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, একা! একা কোথায়! আমি আর আমার স্ত্রী থাকি, আর আছে ঐ বেয়ারাটা!

এবার অবাক হবার পালা আমার, বললাম, আপনার স্ত্রী? কখনও তো দেখি নি তাঁকে! এই তো এতদিন এলাম, কখনও তো বলেন নি তাঁর কথা, কখনও তো আলাপ করিয়ে দেন নি তাঁর সঙ্গে।

বললেন, তার সঙ্গে আলাপ করা কঠিন নয়। আমার কোয়াটারে গেলেই সেটা হতে পারে। অবশ্য আমিই আপনাকে কোনদিন নিয়ে যাই নি আমার কোয়াটারে। ইচ্ছে করে নিয়েই যাই নি। আপনার ভালো লাগতো না। কারুরই লাগে না। কেউ আসে না আমার বাড়ি।

কেন?

বললেন, সে অনেক কথা। এবার্ডিনের যে-কোনো লোক জানে, এবং বোধ হয় আমার থেকেও বেশি জানে।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।

একটু ম্লান হেসে বললেন, রটনা-ব্যাপারটাই এমন যে যাকে নিয়ে রটনা, তার থেকে লোকে ঘটনাটা—অনেক বেশি জেনে ফেলে। আমাকে নিয়েও অমনি রটনা আছে, আপনি তা এখনও শোনেন নি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আপনি আসেন-যান, আমি ভাবতাম, রটনা শোনার পরেই আপনার কৌতূহল জন্মেছে আমার সম্বন্ধে। চিড়িয়াখানার জন্তু দেখবার মতই বাতিঘরের এই অদ্ভুত লোকটাকে আপনি এসে দেখে যান মাঝে মাঝে।

—ছি-ছি! অমন কথা বলবেন না। আমি কিছুই জানি না। কিন্তু এবার কৌতূহল হচ্ছে। আপনার স্ত্রী…

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—আমার স্ত্রী আদৌ অসূর্যম্পশ্যা নয়, তাকে এবার্ডিনে হয়তো আপনি দেখেছেনও। প্রায়ই তাকে যেতে হয়। হাট-বাজার তো সে-ই করে। আজও সে গেছে, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল, এখনও এলো না তো!

বলেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন সমুদ্রের দিকে মুখ করে। ডেকে বললেন, মিস্টার ব্যানার্জি!

—আজ্ঞে?

মুখ ফিরিয়ে বললেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আপনি এইবার আদিবাসীদের ডোঙায় করে ফিরবেন তো? পারবেন না। এখন ডোঙা খুলবে না ওরা।

—কেন ?

—'টারাই' উঠেছে।

—মানে !

—ঝড়ের অপদেবতা হচ্ছে দুজন! বিলিকু আর টারাই। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর ঝড় হচ্ছে বিলিকু, আর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঝড় হচ্ছে টারাই। দেখুন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে—ঢেউগুলি যেন ক্ষ্যাপার মতো কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অফিসের নির্দেশে রেড সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছি। রীতিমত সাইক্লোন হবে মনে হচ্ছে। আপনার আজ আর ফিরে যাওয়া হলো না।

বললাম, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনার স্ত্রীর কথা ভাবছি।

বলে উঠলেন, বেয়ারাটা সঙ্গে আছে আজ। কিন্তু তার নিষেধ তো সে শুনবে না! নিজেই ডোঙা চালিয়ে চলে আসবে।

—বলেন কী, এই ঝড়ের মধ্যে !

—সেই তো ভয় মিস্টার ব্যানার্জি, যদিও সামান্য পথ, কিন্তু তবু তো সমুদ্র, যদি ডিঙি ভাসিয়ে নিয়ে যায় গভীর সমুদ্রে! যদি উলটে যায়! যে কাঠ দিয়ে ওদের ডিঙি তৈরি, তা অবশ্য ডুববে না, কিন্তু…! ও-যে টারাই-ফারাই কিছু মানবে না। দাঁড়ান, দেখি। এ ছাড়া আমি আর কী করতে পারি, বলুন তো ?

খুঁজে-ফেরা-আলোর আবর্তনের দিকে ওঁর সঙ্গে আমিও তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ব্যাদিত দন্তপংক্তির মতো মনে হতে লাগলো ভেঙে-পড়া উত্তাল ঢেউয়ের সাদা-সাদা ফেনাগুলিকে !

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর উনি এসে বসে পড়লেন চেয়ারে, দুহাতে মুখ লুকিয়ে। না, খুঁজে খুঁজে কোনও নৌকোই দেখা যায় নি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবিনের ইলেকট্রিক বাল্‌বটা দিয়ে কেমন যেন লালচে একটা আলো আসছে। আর বাইরে, বাতিঘরের পায়ের কাছে পাথরের স্তূপের ওপর মহাসমারোহে এসে ভেঙে পড়ছে ঢেউ !

জীবনে কত ঘটনাই তো ঘটেছে, কত দেশই তো দেখলুম, কত লোকের সঙ্গেই না হলো পরিচয়। কলকাতার বাসায় বসে আজকের রাত্রিটিকে অনুভব করতে করতে আন্দামানের সেই ঝড়ের রাত্রিটির কথাই মনে পড়ে গেল। বাতিঘরের সেই বাঙালী ভদ্রলোকটির নাম আমি প্রকাশ করতে পারবো না, এ গল্পের জন্য তাঁর নাম বরং দেওয়া যাক—সুমিত মুখার্জি! 'মুখার্জি' তিনি সত্যিই, কিন্তু 'সুমিত' তিনি নন, আমি তাকে 'সুমিত' করে নিলাম।

মানুষের সামাজিক জীবনের মধ্যে যিনি গল্প খুঁজে বেড়ান, সেই লেখক

হচ্ছেন জীবন-লীলার ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি। যাঁদের নিয়ে গল্প লিখবো সেই নায়ক-নায়িকার জীবনে লেখক তো তৃতীয় ব্যক্তিই। নিজেকে কাহিনীর সঙ্গে না জড়িয়ে কাহিনীকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে গল্প-লেখকের সার্থকতা, মনীষীরা বলে থাকেন। লেখক করবেন 'নায়ক' সৃষ্টি, নিজে নায়ক' হবেন না—এ কথাও কেউ কেউ বলেন। কিন্তু আজ ঘটনা-চক্রে আমি নিজে এক চমকপ্রদ ঘটনার 'নায়ক' হয়ে বসেছি! এক অত্যাশ্চর্য চরিত্রের নায়িকা আজ আমার চারদিকে রচনা করে চলেছে এক অপরূপ বঞ্চনার উর্ণনাভ,—আমি সম্মোহিতের মতো বসে বসে শুধু তাই প্রত্যক্ষ করে চলেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি, একে ছিন্ন করা একমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যখন আসবে আমার জীবনে অন্ত এক নারী তার সত্যিকার ভালবাসা আর স্নেহ নিয়ে! কিন্তু সে কি সম্ভব? অস্থির চিত্তে বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করতে করতে এই প্রশ্নই নিজেকে করেছি, সে কি সম্ভব? কখনো কারুর জীবনে কি এমন ঘটনা ঘটেছে? এই অন্বেষণের ঘটনা?

নিজের কথা ভাবতে ভাবতেই সেই ঝড়ের রাত্রিটার কথা মনে পড়লো, মনে পড়লো সেই ঝড়ের দেবতা 'টারাই'-য়ের অতর্কিত আবির্ভাবের কথা, বাতিঘরের সেই খুঁজে-ফেরা আলোর কথা, মুখার্জির সেই দুহাতে মুখ লুকিয়ে অবসন্নের মতো চেয়ারে বসে পড়ার কথা। নিজের কাহিনী লিখতে গিয়ে কেন যে সুমিতের কাহিনী লিখতে বসলাম, তার কারণ বিশ্লেষণ করবেন মনস্তাত্ত্বিক। আমার মনে হয় আমার জীবনে এই সাম্প্রতিক ঘটনার মধ্যে আমি সুমিতর জীবনের ঘটনারই অনুরণন শুনতে পেয়েছি। সুমিতর জীবন-কাহিনীর মধ্যে যে বেদনার সুর আছে, তার সঙ্গে কোথায় আছে আমারও জীবন-বেদনার কোন গভীরতম মিল, নইলে অন্তত আমার আজকের মানসিকতার মধ্যে তার কথা এমন করে হঠাৎ মনে পড়তো না।

সুমিত এক সময় মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো, উঠে দাঁড়ালো, সরে গেল জানলার কাছে, দেখলো সমুদ্রে ঝড়ের সেই মত্ততা, আবার ফিরে এলো চেয়ারে, আমাকে লক্ষ করে বলতে লাগলো, তখন ব্রিটিশ আমল। নতুন এসেছি এখানে চাকরি নিয়ে। রসদ্বীপ তখন সাহেবদের পল্লী। ইউরোপীয়-দের সঙ্গে একজন বাঙালী সাহেবও আছেন। কিন্তু বাঙালী হলেও তিনি সাহেব, আমার সঙ্গে কোনও সংযোগই নেই তাঁর। সাহেবদের আছে ক্লাব, টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল ইত্যাদি! সব এই রসদ্বীপে।

ঘুরে ঘুরে সব দেখি, আর সময় পেলেই এবার্ডিনে যাই। প্রথম প্রথম সবই ভালো লাগতো, কিন্তু যা হয়, ক্রমে ক্রমে সব-কিছু একঘেয়ে হয়ে গেল।

তখন এই বাতিঘরের পাশেই কাঠের চালা ছিল, তার একটিতে থাকতাম। শুয়ে-বসে বই পড়ে কাটানো আর ডিউটিতে এসে আলো ফেলা—এই ভাবে দিন কাটছে।

কিন্তু তারপরে অবশ্য আস্তে আস্তে মন বসতে লাগলো জায়গাটায়। এবার্ডিনে গিয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাউন্ট হ্যারিয়টে ওঠা বা হৈ-চৈ করার থেকে এই দ্বীপে সমুদ্রের ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা যেন অনেক ভালো মনে হতো। বসে বসে সমুদ্রের রঙ দেখতাম। দেখতে দেখতে মনে হতো, সারাটা ছুটির দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা, এইভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মানুষ অনায়াসে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। দিগন্তে শ্রেণীবদ্ধ মেঘ উড়ে যায়, উড়তে উড়তে ওরা যে কতো আকার ধারণ করে। কখনও মনে হতো বিরাট এক রাজপুরী দেখতে পাচ্ছি, কখনও মনে হতো অতিকায় এক রথকে টেনে নিয়ে ছুটে চলেছে সপ্ত অশ্ব। আর তারই নিচে কখনও কখনও ছোট ছোট ঢেউয়ে উদ্বেল হয়েছে সমুদ্র, কখনও বা ভাঙা ঢেউ নেই, নিস্তরঙ্গ নিথর মনে হচ্ছে সমুদ্রকে।

এক মর্নিং ডিউটিতে গিয়ে মেয়েটিকে আমি প্রথম দেখি। কেবিনে ঢুকে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছি. হঠাৎ লক্ষ পড়লো, সমুদ্রের ঢেউ এসে যেখানে পড়ছে, সেই প্রস্তরস্তূপের উপরে বসে আছে সাদা-শাড়ীপড়া তরুণী একটি মেয়ে, শাড়ী পরার ধরন দেখে বাঙালীই মনে হয়। চুপচাপ বসে আছে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে, ভোরের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে, ঝিরঝিরে ভোরের বাতাসে উড়ছে ওর খোলা চুল।

কিন্তু যেভাবে বসেছে, যদি ঢেউয়ের ধাক্কায় পাথর আলগা হয়ে পড়ে যায়? কেবিন থেকে বেরিয়ে ঘুরে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, শুনছেন?

একটু চমকেই আমার দিকে মুখ ফেরালো। বললাম, ওভাবে ওখানে বসে থাকবেন না, পড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেণ্ট হতে পারে।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। হয়ত বা একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো, তারপরে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল কোয়াটারগুলোর দিকে। যেটুকু দেখেছিলাম, তাতে এটুকু সেদিনই বুঝেছিলাম, মেয়েটি বাঙালী এবং বিবাহিতা, সিঁদুর ছিল তার সিঁথিতে।

পরের দিনও সকালে গিয়ে দেখি, মেয়েটি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছে। তবে পাথরের ওপর গিয়ে বসে নি,—প্রস্তরস্তূপের পাশে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি খোলা ওর চুল, তেমনি ভোরের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। কয়েক মুহূর্ত বোধ হয় তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলুম।

মেয়েটি হঠাৎ মুখ ফেরালো। মৃদু হাসির একটা রেখা যেন ফুটে উঠলো ওর মুখে। আমি চট করে মুখ নামিয়ে কেবিনের ভিতরে চলে গেলাম!

পরের দিন মেয়েটি কিন্তু কথা বললো। আমাকে কেবিনের দিকে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, শুনুন?

থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাতেই কয়েক পা এগিয়ে এলো, বললে, আপনার বাতিঘরটা একটু দেখতে দেবেন?

একটু ইতস্তত করে অবশেষে বললাম, বেশ তো, আসুন না।

ঘুরে ঘুরে সব দেখলো। নিচের সিগন্যালিং মেশিন থেকে শুরু করে ওপরের বড়ো আলো, রিফ্লেক্টর, সবই দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখবার পর আমার কেবিনে নেমে এসে বললে, আপনিই তো মিঃ মুখার্জি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম মুখার্জিই বটে। আপনি কেমন করে জানলেন?

একটু হেসে বললে, আমার স্বামী বলেছেন। এই দ্বীপে বাঙালী মাত্র তো আমরা তিনজন, আমার স্বামী, আমি আর আপনি।

বললাম, তা হবে। কিন্তু আপনার স্বামী আমাকে চেনেন?

আবার একটু হাসলো, বললে, তা চেনেন বইকি। একা একা ঘুরে বেড়ান, কোথাও যান না,—কেমন এক ধরনের চুপচাপ লোক। মিস্টার সিনা, অর্থাৎ আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কে ওই ভদ্রলোক, জানো? আপনি তখন আমাদের কোয়াটারের রাস্তা দিয়ে আদিবাসীদের পাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন, জানলা দিয়ে আপনার দিকে একবার তাকালো মিঃ সিনা, বললে—ও তো বাঙালী, আমাদের বাতিঘরের ছোকরা। মুখার্জি।

বললাম, তাই বলুন, আপনি মিসেস্ সিনা, আমাদের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার সিনার স্ত্রী। তা বাতিঘর দেখতে আপনার আবার অনুমতি কী? মিস্টার সিনার হুকুম পাওয়া মাত্রই—

বাধা দিয়ে বললে, থাক্। উনি আছেন ওঁর মতো, আমি আছি আমার মতো। আচ্ছা, আজ চলি।

বলেই আর দাড়ালো না, দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

পরের দিন যথারীতি গিয়ে চেয়ারে বসেছি, পিছন থেকে শুনতে পেলাম মৃদুকণ্ঠস্বর—আসতে পারি?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আরে আসুন।

এসে, আমার অনুরোধ মত বসলো সামনের চেয়ারে, বললে, রোজ সকালে বেড়াতে আসি তো, বেড়িয়ে ফিরছিলাম, হঠাৎ মনে হলো, আপনার সঙ্গে একটু গল্প করে গেলে কেমন হয়?

বেশ তো ?

মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে, বললে, আচ্ছা, এই যে দ্বীপে পড়ে আছেন, দেশের জন্য মন কেমন করে না ?

বলে ফেললাম, আপনার করে না ?

এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলে উঠলো, করে না আবার! আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি।

বললাম, সে কী! এখানে অফিসারদের জন্য কতো রকম রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা···

ছাই ব্যবস্থা। ওসব ক্লাব-টাব নাচ-টাচ আমার মোটেই ভালো লাগে না।

অদ্ভুত একটা বেদনার ছায়া দেখতে পেলাম আয়ত চক্ষুর তটরেখায়।

বললাম, খুব ভোরে তো ওঠেন দেখছি।

হ্যা। সূর্যোদয় দেখি। ঐ আমার রিক্রিয়েশন। কিন্তু আপনাকে যে প্রশ্ন করলাম, তার উত্তর কই ?

বললাম, মন কেমন করবার মতো মানুষ দেশে আমার কেউ নেই। মা-বাপ মারা গেছে বহুদিন, দাদারা পর হয়ে গেছে, বলতে পারেন।

চোখের ঘন কালো তারা দুটি যেন ঈষৎ কৌতুকে ঝলমল করে উঠলো, বললে, তবু ?

হেসে ফেললাম : না। আমি একা। আর সত্যি কথা যদি শুনতে চান তো বলতে পারি, জায়গাটায় আমার মন বসে গেছে। সমুদ্র দেখে দেখে দিন বেশ কেটে যায়।

কেমন-যেন বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, বললে, আচ্ছা, সেদিন দুপুরে দেখাছলাম, আপানি ঐ আদিবাসীদের নৌকোয় করে সমুদ্রে বেড়াতে গেলেন, ভয় করলো না ?

এবার অবাক হলাম আমি, বললাম, : বা রে, আমি কা করি আর না করি, আপনি লক্ষ করেন নাকি ?

একটু যেন আরক্তিম হয়ে উঠলো মুখখানা, মুখ নিচু করে টেবিলের ওপরে হাতের আঙুলগুলি আপন মনে বুলোতে লাগলো কিছুক্ষণ। বললাম, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কথা তো জানি। ভীষণ কাজের লোক! আপনার সময়ই বা কাটে কী করে ? কাহাতক প্রতিবেশী মেমদের সঙ্গে ইংরেজী বলে সময় কাটানো যায়, তাই নিজেদের ভাষায় আলাপ করার জন্য সঙ্গী খোঁজেন, তাই না ? তা সঙ্গীটি বেছেছেন ভালো, একেবারে কাঠখোট্টা লোক।

অদ্ভুত কৌতুকে ঝিলমিল করছে দুটি চোখ, বললে, মোটেই না। দিব্যি কথা কইতে জানেন দেখছি। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে।

হেসে বললাম, মনে কিছু করবেন না। দ্বীপের লোক, মিশি আরুয়াদের সঙ্গে, সভ্যতা-ভব্যতা অত বুঝি না। কী বলতে কী বলে ফেলি।

উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে, বললে, কন্‌ফেশনে খুশি হলাম, কিন্তু আরও খুশি হবো, আজ বিকেলে আমার বাংলোয় এসে চা খেলে।

ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, হাত জোড় করে বললাম, ঐটি পারবো না। বরং আপনি যদি আমার চালায় এসে…

আবার কৌতুকে ঝলমল করে উঠলো দুটি চোখ, বললে, সত্যিই সমাজ-ছাড়া লোক আপনি; তা কী হয় নাকি? তা ছাড়া, আপনার সেই আরুয়া ঝি-টি তো আমাকে দেখলে দুই চোখ দিয়ে গিলেই ফেলবে!

একটু অবাক হয়েই বললাম, সত্যি, আমার একটি আরুয়া ঝি আছে, রান্না-বান্না আর ঘরের কাজকর্ম করে দিয়ে যায়! কিন্তু আপনি জানতে পারলেন কী করে?

বললে, কাল দুপুরে আপনার বাসা দেখতে আসছিলাম। দেখি বারান্দায় মেয়েটি বসে কী কাজ করছে। পরনে জংলীদের মতো বাকল, তবে আর সব জংলী মেয়েদের মতো নয়, বুকে কাপড় আছে, আর চুলও ছোট করে ছাঁটা নয়, বড় চুল,—মাথা ছাপিয়ে কাঁধ পর্যন্ত এসেছে।

বললাম, আমার আগে ও-কোয়ার্টারে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে ছিল, মেয়েটি তার বাসায় কাজ করতো, দুটো-একটা ইংরেজী কথাও জানে।

বাধা দিয়ে বলে উঠলো, বাংলাও জানে। আমাকে দেখে কটমট করে তাকালো, বললে, কেন? হাসবেন না, 'কে'-কে 'কেন' বলেছে, কিন্তু বলেছে তো! কী নাম ঐ মেয়েটির?

বললাম, সারা। দু-তিন বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে! কিন্তু আপনি কাল এসেছিলেন? কী সৌভাগ্য! আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মেয়েটি ইঙ্গিতে তাই বুঝিয়েছিল বটে! কী আর করবো, ফিরে এলাম।

দয়া করে আজ আসুন না।

—না।

বলেই আর দাঁড়ালো না, সোজা চলে গেল নিজের বাড়ির দিকে।

বেশ ছিলাম, একা-একা, আমি, সমুদ্র আর এই বাতিঘর। কিন্তু হঠাৎ কে যেন এসে আমার সমস্ত ভিত্তিমূল ধরে প্রবল নাড়া দিলো। যেন হঠাৎ একটা

উচ্ছৃঙ্খল হাওয়া এসে আমার সমস্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। মর্নিং ডিউটি থাকলে ও আসে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকেলের ডিউটিতে আসে সূর্যাস্তের গোধূলি-লগ্নে। কিন্তু মাত্র এই বাতিঘর, কখনও আসে না আমার বাসায়। বলতাম, আমার বাসায় আসো না কেন? গল্প করার কতো সুবিধে!

রহস্যময় অদ্ভুত এক ধরনে হাসতো ঠোঁট টিপে, বলতো, ভয় করে।

কেন?

বলতো, তুমি আমার বাংলোয় আসো না কেন?

বলতাম, আমি যাই না মিস্টার সিনা কী ভাববেন বলে।

হঠাৎ বলে উঠতো, মিস্টার সিনা সম্বন্ধে কতটুকু জানো তুমি?

কতটুকু! কিছুই না।

তবে!—তিরস্কারের সুরে বলতো, চুপ করে থাকো।

বলেই আবার হেসে ফেলতো, বলতো, এই, জানো?

কী?

সেদিন যে চিঠিটা দিয়েছিলে, সেটা ওর হাতে পড়ে গেছে

চমকে উঠে বললাম, তারপর?

পড়ে বললে, গুড। লভ্-লেটার-লেখায় ছোকরার হাত আছে।

বললাম, বাস্?

হ্যাঁ, বাস। এসব ব্যাপারে ওর কোন চেতনাই নেই। অফিসের পর ওর ক্লাব আর ড্রিঙ্ক,—বাড়ি এসেও তার জের। এই তো ওর জীবন।

একটু থেমে তারপরে বললাম, ব্যাপারটা ভালো হলো না। চিঠি লেখালেখি শুরু করলে তুমিই প্রথম।

বেশ করেছি।

বললাম, আচ্ছা মিস্টার সিনা খুব ড্রিঙ্ক করেন, না?

ভীষণ।

তুমি আপত্তি করো না?

না।

কেন?

অদ্ভুতভাবে হাসলো, বললে, করে লাভ নেই!

তারপরেই আমার হাতে নিজের হাতটি সঁপে দিয়ে বলে উঠলো, তুমি কোনদিন মদ খেয়েছ?

বললাম, না, ওসব আমার ঘৃণার বস্তু।

তা তো দেখতেই পাই। সিগারেটটিও খাও না, লক্ষ্মী ছেলে।

শুধু বাতিঘর নয়, সকালে কিংবা বিকেলে সময় ও সুযোগ বুঝে আমরা সমুদ্রের ধারটিতে গিয়ে বসতাম, প্রস্তরস্তূপের আড়ালে অথবা নারকেলবীথির ছায়ায়। কখনও-সখনও আমার কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতো। কখনও বা আমার কোলে। একদিন বললে, এই, তোমার একটা নামকরণ করেছি! ছোট্ট নাম।

একটু হেসে বললাম, কী, শুনি?

বললে, মিতা।

বেশ।

বললে, মিতা আজ একটা ব্যাপার হয়েছে। তোমার সেই আকুয়া ঝি-টি আমার বাসায় এসেছিল!

সে কী। কেন?

কে জানে! হয়তো কাজ খুঁজছে। আমার বেয়ারার মুখে শুনলাম। সে ওকে ভিতরে ঢুকতে দেয় নি, তাড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম, বেশ করেছে। মেয়েটাকে আমিও তাড়াবো।

হেসে বললে, ওমা, কেন?

বললাম, শুনবে? সেদিন দেখি, আমার সাবানটা নিয়ে বাথরুমে গিয়ে চান করছে।

খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললে, বেশ করেছে।

কিছুদিন পরে এমন হলো, ওর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে, ওকে না দেখতে পেলে থাকতে পারতাম না, হাঁপিয়ে উঠতাম। নারিকেল-বীথির ছায়ায় আমার কোলে মাথা রেখে সমুদ্রের বুকে সন্ধ্যা নামছে দেখতে দেখতে একদিন বললে, তোমার সেই নামটা আরও ছোট করে নিয়েছি।

কী?

মিতু।

বললাম, বেশ তো ছিলাম একা-একা, এমন পাগল করে দিলে কেন?

ঠোঁট টিপে একটু হাসলো, বললে, করেছি নাকি?

ওর হাসি-হাসি-ভরা মুখখানার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকতাম। একসময় বলতো, এমন করে তুমি কী দেখ, বল তো!

কী দেখি কে জানে! অদ্ভুত ভালো লাগে! সুন্দর লাগে।

খিল খিল করে হেসে উঠতো, বলতো, সুন্দর, না ছাই!

বলতাম, নিজের মুখ কখনও আয়নায় দেখেছ?

মুখখানা হঠাৎ ম্লান হয়ে উঠতো। ধীরে ধীরে উঠে বসতো, কোন কোনদিন ওর চোখে দেখতাম জল, তাড়াতাড়ি বলে উঠতাম, এ কী কাঁদছ তুমি ?

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে বলতো, না।

তারপর উঠে দাঁড়াতো, বলতো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ! এবার ফিরতে হবে!

জিজ্ঞাসা করতাম, একটা কথা বলবে ?

কী ?

—সন্ধ্যার পর কোনওদিন আমার কাছে থাকতে চাও না, কেন বল তো ?

কেমন যেন উত্তেজিত মনে হতো ওর কণ্ঠস্বর, বলতো—থাকবার উপায় নেই। ক্লাব থেকে আসবে যে মিস্টার সিনা। এসে না দেখলে আর রক্ষে নেই।

একটু থেমে তারপর বলতাম, অদ্ভুত, না ?

বাঁকা হেসে বলতো, কিন্তু তবুও কিছু জানো না। তুমি যতটা অদ্ভুত ভাবো, তার থেকেও অদ্ভুত ও।

আমাকে জিজ্ঞাসু-চোখে তাকাতে দেখে বলে উঠতো, চিঠি লিখি আর যাই করি সারাদিন ধরে, কিছু বলবে না, কিন্তু রাত্রে কাছে থাকা চাই।

একটু হেসে বলতাম, খুব ভালবাসে, না ?

কী বললে ?—যেন চোখ দুটো জ্বলে উঠলো মুহূর্তে, বললে, ভালবাসা! আমাকে এত ঘেন্না করে যে তুমি জানো না।

ঘৃণা!

হ্যাঁ, আমিও ঘেন্না করি। ওকে কিছুতেই সইতে পারি না।

অবাক হয়ে বলতাম,—সুখী নও ?

চোখ ভরে উঠতো জলে, মুহূর্তে আমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো, আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতো। কান্নার আবেগ একটু কমলে ডাকতাম ওর নাম ধরে, বলতাম, লতা!

মুখ তুলে বলতো, কী ?

আমাকেই শেষ পর্যন্ত ভালবাসলে ? কী আছে আমার ?

কে জানে! আমি তোমাকে পাগল করি নি, তুমি আমাকে পাগল করেছ গো।

বলেই হঠাৎ দুই বাহুলতা আমার গলায় জড়িয়ে আমার বুকে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকতো। আর আপনার কাছে বলতে বাধা নেই, আমি ওকে পাগলের মত চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলতাম। সে বেপথুমানা

চাঁদতা দেহলতার মাধুর্য বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। যেন মনে হতো প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে শুকিয়ে অবশেষে তরুলতা পেয়েছে স্নেহসিঞ্চিত বর্ষার ঝরঝর বারিধারার অন্তরঙ্গ আশ্লেষ! আমার আদর ও যে প্রাণ ভরে উপভোগ করতো সন্দেহ নেই, কিন্তু পর-মুহূর্তেই কী যে হতো, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একেবারে ছুটে চলে যেতো বাংলোর দিকে।

তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। চুপচাপ সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঢেউ-ভাঙার আর্তনাদ শুনলাম, তারপর ধীর পায়ে চলে এলাম বাসায়। সাজানো কাঠের গুঁড়ির উপরে তৈরি কাঠের ঘর, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই চোখে পড়ল, বারান্দার অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সারা। ওদের ভাষা কিছু কিছু বলতে পারতাম, জিজ্ঞাসা করলাম, কী করছিস্? বাড়ি যাস নি যে?

উত্তর দিল বাংলায়, বললে, না।

এই মেয়েটাও একটু অদ্ভুত ধরনের। সকালে অথবা দুপুরে ঘরের কাজ যখন ও করতে আসতো, কাজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করতো, তোমাদের ভাষায় এটাকে কী বলে? এই ভাবে দুটো একটা করে বাংলা শব্দ শিখে রাখতো। মনে রাখবার ক্ষমতা দেখতাম ওর অসাধারণ। একবার যা শিখতো, তা ভুলতো না।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, রান্না হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কী কী রান্না করলি?

—ভাত, ডাল, মাছ।

আমি বসে বসে ওকে আমাদের রান্না শিখিয়েছিলাম, এখনও ভাল রপ্ত করতে পারে নি, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করতো নতুন কিছু শিখে নিতে। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করতাম, ও রান্না নিজে কখনও খেতো না, দিলেও না! মাছ দিলে, কাঁচা অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যেতো!

কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর বললাম, বাড়ি যা এবার! কিন্তু গেল না, বারান্দায় যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভিতরে গিয়ে খাবার-টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে এসেছি, তখনও দেখছি যায় নি, ঠায় সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে! ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, এ কী, কাঁদছিস কেন?

কোন উত্তর নেই! কেমন একটা মায়া হলো। ওর বরের নাম ছিল টেবু। বললাম, কী রে, টেবু বকেছে?

মুখ তুলে তাকালো, বললে, টেবুর সঙ্গে বিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি অনেকদিন।

সে কী! কেন রে?

কোন উত্তর দিলো না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

একটু বিব্রত বোধ করেই বললাম, কী হয়েছে রে?

কিছু না।

কী মুশকিল! এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদবি নাকি, আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বো না?

একবার মুখ তুলে তাকালো, বললে, যা—তুই শুতে। আমি এখানে একটু বসে থাকবো।

ধমকে উঠলাম রীতিমত, বললাম, না! বাড়ি যা শীগ্‌গির!

দুটি সরল আর অবুঝ আঁখিতারায় লাগলো বিস্ময়ের ঘোর, বলে উঠলো: তুইও টেবুর মত বকবি বাবু!

কেন জানি না, হঠাৎ একটা দুঃসহ ক্রোধে জ্বলে উঠলাম মুহূর্তে, বললাম, কী চাস তুই এখানে? ভাবছিস আমি কিছু বুঝি না, না! বদমাইস মেয়েমানুষ কোথাকার! বেরিয়ে যা তুই এখুনি?

সেলুলার জেলে অপরাধীকে হাত পা বেঁধে চাবুক মারার সময় প্রথম চাবুকের তীব্র আঘাতে মানুষের মুখে যে দুঃসহ বেদনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখেছি,—মনে হলো সারার মুখেও ফুটে উঠেছে সেই প্রচণ্ড ব্যথা। কিছুক্ষণ পাথরের মতো নিস্পন্দ থাকার পর বললে, যাচ্ছি, বাবু।

ধীর-পায়ে দেহটাকে টেনে পাহাড়ের বন্ধুর পথ বেয়ে চলে গেল সারা।

কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তা আর চেতনা জুড়ে বিরাজ করছে অন্য মেয়ে। পরদিন আবার নিভৃত সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে বললাম ওকে সারার সব কথা। শুনে একটু যেন অবাক হলো, বললে, সে কী গো, সত্যি তুমি অমন কড়া কথা বলতে পারলে!

একটু হেসে বললাম, পারলামই তো।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার মুখে হাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠলো, না, আমার মিতুকে আমি চিনি! অতি ভাল মানুষ সে, অতি শান্ত, অতি মধুর। তুমি যে কঠোর হতে পারো, এ আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি নিজেও কম অবাক হই নি! হঠাৎ এ-রকম ক্ষেপে গেলাম কেন?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলো, তারপরে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, বুঝেছি।

কী?

বললে, একদিক থেকে তোমরা পুরুষরা সবাই এক।

কী রকম!

মুখ টিপে একটু হেসে বললে, যখন কাছে পেতে ইচ্ছা করে, তখন যদি না পাও, তখনি ক্ষেপে যাও তোমরা! আমাকে না-পাওয়ার কষ্ট বেদনা যে ও-ভাবে ও-বেচারীর ওপরে প্রচণ্ড ক্রোধ হয়ে হঠাৎ গিয়ে পড়বে, এটা তুমি নিজেও বোধ হয় ভাবতে পারো নি।

মনে মনে চমকে উঠলাম ওর বিশ্লেষণী শক্তি লক্ষ করে, বললাম, কথাটা মিথ্যে বলো নি। কিন্তু এতই যখন বোঝো, তখন আমাকে ক্ষেপিয়ে দাও কেন? কেন ধরা দিলে না?

একটু হেসে দুহাতে আমার কণ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরে বললে, এই তো আমি। আর কী চাও?

মুহূর্তে আদরে আদরে ওকে ভরিয়ে দিয়ে বললাম, পুরুষের প্রেম কি এখানেই সীমারেখা টানতে চায়? তুমিই বলো?

ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে, কিন্তু উপায় যে নেই মিতু।

কেন?

অদ্ভুত উত্তেজিত মনে হলো ওকে, বললে, না না. সে আমি তোমাকে বলতে পারবো না? শুনতে চেও না তুমি।

বলেই নিজেকে সামলে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল সে, স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল মুখ, আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, এই-ই বেশ, নয় কী?

পরের দিন বিকেলে হাসতে হাসতে বললে, এই জানো? একটা মজা হয়েছে।

কী?

—তোমার সেই সারা আমার কাছে গিয়েছিল।

—সারা!

—হ্যাঁ।

সারার কথাটা উঠতেই মনে হলো, এই দু দিন তাকে আমি দেখিই নি! কখন চুপিসারে চোরের মতো এসে নিজের কাজ করে গেছে। বিকেলে বেরিয়ে

আসি, এই সুযোগে ও ওর কাজ করে চলে যায়। আমার ঘরের চাবি দুটো—একটা আমার কাছে, আর-একটা ওর কাছে থাকতো। বহুদিন থেকেই চলে আসছিল এ-ব্যবস্থা। সেদিক থেকে সারাকে অবিশ্বাস করবার কিছু ছিল না। বললাম, তারপর!

বললো, অবাক কাণ্ড! আমার কাছ থেকে পুরনো শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ এক প্রস্থ চেয়ে নিয়ে গেল।

—সে কী!

হেসে বলল, হ্যাঁ গো। কী করে পরতে হয়, তাও শিখে নিয়ে গেছে।

—বলো কী! তুমি দিলে ওকে কাপড়চোপড়?

হেসে বললে, দিলাম। তোমারই তো ঝি, মায়া হয় না?

পরদিন আপিসের পর বাড়িতে বেশিক্ষণ রইলাম সারাকে ধরার জন্য। দেখি ওর কথাই ঠিক। শাড়ী পরে বাঙালী মেয়ে সেজে ধীর পায়ে বাড়ি ঢুকে চুপি চুপি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলো, ধারালো গলায় ডেকে বললাম, এই, শোন্।

একটু চমকে ভীরু দুটি চোখ তুলে একবার আমার দিকে তাকালো, তারপরে আস্তে আস্তে কাছে এলো। ওর এই বিনম্র বিনীত ভঙ্গি আমাকে আরও ক্ষেপিয়ে তুললো, ধমকে বলে উঠলাম, এ সব কী? পরের বাড়ি ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে না? তোর শাড়ী পরার শখ তো আমাকে বললি না কেন?

আবার মুখ তুলে তাকালো, সে যে কী বেদনার অব্যক্ত বাণী ফুটে উঠেছিল, তা বলে বোঝানোর নয়। মুখ নিচু করে বললাম, আচ্ছা, তোর কাজ কর্ গিয়ে, যা!

ভিতরে গেল, আমিও চলে এলাম বাইরে। সমুদ্রের ধারে চুপচাপ বসে ছিল সে। আবার সেই সন্ধ্যা হয়ে আসা। আবার সেই ঘন হয়ে বসে কথার মালা গাঁথা, অবার সেই আদরে পাগল করে দিয়ে রহস্যময়ীর অবশেষে ছুটে চলে যাওয়া।

বাড়ি ফিরছিলাম, আর বুকের ভিতরটা তীব্র বেদনায় টনটন করে উঠছিল। ভাবলাম, এ ফাঁকির খেলা আর না, এ শেষ করতেই হবে। ও যদি ধরা না-ই দেবে তো এ উন্মাদনার সৃষ্টি করে কেন! তবে কি ওর ভালবাসার এ লীলার সবটাই প্রবঞ্চনায় ভরা! ভাবতে ভাবতে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম, যেন মাতালের মত টলছি। কোনরকমে ঘরে ঢুকে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। ওর কথা ভাবতে ভাবতে চোখের কোণ দুটো সজল হয়ে উঠলো। হঠাৎ কপালে কার হাতের পরশ পেতেই চমকে মুখ তুললাম। দেখি, শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে সারা। কিছু না বলে চোখ বুজলাম! আমার

কপালে মাথায় ওর মৃদু করস্পর্শ যেন সান্ত্বনার বাণীর মতোই গুঞ্জন করে ফিরছে, এক সময় শিয়রের কাছে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসলো, তারপর হাত নেমে এলো আমার মুখে গালে ঠোঁটে। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে অবশেষে উঠে বসলাম, আর সেই দুটি তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে আবার গেলাম ক্ষেপে। কী যে হলো আমার কে জানে, প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলাম গালে, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মেঝের ওপরে। আমি তখন রাগে কাঁপছি: বেরিয়ে যা। বদমাইস মেয়েমানুষ কোথাকার!

কিন্তু আমার প্রেয়সীকে নিয়েও তো আমার শান্তি নেই। না-দেখে থাকতে পারি না। যাবো না যাবো না করেও পা চলে যায় সমুদ্রের ধারের সেই নারিকেলবীথির কুঞ্জের দিকে।

আবার সেই একই আচরণের পুনরাবৃত্তি। দেহে-মনে দ্বিগুণ জ্বলে উঠে আবার ফিরে আসা, বিছানায় শুয়ে ছটফট করে সারাটা রাত কাটানো।

পরের দিন বললাম, মিস্টার সিনা আমাদের কথা জানেন। কিন্তু কিছু বলেন না কেন আমাকে? অন্য কেউ হলে তো—

বাধা দিয়ে হেসে উঠলো, বললো, তোমাকে খুব ভালবাসেন। বলেন, দি রাইট ম্যান ইউ হ্যাভ গট। দেখো, তোমার না ইনক্রিমেণ্ট হয়ে যায়!

গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, হেঁয়ালি রাখো। আমাকে সত্যি ঘটনাটা বলতে পারো? এ অসহ্য যন্ত্রণা যে সইতে পারছি না আর।

দুটি চোখ তিরস্কারে নিবিড় হয়ে এলো, বলল, অসহ্য যন্ত্রণা আবার কিসের! কই, মিস্টার সিনাও তো পুরুষমানুষ, তার মুখে তো শুনি না এ ধরনের কথা।

বললাম, শোনবার কথাও তো নয়।

—কেন?

—তুমি তো তাঁর, তবে আর তাঁর ভাবনা কী?

হেসে উঠলো খিল খিল করে, বললো, আমি যে কার, সেইটাই হচ্ছে কথা। শোন, আমি তো দেখতে ভালো নই, কালো। বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু আমাকে তাঁর মনে ধরে নি। তিনি বিলেতফেরত মানুষ, সুন্দরী যেন দেখে দেখেই চোখ অভ্যস্ত! টাকার জন্য বিয়ে করেছেন, বাস্, এই পর্যন্ত। আমার সঙ্গে বয়সেরও অনেক তফাৎ। আমার কাছে যখন আসেন, মনে হয়, আমি এক অতিকায় রোমশ কোন বনমানুষের বাহুবন্ধনে যেন ধরা পড়েছি। আমার সারা দেহমন ঘৃণায় ঘিনঘিন করে উঠতো! উপায়ও তো কিছু নেই, বিয়ে যখন করেছি।

—একটা কথা বলবো ?

—কী ?

—কিছু মনে করবে না ?

—না।

বললাম, ডাইভোর্স করলে কেমন হয় ?

হেসে উঠলো, বললো, করলে মন্দ হয় না, বাতিঘরের এই লোকটিকে বিয়ে করা যায়।

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন মিস্টার মুখার্জি, কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর তাড়াতাড়ি উঠে জানলার কাছে গেলেন। বললেন, ওঃ! প্রচণ্ড ঝড়। ওর নৌকোর কী হলো কে জানে? দেখি জোরালো আলোটা ফেলে।

আবার সেই খুঁজে-ফেরা-আলো ঘুরতে লাগলো সমুদ্রের বুকে, কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এলেন মুখার্জি, বললেন, নাঃ নৌকোর দেখা নেই। কী যে হলো।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল বাইরে একটা ভারী পদশব্দ। আমরা চমকে চাইতেই দেখি, সেই বেয়ারাটা হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকলো, সমস্ত শরীরটা ভিজে সপসপে, নিদারুণ পরিশ্রমে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। আর তার পিছনে পিছনেই এলেন একটি মহিলা। ইনিও পরিশ্রান্ত মনে হল। বৃষ্টিতে ভিজে শাড়ীটা সুঠাম শরীরের সঙ্গে একেবারে মিশে আছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, বললেন, এসেছ! আমি ভেবে ভেবে অস্থির। সরাসরি বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে ভালই করেছ, জানতে পারলাম যে তুমি আসতে পেরেছো। খুব কষ্ট হয়েছে, না? যাও, ঘরে চলে যাও।

মেয়েটি কবাট ধরে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে ছিল, দরজা ছেড়ে চলা শুরু করতেই মুখার্জি বলে উঠলো, ভাল কথা, দাঁড়াও, এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি আমার বন্ধু মিঃ ব্যানার্জি, আর ইনিই হচ্ছেন আপনাদের মিসেস মুখার্জি।

নমস্কার বিনিময়ের পর বেয়ারার সঙ্গে মেয়েটি চলে যেতেই আমি বলে উঠলাম, আপনার কাহিনীর দুটি নায়িকার কাউকেই আমি দেখি নি, কিন্তু তবুও মনে হলো এঁকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু এ কী রকম করে হলো?

চেয়ারে নিজেকে পরিপূর্ণ এলিয়ে দিয়ে মুখার্জি বলতে লাগলেন, খুব অবাক হচ্ছেন, না? ভাবতে গিয়ে আমি নিজেও অবাক হই। কিন্তু ট্রুথ্‌

ইজ্‌ স্টেঞ্জার ছান ফিক্‌শন। আমি ওকে জয় করি নি, প্রকৃতপক্ষে ও-ই আমাকে জয় করেছে। শুনুন তা হলে।

দিনের পর দিন ওইভাবে কাটে, কিন্তু আমার হাহাকার শান্ত হয় না। যে আশ্চর্য রাতটির কথা বলে এ কাহিনীর শেষ করবো, সে এক নিদারুণ দুর্বিষহ রাত আমার পক্ষে। ভাবছিলাম ওদের বারে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কি মদ খাবো—যদি এ জ্বালা একটুও শান্ত হয়? যদি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি? ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এসেছি চিরদিন। মনে মনে বলতে লাগলাম, কেন এ ভালবাসা আমার হৃদয়ে এনে দিলে? কেন আমার মনটাকে পাথর করে দাও নি? কেন এমন কোমল মন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছ তুমি?···আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম সে রাত্রে। হঠাৎ দেখি, কপালে আবার কার স্নিগ্ধ করস্পর্শ। বুঝলাম, কিন্তু বাধা দিলাম না! ধীরে ধীরে শিয়রে বসে আমার মাথাটা কোলে তুলে নিলো। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি, ওরও চোখে জল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ও আমার দিকে তাকালো, কী মমতাময় স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি! আমি চুপ করে নিথর হয়ে তাকিয়ে আছি লক্ষ করে একটু যেন ম্লান হাসলো. তারপরে আমার ডান হাতটা তুলে নিয়ে নিজের গালে ছোঁয়ালো, এবং তারপরেই অবাক কাণ্ড, আমার সেই হাতটি নিয়ে নিজেই নিজের গালে সজোরে বসিয়ে দিলো চড়। কিন্তু ওর দেহটা টলে পড়বার আগেই ওকে আমি দু হাতের নিবিড় বাঁধনে বেঁধে ফেলেছি, ব্যাকুল হয়ে ডেকে উঠেছি, সারা—সারা!

সেই মারাত্মক চিঠিটা আমার বুক থেকে কখন যেন পড়ে গিয়েছিল মেঝের ওপরে। সেটি তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলাম। হ্যাঁ মিস্টার ব্যানার্জি, চিঠি একখানা পেয়েছিলাম এবং সেটাই বোধ হয় ওর অভিজ্ঞান। মিস্টার সিনা হঠাৎ বদলি হয়ে গেলেন, ও-ও চলে গেল হঠাৎ—আমি পেলাম ওর চিঠি। তার সঠিক ভাষা হুবহু আপনাকে আজ বলতে পারবো না, যতটুকু মনে করতে পারি, ততটুকুই বলবো আপনাকে।

'মিতু, তোমাকে আমি একদিন বনমানুষের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? মেয়েরা যে বনমানুষকেও শেষ পর্যন্ত পছন্দ করতে পারে, তার প্রমাণ আমি। আমি ডাইভোর্সই করতাম, কিন্তু ওঁর কাছে আমাকে তিলে তিলে এগিয়ে দিয়েছ তুমি। উনি আমাকে পছন্দ করেন নি, মদ খেয়ে চুর না হয়ে আমাকে ছুঁতে পারতেন না। কিন্তু আমি? আমি কী করবো? আমি তো মদ খেতে পারবো না। সে যে কী অন্তর্দ্বন্দ্বের দিন গেছে তা বর্ণনা করা

যায় না! আকুল হয়ে কেঁদেছি, মন শান্ত হয় নি। দেয়ালে পাগলের মতো মাথা ঠুকেছি, তবু ভিতরের হাহাকার ঘোচে নি। এমন দিনে কী এক বিচিত্র লগ্নে বিচিত্র দ্বীপে তোমার সঙ্গে আলাপ। শেষ পর্যন্ত তুমিই হয়ে পড়লে আমার মদ। তোমার আদরে দেহে যখন আগুন জ্বলত, কামনায় সমস্ত সত্তা যখন অস্থির হয়ে উঠতো, তখন তোমাকে ঠেলে ফেলে ছুটে চলে যেতাম আমার বনমানুষের কোলে। মিস্টার সিনা সমস্ত বুঝতো, তাই তোমার সঙ্গে মেলামেশায় সে কোনদিন অখুশি হয় নি। এই রকম করে করে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম সিনার কাছে। আজ সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তোমাকে ধন্যবাদ মিতু।"

চিঠির কথা শেষ করে এক মুহূর্ত থেমে থেকে মুখার্জি বললেন, সারা আমাকে বাঁচিয়েছে। ওকে না পেলে হয়তো উন্মাদ হয়ে যেতাম, না হয় আত্মহত্যা করতাম। ঝড়-বৃষ্টি থেমে এসেছে। আজ আপনি আমাদের অতিথি। ওর সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, কী সুন্দর বাংলা শিখেছে ও। কী মশাই কী ভাবছেন?

শোনা যায়, অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার আভাস অনেক সময় নাকি আগে থাকতেই পাওয়া যায়। হঠাৎ মুখ-দিয়ে-বেরিয়ে-যাওয়া টুকরো কোন কথার মধ্যেও নাকি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পায় অনেকে। আমি ওঁর প্রশ্নের উত্তরে সেদিন ওই-রকম হঠাৎ বলে উঠেছিলাম, আপনি ভাগ্যবান, তাই এই প্রেমের আশ্রয় পেয়েছিলেন অবশেষে, কিন্তু যারা সেটা না পায়?

রসদ্বীপের সেই খুঁজে-ফেরা-আলো, হয়তো আজও ঘুরে মরে সমুদ্রের বুকে, কিন্তু সেদিনের মতো আজও বোধ হয় খুঁজে পায় নি আমার চরম প্রশ্নের উত্তর! সম্ভবত এ যুগে পাওয়াও যাবে না।

বাণিজ্য

সিসেল্‌স্‌ বা সিচেলাস দ্বীপপুঞ্জ আমার কাছে নতুন নয়, এর আগেও একবার গেয়েছিলাম ওখানে। গিয়েছিলাম সেবার কোচিন হ'য়ে,—পশ্চিম উপকূলের কোচিন-বন্দর থেকে হাজার মাইল দূরে ভারত মহাসাগরে। আঠাশটি প্রধান দ্বীপ নিয়ে এই সিসেল্‌স্‌। প্রধান বন্দর ভিক্টোরিয়ায় বর্তমান সভ্যতার ছাপ পড়েছে। নইলে বহুদ্বীপ এখনো বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা, চাঞ্চল্য আর বিবর্তন থেকে শত যোজন দূরে। বহু জিনিসের ব্যবসা চলে এই দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে, তার মধ্যে নারকেলের শুকনো শাঁস, নারকেল তেল, সুবৃহৎ সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলা, এইগুলিই বিখ্যাত।

কথা হচ্ছিল বম্বের জনাকীর্ণ চৌপটি বালুবেলায় ব'সে। এ-পাশে ও-পাশে ফেরীওয়ালার চাঞ্চল্য, বাচ্চাদের চিৎকার, মেয়েদের কলগুঞ্জন, আর পুরুষদের ব্যবসায়িক আলাপ-পরিচয়। সন্ধ্যা নামছে। ঝানু ব্যবসায়ী মিস্টার মাথু এরই মধ্যে ব'সে সিসেল্‌সের গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। সমুদ্রের ভাঙা ঢেউয়ের ক্ষীণ ধারা পায়ের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে যাচ্ছে। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন অবচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠলেন মিস্টার মাথু, বললেন,—'আমি বম্বের লোক, কিন্তু সেদিন সিসেলস্‌ থেকে ফেরা অবধি বম্বেকে যেন নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছি! এই যে উদয়াস্ত অর্থের পিছনে ছুটোছুটি,—এর শেষ কোথায় বলতে পারেন?'

চমকে উঠলাম মনে মনে,—মিস্টার মাথু উঠ্‌তি ব্যবসায়ীদের অন্যতম, এঁর মুখে আজ এ কী কথা শুনছি!

মাথু সাহেব উত্তেজিত হয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরলেন, বললেন,—'আমার কথাই শুনুন। টুঁটি টিপে বিবেককে হত্যা করেছি। আমরা নীতি-ভ্রষ্ট, চরিত্রভ্রষ্ট,—অহঙ্কারে উত্তাল, দম্ভে স্ফীত। নিষ্প্রাণ নিরস পুরোপুরি কমার্শিয়াল লোক আমরা! আত্মাকে বিক্রয় করেছি অর্থের কাছে।'

বলে উঠলাম,—'না-না, এসব কী বলছেন! এসব……'

বাধা দিয়ে বললেন,—'ঠিকই বলছি। টাকা—মেয়েমানুষ—আর অশ্বক্ষুর-ধূলি,—এছাড়া কী জেনেছি জীবনে?'

ঠিক এই সময়ে একটা দমকা ঘূর্ণি-হাওয়া জাগলো,—বালির কণা উড়তে লাগলো এলোমেলো। জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগলো, অনেকেই উঠে যেতে লাগলো। মাথু সাহেব ততক্ষণে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। বালির ঝড় অতর্কিতে উঠে আবার অতর্কিতেই এক সময় মিলিয়ে গেল!

'কী জানেন? সিসেল্সের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আপনাকে বলতে হবে আমার ওখানকার বন্ধু মিস্টার অ্যাডাম্সের কথা। 'বন্ধু' কথাটা ব্যবহার করলাম বটে! উনি ওখানকার একজন গণ্যমান্য প্রতিপত্তিশালী লোক। কী ক'রে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল সেকথা আপনার না শুনলেও চলবে। তবে এটুকু বলতে পারি, সিসেল্সে ওঁকে ধরেই আমি ব্যবসায়ে নামব, এ রকম ইচ্ছা ছিল। আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা। ওঁকে খুশি রাখতে পারলেই যে আমার ব্যবসা চালু হ'তে পারবে,—এটা আমি আমার ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। প্রথম যেবার কোচিন হ'য়ে ওখানে যাই, তখন গিয়েছিলাম দেশ দেখতে—আর এই যে সেদিন গেলাম এখান থেকে, এ গেলাম সম্পূর্ণ ই ব্যবসায়ের ফন্দিতে, সেকথা আগেই বলে রাখা ভালো।

মিস্টার অ্যাডাম্স্ একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। অসাধারণ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, কিন্তু দুটো লম্বা হাত দুলিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে চলেন, মনে হয়, একটা বন্য দানব হেঁটে চলেছে। ভাব-ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে একটা ভয়ানক বন্যতা—রুক্ষতা ফুটে ওঠে। নইলে লোকটি সিসেল্সের অধিকাংশদেরই মতো মিশুকে, স্ফূর্তিবাজ এবং অতিথিবৎসল! বয়স? ধরুন, মধ্যবয়সী। কিন্তু স্বাস্থ্য চমৎকার! বাড়িতে আগেববার দেখেছিলাম ওঁর স্ত্রীকে,—এবার দেখি—একা, স্ত্রী নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে। সিসেল্সে এই ব্যাপারটা বড়ো সহজ। বিবাহ আর বিবাহ-বিচ্ছেদ,—এটা যখন-তখন ঘটছে,—এটা নিয়ে কড়াকড়ি তেমন নেই। লোকে বলে, মূল দ্বীপে ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। বিচিত্র দ্বীপ। আজ বৃটিশদের হাতে এলেও আগে ছিল ফরাসীদের দখলে। তারও আগে ছিল আরব-জলদস্যুদের লুকিয়ে থাকার জায়গা।

ফরাসীরা ভারত থেকে বহু দাসদাসী ধরে এনে এখানে কাজে নামিয়েছে একদিন। আফ্রিকা থেকেও এসেছে লোক। নানান্ জাতির সংমিশ্রণ। ধর্মে অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক। মূল ভূখণ্ডে শ্রমিকদের অবস্থা মোটামুটি ভালো হলেও ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে শোনা যায় সভ্যতার আলো আজও প্রবেশ করেনি, বর্বরতা এখনো চলেছে কোন কোন দ্বীপে। অসহায়দের কান্না সমুদ্র পার হয়ে দূরে পৌঁছয় না।

ভিক্টোরিয়াতে মিস্টার অ্যাডাম্‌সের ওখানে পৌছলাম এবার উষাকে নিয়ে। উষার বড়ো শখ ছিল সিসেল্‌স্ দেখবার, তাই নিয়ে গেলাম সঙ্গে। যাবার আগে ও যখন বাক্স গুছোচ্ছে, তখন হেসে বলেছিলাম,—'কিছু গাউনের অর্ডার দি ?'

'ওমা কেন !'

'কেন আবার ! পড়বে। ওখানে শাড়ী কেউ পরে না। সব গাউনের ব্যাপার।'

ও শুধু বললো,—'না বাপু, আমি শাড়ীই পরবো।'

বললা,—'প'রো। শুধু লোকে যখন হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে—।'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো, বললো,—'হিংসা হচ্ছে বুঝি ? তাহলে বলো ত, গাউনই নিই। গাউন আমার আছে।'

সিসেল্‌স্ দ্বীপপুঞ্জ যে পুরাকালের কোনো বিপুল মহাদেশের ভগ্নাংশ, তা বহু মনীষীই বলে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, এপাশে ভারতবর্ষ, ওপাশে মাদাগাস্কার পর্যন্ত এই মহাদেশ বিস্তৃত ছিল। কেউ কেউ বলেন, অবলুপ্ত আটলান্টিস্ মহাদেশের অবস্থিতি ছিল ঐ ওখানেই।

উষা খুব খুশি এই দেশ দেখে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত এই দ্বীপে যেন সবসময় বসন্তের হাওয়া বইছে। আমরা কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে খুব ঘুরতে লাগলাম। একদিন মিস্টার অ্যাডাম্‌স্ প্রস্তাব করলেন প্রাসলিন-দ্বীপটিতে ঘুরে আসবার। ভিক্টোরিয়া থেকে উত্তর-পূর্বে কুড়ি মাইল মাত্র। মোটর-লঞ্চে যাওয়া যায়। অ্যাডাম্‌স্ বললেন,—'কাজকর্ম পরে হবে মিস্টার মাথু। মিসেস্ এখানে হাঁপিয়ে উঠেছেন এ কয়দিনে। চলুন ওঁকে প্রাস্‌লিন ঘুরিয়ে আনি।'

'কিছু দেখবার আছে ওখানে ?'

'দেখবার ?—অ্যাডাম্‌স্ হেসে উঠলেন,—জগতের বিখ্যাত 'কোকো-ডি-মার' গাছ একমাত্র ঐ প্রাসলিনেই আছে। যে-ই এদেশে আসে, পৃথিবীর এ' অন্যতম জিনিস,—সৃষ্টির এ' অপূর্ব বিস্ময় না দেখে কেউই ফিরে যায় না।'

'ব্যাপারটা কী খুলে বলুন ত !'

'না দেখলে কী করে বোঝাই ? আপনারা ভারতের লোক, জানেন না এর কথা ? শোনেন নি এর নাম ? শুনেছি, পুরাকালে ভারতের কোন অংশে এই কোকো-ডি-মারের সুবৃহৎ ফলকে অতি পবিত্রজ্ঞানে পূজা করা হ'তো, মন্দিরে মন্দিরে রাখা হতো। এখনো পর্যন্ত এই সুবৃহৎ ফল

ভারতে চালান যায়! শুনেছি, 'Nux Medica' এই নামে ভারতে এই ফলের চূর্ণ বিক্রি হয় প্রচুর।'

'কী কাজে লাগে, বলতে পারেন?'

চাপা হাসিতে ভরে গেল অ্যাডামসের মুখ, প্রথমে উষার দিকে,—তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'পরে বলবো 'খন।'

সাত মাইল লম্বা, আড়াই মাইল চওড়া এই প্রাস্‌লিন দ্বীপটি। মাঝখানে মেরুদণ্ডের মতো অথচ আঁকাবাঁকা চ'লে গেছে একটা পাহাড়ের শ্রেণী,—সর্বোচ্চ চূড়াটা আন্দাজ বারো শ' ফিট্ উঁচু হবে,—ত্ব' পাশে তীরের দিকে ঢালু হয়ে নেমেছে।

কিন্তু দ্বীপে পা দিয়ে আমরা একটা আলোড়নেরই সৃষ্টি করলাম বলা চলে। উষার শাড়ীই হ'লো বিশেষ ক'রে সবার লক্ষ। গ্র্যাণ্ড আনসে গ্রামটির ছোট্ট হোটেলে জিনিসপত্র রেখে বেইসেণ্ট অ্যানি গ্রামের দিকে যে চার মাইলের রাস্তাটা চলে গেছে, সেই পথেই গেলে পড়ে কোকো-ডি-মার' গাছের বিখ্যাত জঙ্গল। খাওয়াদাওয়ার পর তিনজনে সেই পথ ধরে চলেছি, ক্ষেতে কাজ করতে করতে লোকগুলি কাজ থামিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে, কেউ কেউ মাথা থেকে টুপি খুলে জানাচ্ছে সম্ভাষণ। আবার কেউ কেউ কৌতূহলী হ'য়ে পিছনে পিছনে হেঁটে আসতেও দ্বিধা করেনি।

'কোকো-ডি-মার' গাছ দূর থেকেই নজরে পড়ে। বাস্তবিকই দেখবার মতো জিনিস! কয়েকটি পুরোনো গাছ একেবারে একশো ফিটের মতো উঁচু। পাতাগুলি পনেরো থেকে বিশ ফিট পর্যন্ত লম্বা। সবুজ এবং মসৃণ! আমাদের দেশের তালপাতার মতো বিস্তারের ভঙ্গি হ'লেও সে রকম উদ্ধত নয়, কোমল হয়ে যেন বাতাসের বেগের কাছে নতি স্বীকার করেছে। সমস্ত বৃক্ষকাণ্ডটা আমাদের মেয়েদের বিনুনির মতো ক'রে যেন বোনা ব'লে মনে হয়। ফলগুলি সুবৃহৎ, তিরিশ থেকে চল্লিশ পাউণ্ডের মতো ওজন হয় এক-একটা ফলের। অদ্ভুত দেখতে। আমাদের দেশের পাকা তালের কালো কালো শুকনো আঁটির মতো অনেকটা দেখতে লাগে, কিন্তু আকারে সুবৃহৎ। ভাঙলে, মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত ত্ব'টি দুগ্ধধবল শক্ত শাঁস। কাঁচা অবস্থায় ভাঙলে দেখা যায়, শাঁস থাকে তরল—দুধের মতো।

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম বাগানটা। এদিকে-ওদিকে দু'-একটা ম্যাঙ্গালোর টাইলে-ছাওয়া পাকা খেত-বাড়ি। কয়েকজন কর্মী কাজ করছে,

নিড়ুনি দিয়ে কেটে কেটে দিচ্ছে কোকো-ডি-মারের পায়ের কাছে জন্মানো আগাছার দল। চিহ্নিত গাছগুলি থেকে ফল পেড়ে আনছে। অ্যাডাম্‌সের হাঁকে সন্ত্রস্ত হ'য়ে এগিয়ে এলো কেউ-কেউ, কাছে এসে সেলাম জানিয়ে উষার হাতের কাছে এগিয়ে দিলো একটি ফল। অ্যাডাম্‌সের হাঁক-ডাক আর ওদের ঐ ভীতিবিহ্বল ভঙ্গি,—সাদা আর কালো চামড়ার প্রভেদটা যেন স্পষ্ট ক'রে মনে করিয়ে দিলো আমাকে। লোকগুলি কালো, কিন্তু বলিষ্ঠ! মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট, ছোট-ছোট চোখ, নাকের ডগাটা স্থূল! কিন্তু এদের মধ্যে কর্মরত আরেকটি লোককে যেন হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটু অন্যরকম। ওদের থেকে একটু ফর্সা, চুলগুলি অত কোঁকড়া নয়! নাকের ডগা অত স্থূল বা ঠোঁটও অত পুরু নয়! কিন্তু অবিশ্বাস্য চোখদুটি। বড়ো বড়ো, একটু যেন ভাসা-ভাসা। হয়ত ফলপাড়ার কোন একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, একটা হাতে একটা ফল, স্তব্ধ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে উষার দিকে তাকিয়ে। একেবারে যাকে বলে অপলক দৃষ্টি। অ্যাডাম্‌স্ কাছে এসে একটা প্রচণ্ড ধমক দিতেই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি সেলাম জানালো লোকটি। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি ওর চোখ থেকে। আমরা ওকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেছি, লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এলো পিছনে। কৌতূহলী হয়ে পিছনে পিছনে এ পর্যন্ত ত অনেকেই এসেছে, নীরবে এসেছে, নীরবে গেছে। কিন্তু এ লোকটি সরব,—ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলে একেবারে সরাসরি উষাকে,—"আপনারা কী ইণ্ডিয়ান?"

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডাম্‌সের ছড়ি পড়লো লোকটির পিঠে, আর সমভাবে বর্ষিত হলো অসংখ্য গালাগালি। মনে হ'লো একবার যেন স্ফীত হ'য়ে উঠল লোকটির উজ্জ্বল স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ দেহের বাহু দুটি, কিন্তু পরক্ষণেই হ'য়ে গেল কোমল, মুখটি নিচু করলো, নিচের ঠোঁটটি থরথর করে কাঁপছে। ব্যাপারটা ঘটে গেল এত আকস্মিক যে, আমরা বাধা দেবারও সময় পেলাম না, উষা ছুটে এসে আশ্রয় করলো আমার বাহু। অ্যাডাম্‌সের এ উদ্ধত ব্যবহার আমারও ভালো লাগেনি, একটু এগিয়ে গেলাম লোকটির কাছে, বললাম, 'হ্যাঁ। আমরা ইণ্ডিয়ান।'

মুখ তুললো লোকটি, একবার আমাদের দু'জনের দিকে তাকালো, তারপর তাকালো অ্যাডাম্‌সের দিকে, মুখ নিচু করলো আবার, বললো,—'আমিও ইণ্ডিয়ান।'

'ননসেন্স্!'—চিৎকার করে উঠলেন অ্যাডাম্‌স্,—'মিথ্যা বলবার আর জায়গা পাও নি! খাঁটি ইণ্ডিয়ান হ'য়ে তুমি করবে এখানে কুলিগিরি! ইণ্ডিয়া দেখেছ কখনো?'

লোকটি মাথা নেড়ে জানালো,—না। সে দেখে নি।

অ্যাডাম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলো,—'তোমার নাম কী?'

'জন।'

অ্যাডাম্‌স্‌ হেসে উঠলেন হা-হা ক'রে, বললেন,—'যাও, তোমার কাজ করো। কখনই তুমি ইণ্ডিয়ান নও। ইউ আর এ ম্যান্‌ অব্‌ দিস স্ট্রেঞ্জ্‌ আইল্যাণ্ড! যাও, কাজে যাও। কুইক্‌!'

লোকটি চ'লে গেল মাথা নিচু ক'রে। অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটায় যেন মুহূর্তে আবহাওয়াটা থমথমে হ'য়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ আমরা কেউই কথা বলতে পারি নি, মনে আছে। অনেকক্ষণ পরে চলতে চলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যাডাম্‌স্‌, ঊষার দিকে তাকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন,—'আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন ম্যাডাম। আপনার সামনে ঐ লোকটাকে মেরে হয়ত আপনার মনে ব্যথাই দিয়েছি। কিন্তু না মেরে উপায় ছিল না। এরা যে কী ভয়ানক প্রকৃতির লোক তা আপনারা জানেন না। মার খেয়েছে, এইবার দেখবেন, আপনারা একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ দেখেও কেউ বিরক্ত করতে আসবে না!'

আমি বললাম,—'কিন্তু মিস্টার অ্যাডাম্‌স্‌...'

বাধা দিয়ে উঠলেন,—'জানি মিস্টার মাথু, আপনার মনে কী প্রশ্ন উঠছে। একটা লোক এসে একটা কথা আচমকা জিজ্ঞাসা করলো, এতে দোষ কী থাকতে পারে, এই ত? আছে দোষ। এ বড়ো স্ট্রেঞ্জ আইল্যাণ্ড! এখানে আপনাদের ভারতের নীতি, অনুশাসন আর সামাজিক গণ্ডীর কথা একেবারে ভুলে যান। এ অদ্ভুত দেশ! এখানে বিয়ে মানে কী জানেন? এখানে বিয়ে মানে একটা চুক্তি বা কন্‌ট্রাক্ট্‌। সে চুক্তি সাত দিনও টিকতে পারে, সারা জীবনও টিকতে পারে। জুয়ার মতো। Any body can propose to any girl!...এ'ত গেল মাহে-সিসেল্‌সের কথা। এ প্রাস্‌লিন দ্বীপ আরো আদিম —আরো বন্য। এ আদিম অরণ্যে আদিম মানুষকে আপনি আটকাবেন কোন্‌ মন্ত্র দিয়ে?'

অ্যাডাম্‌সের কথার মধ্যে একটা যুক্তি আছে স্বীকার করি, এবং সে যুক্তি এই অদ্ভুত অরণ্যের একেবারে ক্রোড়ভূমিতে দাঁড়িয়ে সহসা অস্বীকারও করা চলে না। এ অরণ্যে শ্যামলতা ও স্নিগ্ধতার থেকে একটা ভয়াবহ বন্যতা,—একটা কেমন-যেন উদ্দাম আদিমতা, নিবিড় হয়ে মিশে আছে! কোকো-ডি-মারের কোমল পত্রাবলীর আড়াল থেকে প্রমত্ত উল্লাসে যেন মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে একটা উদ্দাম আদিম পশু! অরণ্যের এ রূপের সঙ্গে

আপনি ইতিপূর্বে পরিচিত হয়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি সেদিন যা দেখে এসেছিলাম, তা' জীবনে ভোলবার নয়! আর সেই কথা বলবো ব'লেই আপনাকে ডেকে এনেছি এখানে।

কিন্তু যা বলছিলাম। অ্যাডাম্‌স্‌ তার কথা শেষ করে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন, প্রথমে আমার, তারপরে উষার! মুহূর্তে কেমন-যেন আরক্ত হ'য়ে উঠলো উষার মুখখানা, লজ্জাবিজড়িত ব্রীড়াভঙ্গিতে অন্যদিকে ফেরালো মুখ, ঠিক-করা বুকের আঁচলটা টেনেটুনে আরেকবার অকারণেই ঠিক ক'রে নিলো! অ্যাডম্‌স্‌ ব'লে উঠলেন—'এ কী! কোথায় ফেলে দিলেন কোকো-ডি-মার, অ্যাঁ?

উষার পায়ের কাছে পড়ে আছে ফলটা। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে বলতে লাগলেন, মালিক আমার বিশিষ্ট বন্ধু, তার হয়ে আমি এটা আপনাকে উপহার দিচ্ছি। ফলটা অবশ্য পাকা নয়, কাঁচা। পাকা ফল আরো অনেক বড হয়।

উষাব মুখখানা তখনো আরক্ত, লাল শাড়ীর প্রান্তটা টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসেছে। একটু হেসে বললাম,—'উত্তর দাও মিস্টার অ্যাডামসের কথার!

মৃদুকণ্ঠে উষা বললো, 'ফলটা কাটতে বলো না? শাঁস খাবো?'

হো-হো ক'বে হেসে উঠলেন অ্যাডাম্‌স্‌, বললেন,—'শাঁস কোথায় ম্যাডাম? দুধের মতো তরল পানীয় এর ভিতরে টলমল করছে।'

বললাম,—'কিন্তু এই তরল পানীর খায় না কেউ?'

হাসতে লাগলেন অ্যাডম্‌স্‌, বললেন,—'খায় না আবার! পেলেই খায়।'

উষা অনুচ্চকণ্ঠে আমাকে বললো,—'এই, বলো না ওকে? আমি খাবো।'

অ্যাডাম্‌স্‌ গম্ভীব হ'যে গেলেন মুহূর্তে, বললেন,—'না ম্যাডাম। এ ফল আপনি খাবেন না।'

'কেন, কী হয় খেলে?'

অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন,—'পরে বলবো মিস্টার মাথু। এ হচ্ছে forbidden fruit—নিষিদ্ধ ফল!'

আমাদের হোটেলের বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। এটুকু বলতে পারি বেশ খোলা-মেলা। সন্ধ্যার পরই রাত্রের খাওয়ার পালা সেরে নেবার নিয়ম। কচ্ছপের ডিম ও মাংস এখানকার অন্যতম প্রধান খাদ্য। খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনজনে বসেছি অ্যাডামসের ঘরের সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে। আকাশটা কালো। নক্ষত্র উঠেছে। যেন একটা কালো পর্দার ওপরে অনেকগুলি তারা ঝিলমিল করছে। তারই নিচে অতিকায় কালো

স্লেটের মতো সমুদ্রটা প'ড়ে আছে। সাদা ব্রেকার ভাঙছে মাঝে মাঝে, যেন স্লেটের ওপরে সাদা খড়ি দিয়ে টানা কতকগুলি বলিষ্ঠ শুভ্র রেখা! কতকগুলি রেখা ফসফরাসের আধিক্যে নীল হ'য়ে জ্বলে উঠছে!

কোথায় কতদূরে বাজছে একটা গীটার,—অভিমানিনী প্রেমিকার কাছে আবেগ-কম্পিত ব্যাকুল প্রেমিকের থেমে-থেমে অস্ফুট কথা বলার মতো! ঊষা স্নান ক'রে এসেছে একটু আগে। আধো আলো আধো ছায়ায় যেন একটি ফুল ফুটেছে আমার হাতের কাছে!

অ্যাডাম্‌স্‌ একটা চুরুট ধরালেন, বললে, 'হঠাৎ কী রকম গুমোট পড়লো, দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন ত?'

'স্বাভাবিক। সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যার সময় হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়! অপেক্ষা করুন, একটু পরেই বইবে ভিতরের হাওয়া, সেই কোকো-ডি-মার অরণ্যের মাতাল হাওয়া আর কী।'

অরণ্যের কথায় অনেক কথাই উঠ্‌লো। অ্যাডাম্‌স্‌ জ্ঞানী লোক, পড়াশোনা করেন বিস্তর এবং যা বলেন, বলেন ভারী সুন্দর করে, গুছিয়ে। ওঁর কথার মধ্যে প্রায় ডুবে গেছি, হঠাৎ আমরা উভয়েই চমকে গেলাম ঊষার প্রশ্নে। ঊষা আচমকা প্রশ্ন করে বসলো অ্যাডাম্‌সকে,—'যে লোকটিকে আপনি তখন ছড়ি দিয়ে মারলেন, তার কথা একটু বলুন না!'

অ্যাডাম্‌স্‌ একটু যেন অবাক্‌ হলেন ওর এই অদ্ভুত্‌ কৌতুহল লক্ষ ক'রে। আমি অবাক্‌ হলাম আরও বেশি। ও' যেন আমার নীরব প্রশ্নটাকে টেনে বার ক'রেছে! সেই থেকে ঐ ব্যাপারটিই আমার অন্তরের অন্তস্তলে থেকে থেকে জ্বালা ধরাচ্ছিল,—বাইরের বহু আলোচনায় সেটা চাপা পড়েও পড়ছিল না। আমি ভারতের, তাই আমার কাছে লোকটি নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দেওয়াতেই বোধহয় এই ক্ষীণ আত্মীয়তা-বোধ! ভাবতে গেলে এটা কিছুই নয়, কিন্তু ভারত থেকে সহস্র মাইল দূরের ঐ নির্জন নিভৃত দ্বীপে এর মূল্য কম নয়, এটা আমি রক্তে রক্তে বুঝে এসেছি!

অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন,—'লোকটি কুলি, এছাড়া আর কী পরিচয় দেবো?—আর সব কুলির মতোই ওর জীবন। এর বেশি ওর কোনো পরিচয় আমি জানি না!'

বললাম—'মিস্টার অ্যাডাম্‌স্‌ ও লোকটি ইণ্ডিয়ান নয় বলছেন আপনি অথচ ইণ্ডিয়ান ব'লে পরিচয় দিতে ও এত আগ্রহশীল কেন?'

'সেটাই আশ্চর্য!' অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন,—'হয়ত ও শুনেছে ওর কোনো পূর্বপুরুষ ছিল ইণ্ডিয়ান। কুলি হ'য়ে হয়ত এসেছিল ওর কোনো পূর্বপুরুষ।'

'সেটাই সম্ভব।'

অ্যাডাম্‌স্‌ একটু হেসে বললেন,—'কে জানে! হয়ত আমারও রক্তে মিশে আছে কোনো ভারতীয়ের রক্ত!'

এ কথায় আমাদের মনটাও মুহূর্তে হ'য়ে গেল হাল্‌কা! এই এতক্ষণে অ্যাডাম্‌স্‌কে অতি অন্তরঙ্গ মনে হ'তে লাগলো। উষার কথাবার্তাও হ'য়ে এলো অনেক সহজ। অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন,—'কী জানেন? এ-দেশটাকে দেশ বলে আমরা যেন কেউ-ই মনে করতে পারি না! এ যেন বিরাট এক অতিথিশালা, আমরা বংশপরম্পরা অতিথির মতই এখানে বাস ক'রে চলেছি। কেউ স্বপ্ন দেখে স্পেনের, কেউ আরবের, কেউ আফ্রিকার, কেউ ভারতের! কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন ভাঙ্‌লেই এই স্ট্রেঞ্জ আইল্যাণ্ড্‌—এই বিচিত্র সিসেল্‌স্‌!'

রাত বাড়ছে। উষা একসময় উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'ঘুম পাচ্ছে।' আমি কিছু বলবার আগে বলে উঠলেন অ্যাডাম্‌স্‌—'যান, ম্যাডাম্‌, আপনার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। কোনো ভয় নেই। আপনার মিস্টারকে আমি একটু আটকে রাখলাম।'

উষা একটু মুখ টিপে হেসে বললো,—'রাখুন গিয়ে।'

চলে গেল। অ্যাডাম্‌স্‌ ধরালেন আরেকটা চুরুট, বললেন,—'অনেক কথাই বলার আছে, মিস্টার মাথু। আপনার মিসেসের সামনে সব কথা বলতে পারছিলাম না। বলা উচিতও নয়।'

হেসে বললাম, 'তাতে কী হয়েছে? ওর সামনে···'

'ওঁর সামনে সব কথা বলা যায় না'—অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, 'উনি সিসেল্‌সের নয়, ভারতের। ভারতের কথা আমি অনেক পড়েছি মিস্টার মাথু—ভারতীয় মহিলার সম্ভ্রমবোধের কথা অনেক জেনেছি।'

চলতে লাগলো কথাবার্তা। এভাবে কেটে গেল বহুক্ষণ। এসব কথা থেমেও গেল। তন্দ্রা আসছে। একসময় হঠাৎ উঠে দাড়ালেন অ্যাডাম্‌স্‌, বললেন, 'চলুন মিস্টার মাথু, একটু ঘুরে আসা যাক্‌!'

'কোথায়?'

'উঠুন না!'—অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, 'জঙ্গলে। কোকো-ডি-মারের অরণ্যে নিয়ে যাবো আপনাকে। ভয় নেই, হাতে ছড়িও রইল, টর্চও রইল।'

হেসে বললাম, 'ছড়ির হয়ত দরকার আছে, টর্চের দরকার নেই। চেয়ে দেখুন আকাশের দিকে।'

অ্যাডাম্‌স্ বললেন, 'ওর জন্যই ত অপেক্ষা করেছিলাম। জ্যোৎস্না দিয়ে ধুইয়ে দিক সমস্ত! আলো আর ছায়ায় উত্তাল হয়ে উঠুক আদিম কোকো-ডি-মার!'

নিজের ড্রেসিং গাউনটা টান মেরে খুলে ফেললেন অ্যাডাম্‌স্, বললেন, 'কোনো পোশাকেরই দরকার নেই মিস্টার মাথু, কোকো-ডি-মারের অরণ্য আদিম অরণ্য—Garden of Eden.'

ড্রেসিং গাউন আমিও খুলে ফেলেছি। পাতলা পাৎলুন আর জামা, এই ঘুমের পোশাকেই পার হয়ে এলাম হোটেলের সীমানা! নীরবে ধরলাম জঙ্গলের পথ। ঊষা হয়ত এতক্ষণে তার ঘরে ঘুমের গভীরে ডুবে গেছে।

অ্যাডাম্‌স্ এক জায়গায় এসে আমাব হাতটা ধরে একটা খাড়া বেয়াড়া পাথর পার কবে দিলেন, বললেন, 'কী রকম মহিমান্বিত সম্রাটের মতো মাথা তুলে দাঁড়িযে আছে কো-ডি-মার, দেখেছেন? মজা এই, ধারে-কাছে অন্য কোনো গাছকে উনি জন্ম নিতে দেন না। অদ্ভুত ব্যাপার, এদের কাছাকাছি অন্য কোনো গাছ নেই!'

ততক্ষণে অদ্ভুত একটা মদির গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে এই গন্ধ একটা গানের সুরেব মতো বেজে উঠ্ছে! আপনাকে ঠিক ভাষায় বোঝাতে পারছি না, এ অনুভূতি আমার জীবনে এই প্রথম।

অ্যাডাম্‌স্ বললেন, 'পুরাকালের ভারতীয়রা ভাবুতেন এ ফলের গাছ জন্মায় সমুদ্রেব অতলে, ফল পেকে পডে যায় না, জলে ভেসে তীরে উঠে আসে।'

আমরা অরণ্যেব দিকে অগ্রসব হচ্ছি। রুপালী আলোয় ভ'রে গিয়ে অপরূপ হয়ে উঠেছে দ্বীপের দৃশ্য। অ্যাডাম্‌স্ বললেন, 'আপনি ফলটা ভালো করে লক্ষ করেছিলেন?'

'করেছিলাম।'

'এ এক অদ্ভুত ফল মিস্টার মাথু। মানবদেহের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। হয়তো এই জন্যই একে ঘিরে প্রাচীন ভারতে এর এক উপাসক সম্প্রদায় গডে উঠেছিলো। যাঁরা পূজা করতেন এঁর,—এঁকে শিবলিঙ্গের মতো স্থান দিয়েছিলেন মন্দিরে।' হয়তো লক্ষ করেছেন গোপন স্ত্রী-অঙ্গের মতো এর আকৃতি!'

বিস্মিত হয়ে বললাম—'তাই নাকি!'

হেসে অ্যাডাম্‌স্ বললেন, 'দেখেননি লক্ষ করে? আশ্চর্য! মিস্টার মাথু,

এ নিষিদ্ধ ফল। এ খেলে উদ্দাম হয়ে উঠবে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি! এই ফলের চূর্ণ আজও সেই উদ্দেশ্যে বিক্রি হয়ে থাকে। এই ফলের যৌন-উত্তেজক গুণাবলী জগৎবিখ্যাত!'

ততক্ষণে এসে পড়েছি অরণ্যে। আসা মাত্রই মনে হলো, দূরে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! অ্যাডামসের কাছ ঘেঁষে চেপে ধরলাম ওঁর একটা হাত, বললাম, শুনছেন? কে যেন কাঁদছে! কে একটি মেয়ে যেন কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!'

অ্যাডাম্‌স্‌ ঘুরে দাঁড়ালেন আমার সামনা-সামনি, বললেন, 'ঠিক বলেছেন! সমস্ত অরণ্য-প্রকৃতি কাঁদছে। অরণ্য-দেবী! বলছেন, মুক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও! আদিম প্রকৃতি আজকের সভ্যতাব কাছে ফিরে পেতে চাইছে তার উন্মুক্ত আদিমতাকে! পারেন দিতে?'

বললাম, একটু উত্তেজিত হয়েই বললাম, 'বলছেন কি আপনি! শুনছেন না একটি মেযেব কান্না? নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে। চলুন দেখি!'

হেসে উঠলেন অ্যাডাম্‌স্‌, বললেন, "উত্তেজিত হবেন না, এ কোকো-ডি-মারের কান্না। রাত্রে আচমকা শুনলে ভৌতিক বলেই মনে হয়। পাতার মধ্য দিয়ে যখন হাওয়া বয়, তখন ঠিক মেয়েদের কান্নার মতই শোনায়। চলুন আরও ভিতরে। আপনি ফিরে যাবেন শহবে, কিন্তু ঠিক এ আনন্দ কোথাও পাবেন না! আমি মাঝে মাঝে আসি, আর অন্তবের দুরন্ত শিশুটাকে অনুভব করে যাই! কয়েক মুহূর্তের জন্য খেলা ক'রে যাই শিশু হ'য়ে মায়ের কোলে!'

এসে দাঁড়িয়েছি একটি ছোট কোকো-ডি-মারের পাতার নিচে। গন্ধ আরও তীব্র হয়ে স্নায়ুতে এসে বাজছে! যেন দুরন্ত নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছি। চাঁদের আলো আর এই রহস্যময় কোকো-ডি-মার সব মিলিয়ে যেন রক্তে বাজাচ্ছে ঝঞ্ঝনা! সেই দূর থেকে শোনা গীটারের আকুতি প্রিয়ার অভিমান যেন ভাঙাতে পারেনি এখনো! অনন্তকাল ধ'রে যেন এই আকুতিই কেঁদে কেঁদে ফিরবে, প্রিয়ার দুর্জয় অভিমান দূর হবে না তবু!

অ্যাডাম্‌স্‌ আর আমি ব'সে পড়েছি একটা পাথরের ওপরে। পাথরের আসনে দুটি পাথরের মূর্তি। অনেকক্ষণ কেটে গেল নিশ্চুপে। কথা বলার পালা অ্যাডাম্‌সেরই। বললেন, 'এই-ই হচ্ছে Garden of Eden, স্বর্গোদ্যান। বহু মনীষীর অভিমত, এই অরণ্যই হচ্ছে বাইবেলকথিত স্বর্গোদ্যান। আদম আর ইভের লীলাভূমি।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ। আর এই কোকো-ডি-মারই হচ্ছে সেই নিষিদ্ধ ফল, যা ইভ আস্বাদ

করে প্রথম, তারপরে প্ররোচিত করে আদমকে গ্রহণ করতে। আসে প্রথম লজ্জা। সভ্যতার প্রথমতম বাণী উচ্চারিত হয়েছিলো এই আদিম অরণ্যেই।

কতক্ষণ এই অপরূপ আদিমতার মধ্যে নিমগ্ন হয়েছিলাম, মনে নেই, অ্যাডাম্‌সের কথায় চমক ভাঙল। অ্যাডাম্‌স্ ঠেলছেন আমাকে কনুই দিয়ে। বললাম—'কী?'

উত্তেজিত অ্যাডাম্‌সের কণ্ঠস্বর, 'ঐ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন?'

উঠে দাঁড়িয়েছি, বললাম—'কী?'

'ঐ সামনের গাছটার আড়ালে।'

'কী?'

'এগিয়ে আসুন আমার সঙ্গে।'

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন সামনে। এক জায়গায় এসে থেমে গেলেন, বললেন,—'সাবধানে আসুন, সাড়া পেয়ে পালিয়ে না যায়।'

'কী বলুন তো?'

অ্যাডাম্‌স্ বললেন, 'আপনাকে আমি জগৎ-বিখ্যাত কালো রঙের টিয়াপাখী দেখাতে যাচ্ছি না। সে-ও অবশ্য এ অরণ্যের এক বিস্ময়। এবং সে একমাত্র এখানেই দেখা যায়!'

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কী বকছেন পাগলের মতো!'

অ্যাডাম্‌স্ আমাকে সঙ্গে নিয়ে আরো একটু এগিয়ে গেলেন, বললেন, 'ঐ দেখুন। একটি নর আর নারী। আদম আর ইভ।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে আরো এগিয়ে গেলো অ্যাডাম্‌স্, গাছের আড়ালে থেকে কী যেন দেখতে লাগলেন একমনে, তারপবে হঠাৎ একটা পশু যেমন মাথাটা নিচু করে গোঁ ধ'রে এগিয়ে যায়, তেমনি এগিয়ে এলেন আমার কাছে, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তিনি কাঁপছেন, কণ্ঠস্বর তাঁর বিকৃত, বললেন,—'আপনি জানেন ওরা কারা? আপনি জানেন মেয়েটি কে? আপনার স্ত্রী!'

'এ কী কথা বলছেন?'

হাত ধ'রে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন আরও সামনে। পাথরের ওপরে বসে আছে দুটি মূর্তি। মেয়েটি ছেলেটির দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছে। জ্যোৎস্না পড়েছে মেয়েটির মুখে, ওর পিছনটা ছায়ায় কালো, আমরা পিছন থেকেই দেখছি ওদের।

অ্যাডাম্‌স্ অদ্ভুত উত্তেজিত, যেন পাগল হ'য়ে উঠেছেন মুহূর্তে, বললেন, 'এ

তোমার স্ত্রী মাথু। শাড়ীপরা মেয়ে এ দ্বীপে একটিও নেই। তোমার স্ত্রী লুকিয়ে উঠে এসেছে ওখানে। নিষিদ্ধ ফল!'

কথাটা ঠিক। এই দ্বীপে শাড়ীপরা মেয়ে আর আসবে কোথা থেকে?

'নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রী।'

আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ওদের সামনে। দুটি ক্ষুধিত সিংহের মতো আমরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপরে। এক হাতে ছড়িটা শক্ত ক'রে ধরা, অপর হাতে টর্চ। টর্চের আলো গিয়ে পড়লো ওদের মুখে। বিস্মিত হ'য়ে অ্যাডাম্‌স্ বললেন, 'এ কী! এ-কে? এ তো তোমার স্ত্রী নয়! কিন্তু শাড়ী…!'

পুরুষটা শাড়ীপরা বেপথুমতী মেয়েটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই লোকটি,—ভারতীয় ব'লে পরিচয় দিয়েছিলো যে। জন।

অদ্ভুত মুহূর্ত! অ্যাডাম্‌স্ হেঁকে বললেন,—'কে এ মেয়েটি?'

জন কী বলতে গিয়েও বললো না, মুখখানা নিচু করলো। অ্যাডাম্‌স্ উঠলেন চেঁচিয়ে, '—চুলোয় যাক্ মেয়েটার পরিচয়। শাড়ী তুমি কোত্থেকে পেলে?'

মেয়েটি ভয়ে কেঁপে উঠলো। জনকে জড়িয়ে ধরলো শক্ত করেই। বলে উঠলেন অ্যাডাম্‌স্,—'নিশ্চয়ই চুরি করেছো কোনো সুযোগে এই এঁর স্ত্রীর ঘর থেকে!'

জন এবারও রইলো চুপ ক'রে। পাছে অ্যাডাম্‌স্ কিছু করে করে বসেন তাই ধরতে যাবো ওঁর ছড়িটা, হঠাৎ দেখি অভাবিতরূপে অ্যাডাম্‌স্ টর্চ নিভিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটা শুরু করেছেন ফেরবার পথটি ধ'রে। আতঙ্কিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে লাগলাম ওঁর পিছনে।

'অ্যাডাম্‌স্—অ্যাডাম্‌স্!'

অ্যাডাম্‌স্ হাঁটছেন আরো জোরে।

'অ্যাডাম্‌স্,—কী করছো—অ্যাডাম্‌স্!'

ছুটতে ছুটতে শেষে এক সময় ধরলাম ওঁকে। বাহু দুটো ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম,—'অ্যাডাম্‌স্ কী করছো তুমি! যাচ্ছো কোথায়?'

হাত থেকে ওঁর পড়ে গেলো ছড়ি, 'টর্চ,—হাত দুটি দিয়ে ঢাকলেন ওঁর মুখ, বললেন—জন চুরি করেছে তোমার স্ত্রীর শাড়ী। কেন জানো?'

একটু থেমে বললাম, 'বোধহয় জেনেছি। তার প্রণয়িনীকে শাড়ী পরিয়ে সে তার ভারতবর্ষকেই অনুভব করতে চেয়েছিল নিবিড় ক'রে।'

উত্তেজনায় অ্যাডাম্‌স্ জড়িয়ে ধরলেন আমাকে,—'ঠিক বলেছো। ঠিক বলেছো!'

তারপরে একটু থেমে আবার ঢাকলেন তাঁর মুখ, বললেন, 'আমার রক্তেও

হয়তো ভারতীয়ের রক্ত বইছে, কে জানে! অথচ তার ঐতিহ্য কোথায় বহন করছি আমরা! আমরা ব্যভিচারী, আমাদের নীতি নেই, কিছু নেই! আমরা দ্বীপবাসী এক অদ্ভুত জীব!'

'এসব কথা কী বলছো তুমি!'

আমার হাত দুটো টেনে নিলেন হাতের মধ্যে অ্যাডামস্। কাঁপা গলায় বলতে লাগলেন,—'আমাকে ক্ষমা করতে পারবে বন্ধু? আমি কী করে তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে একথা ভাবলাম! তিনি ভারতীয় মহিলা! আমি তাঁকে অপমান করেছি! আমার অবচেতন মনে নিশ্চয়ই জেগেছিল তাঁর প্রতি কু-ভাব! পাবো তো আমাকে ক্ষমা কোরো বন্ধু!'

বলেই হাত ছাড়িয়ে আবার ছুটতে লাগলেন।

ডাকতে লাগলাম,—'অ্যাডামস্—অ্যাডামস্—শোনো-শোনো!'

কে শুনবে আমার কথা। সে পাহাড়ী পথে কেবল নেমেই চলেছে। নেমেই চলেছে।

'অ্যাডামস্—অ্যাডামস্।'

মিস্টার মাথুর 'অ্যাডামস্ অ্যাডামস্' ধ্বনি আর্তনাদের মতই শোনালো মধ্যরাত্রির বম্বের সমুদ্রতীরে। আমার হাত দুটো চেপে ধবলেন মিস্টার মাথু, হয়ত এমনি করেই ওর হাত ধরেছিলো প্রাসলিম দ্বীপের মিস্টাব অ্যাডামস্। আবেগকম্পিত স্বরে মাথু বললেন,—'ভারতীয়দের প্রতি এতো ওদের শ্রদ্ধা। আমার ব্যবসা কবা আর ওদের সঙ্গে হলো না মিস্টাব ব্যানার্জি। পরেব জাহাজেই ফিরে আসতে হলো।'

'কেন?'

মাথু বললেন,—'এতদিন এই ব্যবসায়ী নগবীতে বইলেন, বুঝলেন না এটুকু? মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি উষাকে চেনেন, কিন্তু আমি ওর পরিচয় ওদের কাছে দিতে পারলুম কই? এর পরে, আপনিই বলুন, কী করে ওদের বলবো যে; উষাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওদেরই জন্য। উষা আমার স্ত্রী নয়, উষা আমার······আপনি বুঝেছেন আমার মর্মবেদনা?'

———

সাগর বলাকা

যুগ-যুগান্তর ধরে ওরা আসে ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জে। কিছুদিন বিহার করে দ্বীপে,—ডিম পাড়ে,—শিশু-বিহঙ্গ একদিন বেরিয়ে আসে অন্ধকার ভেদ করে, বড় হয়,—পাখায় আসে জোর—আবার দল বেঁধে উড়ে যায় কোথায়,—কতদূরে,—কে জানে !…

এক হাজার কী পাঁচশো বছর আগে যে পাখিরা এসেছিলো সিচেলাস বা সিসেল্‌স্‌ দ্বীপপুঞ্জের এই বসতিহীন ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে,—তাদের ফসিল হয়তো পাওয়া যেতে পারে সুদূর হিমালয়ের কোনো হিমপুঞ্জের নিচে,—কিন্তু তাদের বংশধারা আজও প্রবহমান। বংশ-পরম্পরায় এই ভবঘুরে পাখিদের যে চিরাচরিত অভ্যাস গড়ে উঠেছে,—সেই অভ্যাসের বশেই ওরা অবলীলায় উড়ে যায় হাজার দু' হাজার মাইল,—সারা বছর জুড়ে এরা উড়ে বেড়ায় হয়ত পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। এপ্রিল মাস পড়তে না পড়তেই প্রকাণ্ড ঝাঁক বেঁধে ওরা প্রতি বছর আসে নির্জন দ্বীপগুলিতে। আগস্ট মাসে আবার ছেড়ে যায় দ্বীপের আশ্রয়, শিশু-বিহঙ্গেরা তখন ডানায় পেয়েছে উড়ে-চলার শক্তি।

এই বিহঙ্গ-অতিথিরা সিসেল্‌সের বিশেষ সম্পদ। যুগ যুগ ধরে এদের পুরীষ দ্বীপের এখানে ওখানে, পর্বতের গুহায় অথবা পাথরের খাঁজে খাঁজে প্রস্তরবৎ সুকঠিন অবস্থায় সঞ্চিত হয়ে আছে। রাসায়নিকেরা জানেন, সেগুলি নানাবিধ ফসলের জন্য বিশেষ ভাল সার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই পক্ষী-পুরীষ এভাবে থেকে থেকে শক্ত সিমেন্টের মতো জমে আছে। বৃষ্টির জল পেয়ে পেয়ে পুরীষের স্তূপের ওপর ফুটে বেরিয়েছে চুনের অঙ্গার ও অ্যামোনিয়া-ফস্‌ফেটের আস্তরণ।

এগুলিকে এখানে বলে 'গুয়ানো'। এই গুয়ানো সংগ্রহ এবং দেশবিদেশে চালান দেওয়া, এদেশের একটা বড় ব্যবসা। বহু শ্রমিকের অন্নসংস্থান হয় এই ব্যবসায়িক কর্মচক্রটি থেকে। তাছাড়া প্রতি বছর যখন আসে অতিথি এই বিহঙ্গের দল, তাদের ডিম কুড়োবার ধুমও পড়ে যায়। এই ডিমের ব্যবসায়ও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

ঠিকায় সংগ্রহ করা হয় শ্রমিক দলকে,—অধিকাংশই 'কালা আদমী'। একবারের কী দু'বারের ঠিকা, সহস্র নিয়ম ও স্বীকৃতির পণ দিয়ে বাঁধা। প্রচলিত

দাস ব্যবসায় লুপ্ত হয়েছে বহুদিন, কিন্তু এই ঠিকার সময়টুকু শ্রমিকদল ব্যবহারিক দিক থেকে কোম্পানীর বা মালিকের ম্যানেজারদের দাসেই পরিণত হয়। তাদের হাতেই ওদের মরণ-বাঁচন, তাদের হাতেই ওদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। একজোট হবার উপায় নেই, বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে এদের কাজ করতে হয়, সমুদ্রের ঢেউ ঠেলে একদলের সঙ্গে অপরের সংযোগ-সাধন, সেটা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি ওদের ওপর প্রখর হয়েই পড়ে আছে। মাসের পর মাস ওরা নির্জন ক্ষুদ্র দ্বীপে কাজ করে চলে, ঘর নেই, ঘরনী নেই,—একঘেয়ে কাজ আর কাজ। এই একঘেয়ে জীবনে বোধহয় একমাত্র আনন্দ ঐ সমাগত সাগর-পক্ষীর দল! যাঁরা চিরকাল দ্বীপে থাকে, সেই মাকোয়া বা ফ্রিগেট্ জাতীয় গাংচিল নয়, প্রতিবারে উড়ে আসে—উড়ে যায়—যাদের গম্ভীর গলা শুনে মনে হয়, যেন বলছে, "জাগো জাগো।"—সেই তারা,—গোয়েলেৎ জাতীয় ভবঘুরে সাগর-বলাকা।

মোজেস, জাঁ আর জীওন,—এই তিনজনকে জাহাজ থেকে বোটে করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিলো এই নির্জন ক্ষুদ্রকায় পার্বত্য দ্বীপটিতে আসবার জন্য। বাকী শ্রমিকদেরও ওরা অমনি করে নামিয়ে দেবে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে। এপ্রিল মাস এসে পড়েছে, অতিথিদের আবির্ভাব-কাল সমাগত।

এরা তিনজনেই সিসেলিয়ান, অর্থাৎ সিসেল্‌সের লোক। কিন্তু জাঁ-র চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, আফ্রিকা থেকে এসেছিলো ওর পূর্বপুরুষ। সে নিজেই সেটা বলে, আর গর্ব করে। মোজেসের বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে, সে-ই এদের তিন-জনের মধ্যে বড। জীওন ছেলেমানুষ, এই তার জীবনে প্রথম বেরিয়ে-পড়া নির্জন দ্বীপের অন্ধকারে।

জাহাজে বসে তাদের ওভারসিয়ার যখন স্থির করলো, জাঁ আর মোজেসের সঙ্গে তাকেও এই দ্বীপে নামিয়ে দেবে—তখন সে প্রায় কেঁদে ফেলতে বাকী রেখেছিল। জাঁকে সে চেনে, অদ্ভুত ধরনের নির্লিপ্ত মানুষ, কিন্তু মোজেসের কথা সে যা' শুনেছে, তাতে এই চার পাঁচ মাস একত্রে বাস, এটা ভাবতেই হৃদকম্প হয়!···মোজেস নাকি ম্যানেজার সাহেবের দালাল! শুধু কী তাই? অবলীলাক্রমে কাউকে মেরে ফেলতে পর্যন্ত ওর নাকি বাধে না। কতো-কী গল্প প্রচলিত আছে ওর সম্বন্ধে! অবাধ্য শ্রমিক, কিছুতেই দমন করা যাচ্ছে না, ডাক পড়লো মোজেসের। চাবুক তো আছেই,—কখনো-সখনো কোন কোন শ্রমিক একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এ-ও শোনা যায়। এ-সব বাইরের দ্বীপগুলিতে আইনই বা কী, আদালতই বা কী! ম্যানেজার আর তার ওভারসিয়াররাই সর্বেসর্বা।

তারাই আইন, তারাই বিচারক। হতভাগ্যদের করুণ কান্না সমুদ্রের ঢেউ পার হয়ে সিসেল্সের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছয় না!

মোজেস বহু পুরানো লোক কোম্পানীর। ম্যানেজারের হাতের লোক হবার পর থেকে ইদানীং তাকে আর কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হতো না বাইরের দ্বীপগুলিতে। এ বছর কী ঘটলো হঠাৎ?

কাহিনীটা শুনে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল জীওন। মোজেস খুন করেছে নাকি আবার একটা লোককে। স্ত্রীলোক-ঘটিতই নাকি তুচ্ছ কী এক ব্যাপার। ম্যানেজার যথারীতিই অন্ধকার যবনিকায় ঢেকে দিত ঘটনাটা, কিন্তু ১৯২৪ সালে আলফোঁসে দ্বীপে শ্রমিক-অসন্তোষ ঘটায় কর্তৃপক্ষ নাকি বিশেষভাবে সচেতন। তাই বিচারক এসেছিলেন মূল সিসেল্স দ্বীপ থেকে বিচারের দণ্ড হাতে নিয়ে। ছিলেন ম্যানেজারেরই বাড়িতে। মোজেসের হয়েছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বিচারক দণ্ড দিয়ে ফিরে গেলেন, সেই অনুসারে মোজেসকে আসতে হলো সাধারণ শ্রমিকের মতো এই নির্জন দ্বীপে ডিম কুড়োবার ও গুয়ানো তুলবার কাজ নিয়ে। ওরা কাজের মজুরি পাবে শ্রমিক ব'লে, কিন্তু মোজেস দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধী, তার বেলায় এ প্রশ্ন উঠবে না।

বাকি কথাটাও সে শুনেছে। আইনমতো যাবজ্জীবন এই দ্বীপে কাটাবার কথা মোজেসের! কিন্তু ম্যানেজার আর ওভারসিয়ার যার সহায়—তার কেশাগ্রও স্পর্শ করে কে? গোপন ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। চার-পাঁচ মাস পরে যখন পাখিরা উড়ে যাবে তখন 'মোজেস' হয়ে যাবে 'মুসা'—যথারীতি নূতন নাম নিয়ে ফিরে আসবে সে, শুরু করবে নতুন জীবন। হয়ত এতদিনের অ-বিবাহিত লোকটি এইবার বিয়ে করবে, কে বলতে পারে!

আরম্ভ হলো দ্বীপের জীবন। ছোট্ট দ্বীপ, পাহাড়ে ঘেরা। তিনদিকে পাহাড়, একদিকে শুধু নারকেল, টাকামাকা গাছ, ঝোপ-জঙ্গল আর লতাগুল্মের রাজত্ব, তারই সামনে অনেকটা দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বালুবেলা।

একটা বড় টাকামাকা বনস্পতির নিচে ওরা মাচা বাঁধলো ডালপালা কেটে; নারকেল-পাতা দিয়ে ছাইলো ঘর। আফ্রিকার জ্যাঁ শিস দিয়ে দিয়ে গান করছিল, বলল,—"দ্বীপটা ভালো। সমুদ্র ক্ষেপে গিয়ে যদি সব ভাসিয়ে নিতে চায় তো ছুটে গিয়ে পাহাড়ে উঠবো। খুব বাঁচোয়া। বুঝলে মোজেস সাহেব?"

মোজেস গম্ভীর হয়ে বসে আছে প্রথম থেকেই, কোনো উত্তর দিল না কথার। জীওনের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সবিস্ময়ে বললো, "সমুদ্র ছুটে আসবে মানে!"

হি-হি করে হেসে উঠলো জ্যঁা, বললো, "কতো দ্বীপ পড়ে রয়েছে, সেগুলিতে, পাহাড় নেই, শুধু বালি ধূ ধূ করছে। দুটি-একটি গাছ জন্মেছে কোনো রকমে। সমুদ্র ক্ষেপে গিয়ে যদি দ্বীপগুলিকে ধুইয়ে নিয়ে যায়!"

"যারা আমাদের মতো ডিম কুড়োতে যাবে, তাদের কী হবে তাহলে?"

"কিছুক্ষণের জন্য জলকেলি। তারপরে সব পরিষ্কার। ম্যানেজারের খাতা থেকে কয়েকটা নাম কাটা যাবে শুধু—আর কিছুই হবে না।"

'রেশন'-হিসাবে ওভারসিয়ার যা' ফেলে দিয়েছিলো নৌকোয়,—সেগুলি ভালো করে সাজিয়ে তুলতে লাগল জ্যঁা। ওদের ছোট্ট নৌকোটা তীরের ওপরে উঠিয়ে রাখা হয়েছে—তার গলুই পর্যন্ত ঢেউ এসে ফিরে যাচ্ছে। জ্যঁা বলল—"কী হে, তোমরা সব স্নান করবে না সমুদ্রে?"

মোজেস কী একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল,—স্নানের কথায় বিরক্তি প্রকাশ করে ঘর থেকে নেমে টাকামাকা গাছটায় ঠেস দিয়ে মাটিতে গিয়ে বসলো, কোমর থেকে লুকানো ছোরাটা বার করে গেঁথে দিল মাটিব ওপর। ছোরা দেখে কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো জীওনের। ভয়ও বটে, কৌতূহলও বটে। জ্যঁা চলে গেল শিস দিতে দিতে সমুদ্রের দিকে, জীওন ধীরে ধীরে গিয়ে কাছে দাঁড়ালো মোজেসের। এই ছোরাটা দিয়েই কী……।

ও আসায় মোজেস বিরক্তি প্রকাশ কবলো না দেখে একটু ভরসা পেলো জীওন, নিশ্চুপে সে বসে পড়লো কাছে, তখনো বাধা এলো না মোজেসের দিক থেকে। কিছুক্ষণ থেমে থেকে জীওন বললো,—"বাগ করলে না ত এলাম বলে?"

ছোরাটা চট করে উঠিয়ে নিলো মোজেস, বললো,—"দেখ ছোরাটা ভালো করে। বাঁটের কাছে খোদাই করা নাম,—মো-জে-স! এই দেহটা যতদিন থাকবে, ছোবাটা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে!"

বলেই উঠে দাঁড়ালো, চলে গেলো সমুদ্রের দিকে।

কেটে গেলো কয়েকটা দিন। এত ক্ষুদ্র দ্বীপ যে বলার নয়, চারপাশে বালুবেলা থাকলে প্রদক্ষিণ করতে বোধহয় আধঘণ্টাও লাগতো না। পাহাড়ে চড়ে জঙ্গলে বেড়িয়ে, শেষ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে চেনা হয়ে গেল ওদের সব-কিছু, সব-কিছুই একে একে হয়ে গেল একদিন একঘেয়ে,—বৈচিত্র্যহীন।

জাহাজে মোজেসের কথা শুনে জীওনের একদিন হৃদকম্প উপস্থিত হয়েছিল, আর আশ্চর্য, সেই মোজেসের সঙ্গেই একদিন ওর ভাবটা হলো বেশি। জ্যঁা-লোকটা নিজের মনেই থাকতে ভালোবাসে, গান গায়, সন্ধ্যা হলে আগুন জালিয়ে

লতাপাতার পোষাক পরে অগ্নিশিখার চার দিকে ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত আফ্রিকার নৃত্যে মেতে যায়।

কাঠ কেটে একটা ভেলা বানিয়েছে—দিনের বেলায় যেদিন সমুদ্রে জাগে অশান্তি, উত্তাল ব্রেকার ওঠে প্রাচীররেখার মত, সেদিন সেটায় চড়ে সমুদ্রের ব্রেকার পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কোনদিনই পারে না ভেলা নিয়ে ব্রেকার উত্তীর্ণ হতে, ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে উল্টে যায় ভেলাসুদ্ধ—ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিপর্যস্ত ক'রে ওকে তীরে দিয়ে যায় সমুদ্র, কয়েক মিনিট বালির ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে নির্জীবের মতো, রীতিমত হাঁপাতে থাকে। এই ওর এক অদ্ভুত খেলা। বলে—"হাত পা ডলাই-মলাই করে দিতে সমুদ্রের মতো ওস্তাদ আর কেউ নেই!"

কিন্তু এভাবে কর্মহীন বসে থাকা আর কতদিন চলে? জীওনের মনে হচ্ছে যেন রীতিমত ফাঁকি দিচ্ছে সে কোম্পানীকে। বললো, "গুয়ানো তোলার কাজেই না হয় হাত দেওয়া যাক। পাখিরা যতদিন না আসে।"

হি-হি করে হেসে ওঠে জঁা, বলে, "একেবারে ছেলেমানুষ। কোনো অভিজ্ঞতা নেই।"

মোজেস বলে,—"ওভারসিয়ারের হুকুম নেই। পাখিরা আসবার আগে গুয়ানো তোলা উচিতও নয়। তুমি পাথরের খাঁজে খাঁজে শাবল চালিয়ে গুয়ানো তুলে সৃষ্টি করবে নতুন খাঁজ, পাখিরা সেই খাঁজ খুঁজে পেলে আর রক্ষে নেই। ডিম পাড়বে গিয়ে সেই খাঁজে। ওখানে ডিম পাড়লে তুলবে কী করে সেই ডিম? এই দ্বীপের ডিম তোলার ইজারা নিয়েছে যে লোক, তার সেটা লোকসান নয়?"

অতশত বোঝেনি জীওন, বলল, "কিন্তু কাজকর্ম কিছু না পেলে তা ভালো লাগছে না।"

জঁা হেসে উঠলো এবারও। বলল,—কাজ আসছে হে, আসছে। পাখিরা এলে ডিম তুলে তুলে হয়রান হয়ে যেতে হবে। ওভারসিয়ার দিয়েছে তিনজন লোক, তিরিশ জন লোক দেওয়া উচিত এই কাজে।"

মোজেস বললো,—"ফূর্তি করে নাও পাখিরা আসার আগে পর্যন্ত। ওরা এলে নাচ ত দূরের কথা, জোরে জোরে কথা বলতেও পারবে কিনা সন্দেহ। সমুদ্রে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্নান করবে, পাখিদের জন্য তাও পারবে না। পাখিতে পাখিতে ছেয়ে যাবে দ্বীপ।"

কিন্তু কবে আসবে তারা? প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় দিন কাটে ওদের। এক জ্যোৎস্না-নিশীথে বালির ওপর শুয়ে আছে মোজেস আর জীওন পাশাপাশি।

জীওন হঠাৎ এক সময় বলে,—"প্রথমটায় তোমার কথা যখন শুনলাম জাহাজে, রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তুমি কি সত্যিই খুন করেছিলে!"

"করেছিলাম", মোজেস বলে,—"একটা? তিন-চারটে লোক। চারবারের বার ধরা পড়ে গেলাম।

উত্তেজনায় উঠে বসেছিল জীওন—"পারলে কী করে! হাত কাঁপে নি?"

একটু যেন হাসলো রুক্ষমূর্তি গম্ভীর প্রকৃতির মোজেস সাহেব। বললে—"সার্কাসে বাঘকে দেখাতে বার করবার আগে আফিং খাইয়ে নেয়, তা জানো?"

"তাই নাকি?"

"তাও জানো না! তবে তুমি আমাকে বুঝতে পারবে না হে!"

"তোমাকেও কি কেউ আফিং খাইয়ে দিতো নাকি?"

"হ্যাঁ", মোজেস বলে,—"সে এক মজার আফিং হে, মজার আফিং!"

গল্পের আভাস পেয়ে উঠে বসেছে জীওন, সাগ্রহে বললে,—"বলো না আমাকে সব কথা।"

"বলতে আমার আপত্তি নেই, বুঝবে কী?"

"বুঝবো। তুমি বলো।"

আকাশের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো মোজেস।

অভিজ্ঞতা আর চিন্তার দাহ মুখখানাকে রেখায় রেখায় করেছে ক্ষতবিক্ষত। বলশালী কঠিন দীর্ঘ দেহযষ্টিতে কোথাও কোন কোমলতা নেই! বললো, জীবনে কোনদিন কাউকে ভালোবেসেছো জীওন?

"ভালোবাসা!" জীওন বললে, "কে জানে সেটা ভালোবাসা কিনা! একবার একটা মেয়ের সঙ্গে—"

বাধা দিয়ে মোজেস বলে—"ভালবাসায় উন্মাদ হয়ে গেছো কোনদিন?"

জীওন উত্তর দিতে গিয়ে বাধা পেলো। মোজেস বললো,—আফিং খেয়ে অনেকে আত্মহত্যা করে, আমি ভালোবাসার আফিং খেয়ে আত্মাকে হত্যা করেছি!"

"মানে!"

বহুক্ষণ চুপ করে রইলো মোজেস, বললো—"তোমার কাছে একটা নোটবই দেখেছিলাম না জীওন? একটা পেনসিলও দেখেছিলাম মনে পড়ছে।"

"হ্যাঁ আছে। যদি কিছু লিখতে টুকতে হয় ...."

জীওনের হাত দুটো ধরে অনুনয়ের স্বরে মোজেস বললো,—"দেবে আমাকে? আমি লিখবো।"

"বেশ ত নিও। একেবারে নতুনই আছে। এখানে এসে আমার কিছু লিখতে ইচ্ছাও করছে না।"

"আমার করছে"—মোজেস বললো,—"দেবে ভাই?"

"বেশ তো, কাল সকালেই নিও।"

মোজেস বললো,—"তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে যেন মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ"—জীওন বললো—"কনভেণ্টে কিছুদিন পড়েছিলুম।"

মোজেস উঠে বসলো একেবারে, বললো—"আর আমি কনভেণ্টে পড়া শেষ করেছিলাম।"

একটু অবাক হয়েই জীওন বললে,—"বলো কী!"

"হ্যাঁ", মোজেস উত্তর দিলো,—"কিন্তু কী হলো বলো ত? মানুষ মেরেই দিন কাটালাম।"

জীওন বললে,—"বলো না আমাকে? আমি কাউকে বলবো না।"

মোজেস একটু হাসলো, বললো, "জীওন, তুমি কোন্ দেশের লোক?"

"কেন সিসেল্সের!"

"সিসেল্সের তো আমিও!" মোজেস বললো, "কোথা থেকে এসেছিল তোমার পূর্বপুরুষ?"

একটু থেমে একটু ভেবে নিয়ে বললো,—"শুনেছি ইণ্ডিয়া থেকে।"

"আমিও সেটা আন্দাজ করেছিলাম",—মোজেস বললো,—"তুমিও আমার মতো ইণ্ডিয়ারই লোক।"

"তুমি ইণ্ডিয়ান?"

"হ্যাঁ ভাই",—মোজেস বললো,—"আমার পূর্বপুরুষ ছিল নাবিক। হয়ত জল-দস্যুদের সহকারী! ভারতের পশ্চিম উপকূলের লোক আমরা! মোপলা বলতো আমাদের। আমরা মালাবারের। তুমি জানো জীওন, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস খুব পড়তুম, ভারত থেকে লোক এলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতুম দেশের কথা। শেষ পর্যন্ত আমার সব কিছু টের পেয়ে গেল লোকে। 'কালা আদমী'র এতো পড়ার নেশা কেন, জানার নেশা কেন? ওভারসিয়ার হয়ে চলে এলুম এই কোম্পানীর দ্বীপে, ম্যানেজারের কাছে।"

"ওভারসিয়ারি করেছো বুঝি কিছুকাল?"

"অনেক কিছুই করেছি", মোজেস বললো, "আমরা খৃষ্টান, কিন্তু তোমার নাম শুনে মনে হচ্ছে, তুমি হিন্দু।"

"না-না, আমি…"

বাধা দিয়ে মোজেস বলল, "চার্চে যাও, সব কিছু করো। কিন্তু তোমার নামটাই বহন করছে তোমার আসল পরিচয়।

"কী রকম!"

মোজেস বলল, "তোমাকে সবাই 'জীওন' 'জীওন' করে, আসলে তোমার নাম, 'জীবন',—যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'লাইফ'।"

আনন্দে জড়িয়েই ধরলো ওকে জীওন, বললো,—"সত্যি!"

"হ্যাঁ, জীবন বলেই আমি তোমায় ডাকবো।"

চুপচাপ শুয়ে রইলো দুজনে। জীওনের মন তখন ভারতের স্বপ্নে ভরে গেছে। মানচিত্রে দেখেছে সে ভারতকে, কিন্তু কেমন সেই দেশ!

"জীবন!" মোজেস বললো,—"তোমরা ভারতের কোন্ দিককার লোক, জানো?"

"না।"

"তোমার মা-বাবা বেঁচে আছেন তো?"

"হ্যাঁ, বাবা আছে প্রাস্লিনে কো-কো ডিমারের জঙ্গলে কাজ নিয়ে। মা বাবাকে ছেড়ে গেছে বহুদিন। মা এখন লা-দিগু আইল্যাণ্ডে আর-একজনের ঘরণী।"

"ভারতের কথা ওঁরা কিছু বলতেন না?"

"বিশেষ কিছু না। বলতেন আমার বুড়ো ঠাকুর্দা।"

'কী বলতেন?"

"জীওন বলে,—"ভারতের পূর্ব দিকের লোক আমরা। খুব নদী-নালার দেশ নাকি সেটা।"

"তারপর?"

"পর্তুগীজরা আমাদের পূর্বপুরুষকে ধরে নিয়ে আসে।"

"আমি পড়েছি। দাস-ব্যবসায়ে ওস্তাদ ছিল সেকালের পর্তুগীজ দস্যুরা!"

ওরা কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠলো জাঁ-র হাঁক শুনে। তাদের মাচা-বাঁধা ঘরের সামনের পাটাতনে দাঁড়িয়ে একটানা একটা হাঁক দিয়ে ওদের ডেকে তুলছে জাঁ। বিপদের আশঙ্কা করে পরমুহূর্তেই দ্রুত ছুটে গেল ওরা ঘরের দিকে।

"কী ব্যাপার!"

জাঁ অঙ্গুলি নির্দেশ করে আকাশের কোণে, বলে, "ঐ দেখ।"

সবিস্ময়ে লক্ষ করে জীওন,—কালো একটা মেঘ আকাশের কোণ থেকে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে ছোট্ট দ্বীপটির দিকে! আতঙ্কে শিউরে উঠে জীওন বলে,—"সাইক্লোন!"

হি-হি ক'রে হেসে ওঠে জঁা, "কাজ খুঁজছিলে না—ঐ তোমার দিকে ছুটে আসছে তোমার কাজ। এবার মুহূর্তেরও অবসর পাবে না।"

খুনী আসামী মোজেস সস্নেহে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, বলে, "কোনো ভয় নেই।"

দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে যায় কালো মেঘে। জঁা কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলে ওঠে,—"শিগ্‌গির ঘরের ভিতরে চলে এসো।"

তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে গিয়ে আগড়টা বন্ধ করে। কথা বলতে গেলে জঁা বলে,—"চুপ চুপ!"

চাপা গলায় জীবন বলে,—"কী সোঁ-সোঁ শব্দ! সাইক্লোন, না টাইফুন?"

মোজেস হেসে বলে,—"সাইক্লোনই বটে। আমি তো এলাম প্রায় এক যুগ পরে এইসব দ্বীপে,—ঐ জঁা-ই তোমাকে এর স্বরূপটা ঠিক বলতে পারবে।"

সোঁ-সোঁ শব্দটা ক্রমশ আরো বাড়ছে,—ঠিক যেন মাথার ওপর এসে পড়েছে ঝড়ের ঝাপট,—কী এক অজ্ঞাত ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে জীওন। নারকেলের পাতা দেওয়া ঘরের দেওয়ালের কাছে ইঙ্গিতে ওদের সরে আসতে বললো জঁা,—পাতাগুলি হাত দিয়ে আস্তে আস্তে একটু ফাঁক করে বললো,—"দেখ। কিন্তু সাবধান, ওরা যেন ঘুণাক্ষরে এখন টের না পায় যে, এই দ্বীপে মানুষ আছে। নেমে পড়লে আর কথা নেই,—কিন্তু নামবার আগে টের পেলেই উড়ে যাবে।"

পাতার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে গিয়ে বিস্ময়ে আনন্দে যেন উন্মাদ হয়ে যায় জীওন!

রাত্রিও প্রায় শেষ, জ্যোৎস্না মরে গিয়ে কেমন একটা পাণ্ডুর অনৈসর্গিক আভায় যেন ভরে গেছে চারদিক,—দূর দিগন্তে উষার আভাস, সারা দ্বীপ জুড়ে রব উঠেছে,—"জাগো-জাগো!……"

এসে পড়েছে অতিথিরা—সাগরপক্ষীর দল!

কী অদ্ভুত! কী অভাবনীয় প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো এই ক্ষুদ্র দ্বীপে! অখ্যাত নির্জন দ্বীপটির যেন ঘুম ভাঙলো! পাহাড়ের যে-দিকেই দু'চোখ যায়,—শুধু সাদা আর কালোর কতগুলি রেখার সমষ্টি! তীরভূমি ছেড়ে সমুদ্রের বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত ঐ সাদা-কালোর রেখা।

জঁা চাপা গলায় বলে,—"কয়েক লক্ষ হবে ওরা সংখ্যায়,—কী বলো?"

ছোরাটা হাতে নিয়ে দোলাতে থাকে মোজেস, টাকামাকা গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে বলে,—"তা হবে।"

ওদের কিন্তু সময় নেই, নারকেলপাতায় আরেকটা বড়ো ছাউনি তৈরি করে

ফেলে ওরা গাছ-গাছালির আড়ালে। এর মধ্যে ওরা আহরিত ডিম রাখবে। কিছু চুবড়িও তৈরি করে ফেলে জঁা ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে।

পাখিরা সারাটা দিন কাটায় সমুদ্রে,—হাঁসের মতো ভেসে ভেসে মাছ শিকার করে, কেউবা উড়ে উড়ে হঠাৎ চিলের মতো সোঁ করে নেমে আসে জলের ওপর, শিকার মুখে করে আবার সটান উঠে যায়। এদেশের বৃদ্ধ শ্রমিকরা বলে,—ওরা নাকি ডানায় ভর করে দিনের পর দিন উড়তে পারে,—ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসে যেতে যেতেই নাকি ওরা ঘুমিয়ে নেয়। ডানা মেলে হাওয়ার স্রোতে ভাসাটা ওদের বিশ্রামও বটে, বিলাসও বটে।

মাঝে মাঝে পাখিরা এসে বসে পাহাড়ের ওপর। যখন কামোন্মত্ত আশ্লেষের প্রহরগুলি পাখিদের কেটে যায় দ্বীপের এধারে-ওধারে,—যখন রতিক্লান্ত পাখির দল এসে বসে পর্বতের চূড়ায়,—তখন অদ্ভুত লাগে ওদের দেখতে। মাথাটা উঁচু করে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। আর আশ্চর্য, যেদিকে বাতাস বয়, সেইদিকে থাকে ওদের মুখ। ওদের লক্ষ করেই জঁা বলে,—"দক্ষিণের বাতাস বইছে আজ, জানো হে? ঐ দেখ পাহাড়ে বসেছে পাখি দক্ষিণদিকে মুখ করে।"

ক্রমে প্রসবের কাল সমাগত হয় পক্ষিণীদের। বালুবেলার যেদিকে তাকাও, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসে আছে ওরা, হাজারে হাজারে,—একটুও ফাঁক নেই। সাদা খাতার ওপর দোয়াতের কালি গড়িয়ে পড়ার মতো রোদে ঝকঝক-করা সমগ্র শুভ্র বালুবেলা কালো হয়ে আছে পাখিদের কালো কালো পিঠ আর কালো ডানার রঙে রঙে। পাখিগুলোর ওপরটা কালো, নিচের দিকে একেবারে সাদা। হঠাৎ একঝাঁক উড়ে গেল তীরভূমি থেকে,—মনে হলো, বিদ্যুৎদীপ্ত একটা শুভ্র রেখা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো মুহূর্তের জন্য!

শুরু হলো কাজ। পাখিরা ওদের ইতিমধ্যে যেন চিনে ফেলেছে—ওদের আর ভ্রূক্ষেপও করে না। পাখিদের কাছাকাছিই ওরা থাকে। যেই ডিম পেড়ে উঠে গেছে সমুদ্রে, অমনি ক্ষিপ্র হাতে ডিমগুলি উঠিয়ে নেয় ওরা।

ডিম চলে যায়, কিন্তু আবার এসে বসে পক্ষিণী। আবার ডিম পাড়ে, ডিম চুরি যায়। এইভাবে একই পক্ষিণী পর পর দিয়ে যায় চারটে পর্যন্ত ডিম। পক্ষিণী সমুদ্রে যায় শিকারে, অমনি তার জায়গাটা নিয়ে নেয় অন্য এক পক্ষী।

এইভাবে কাজ চলে ওদের। কাজের শেষ নেই যেন। ডিম চুরি করা, ডিম যত্ন করে রেখে দেওয়া। নানাবিধ কাজ। অবিশ্রান্ত কাজ করার বেদনায় কোমরটা টন্‌টন্ করে ওঠে এক-একদিন। জঁা ঠিকই বলেছিল,—এ'কাজে তিনজন কেন, তিরিশজনেরও বেশি লোক হলে ভাল হ'তো।

এরই মধ্যে বিশ্রাম খুঁজে নিতে হয়। রাতের বেলা বেলাভূমির দিকে ঘেঁষবার উপায় নেই, টাকামাকা-গাছটার নিচেই ওরা নারকেলপাতার বিছানায় শুয়ে থাকে। শোয় সাধারণত জীওন আর মোজেস। জঁা শুতে যায় ডিমের ঘরে। ঘুমও হবে, পাহারাও হবে।

জীওন বলে,—"পাখিরা না এলে বোধহয় এই একঘেয়ে দ্বীপে আমরা পাগল হয়ে যেতুম, কী বলো মোজেস?"

মোজেস একটা হাত বাড়িয়ে দেয় ওর দিকে, একটা আঙুল প্রসারিত ক'রে বলে, "দেখ।"

"একী, তোমার আঙুলটা অতো ফুলে উঠেছে কেন?"

একটু হেসে মোজেস বলে,—"সে এক কাণ্ড। খপ ক'রে একটা ডিম নিতে গিয়ে গায়ে হাত প'ড়ে গিয়েছিল একটা পাখির। কী নরম ওদের ডানার পালক! কী রকম যেন অদ্ভুত একটা মায়া জাগলো ভিতরে,—হাত বুলোতে লাগলুম ডানায়। আশ্চর্য, পাখিটা কিছু বললো না! সাহস পেলুম আমি,—ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রতে লাগলুম। কিন্তু খুনী মোজেস কতক্ষণ আদর ক'রবে একজনকে! হাতটা অজ্ঞাতসারেই চলে গেল নরম তুলতুলে গলাটার কাছে,—গলায় চাপ পড়তেই চিৎকার ক'রে উঠলো পাখিটা, ঠোঁট বাঁকিয়ে কামড়ে দিলো আঙুল।"

অবাক হ'য়ে শুনছিল জীওন। বললো, "তারপর!"

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে পার ক'রে দিলো মোজেস, বললো,—"পাখিদের মধ্যে একটা কানাকানি প'ড়ে গেছে, আমাকে ওরা বিশ্বাস ক'রছে না ভাই,—সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছে। চোখের ওপরে ওদের ঐ সাদা দাগ! ঠোঁট ফিরিয়ে এমনভাবে তাকায়, মনে হয় যেন ভ্রূকুটি ক'রে আছে।"

শেষের দিকে কেমন যেন কান্নাভরা শোনায় মোজেসের কণ্ঠস্বর। বলে,—"আমি শ্রমিকদের শত্রু, আমি খুনী। কিন্তু কে আমাকে তৈরি করলো খুনী?"

এতদিন একসঙ্গে থাকার ফলে মোজেসকে অনেকটা চিনতে পেরেছে জীওন, বললো—"ম্যানেজার?"

উত্তেজনাতেই যেন উঠে বসলো মোজেস, বললো,—"ম্যানেজারের একটা রাঙা টুকটুকে বউ আছে জানো?"

"শুনেছি তার রূপের খ্যাতি?"

"রূপের খ্যাতিই শুনেছো কেবল, আর কিছু নয়? ম্যানেজার প্রৌঢ়—তার ওপরে সাদা-কালোর মিশ্রণ,—রক্তেও বটে রঙেও বটে। এহেন লোকের তরুণী

বউ,—লোকটা কী বলবো, একেবারে চোখেঠুলি-পরা ভেড়া হ'য়ে আছে। আমাদের আসল মালিক ঐ ম্যানেজার নয়—তার ঐ রাঙা টুকটুকে মেমসাহেব।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে জীওন বলে,—"তারপর !"

তার পরের কথাটাও শুনতে চাও? তবে শোনো। রূপের আগুনে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিলাম একদিন।

"বলো কী? ম্যানেজারের বউ…"

"হ্যাঁ ভাই। সে এক অন্ধকারের কাহিনী। মেয়েটার বিচিত্র লীলার মধ্যে ডুবে গিয়ে বুঝলুম, বুড়ো ম্যানেজার চোখে ঠুলি পড়লো কেমন ক'রে। আফিং খাওয়া বাঘের মতো ও যা বলায় তাই করি, ও যা করায় তাই করি। মানবদেহ ও মনের এ এক অদ্ভুত দিক, তুমি ছেলেমানুষ, হয়তো বুঝবে না।"

"তা হোক, তুমি বলো।"

টাকামাকা গাছটায় মৃদুমৃদু বাতাস লেগে যেন পাতায় পাতায় ডালে ডালে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস জাগে, মোজেস বলে যায়,—"একদিন বউটি আমায় বললো একটা লোকের কথা। বলা বাহুল্য, লোকটা শ্রমিক। বলতে বলতে তার চোখের কোণে ফুটে উঠলো মুক্তার মত অশ্রু, বললে,—'জোর করে আমার ওপর অত্যাচার ক'রেছে ও।'……আর কী শুনতে চাও জীওন? রাতের অন্ধকারে উদ্যত হ'য়ে উঠলো আমার ছোবাখানা।……এইভাবে, ভাই এইভাবে আমি খুনী হ'য়ে উঠলুম, হয়ে উঠলুম শ্রমিক-দলের কাছে বিশ্বাসঘাতক।"

কাজ কিন্তু চলে যথানিয়মে। ক্রমে ক্রমে প'ড়ে যায় জুলাই মাস। বন্ধ ক'রে দেয় ওরা ডিম তোলা। সরকারি নিষেধ। চালার পর চালা কিন্তু ততদিনে গড়ে উঠেছে ওদের,—সব ডিমের ঘর। থরে থরে সাজানো প্রচুর ডিম। হাঁসের ডিমের মতোই দেখতে।

অসম্ভব খাটতে পারে জঁা,—আর মনের আনন্দেই সে খাটে। সে খাটে বলেই এরা একটু বিশ্রাম পায়। মাঝে মাঝে সাংঘাতিক একটা হাঁপানির কষ্ট এসে পরিসর বক্ষ-দেশটাকে মোচড় দেয় মোজেসের,—নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। ভয় পেয়ে জঁা-কে ডাকে জীওন, জঁা এসে হাত বুলিয়ে দেয় ওর বুকে,—কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় না। ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই,—এ প্রাণঘাতী কষ্টের উপশমই বা হবে কী করে! কয়েকটা ঘণ্টা রীতিমত রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পর একটু আরাম পায় মোজেস। জঁা বলে,—"বয়স হ'য়েছে, এত বেশি খাটা তোমার উচিত নয়।"

মোজেসের বুকটা তখন যেন উঠতে-নামতে থাকে হাপরের মতো। বলে,—"পাপের ফল। সবই আমার পাপের ফল!"

পাখিদের মধ্যে তখন পড়ে গেছে নতুন সাড়া। সারি সারি সব বসে গেছে পাশাপাশি বালুবেলার ওপরে। ডিম দেবার পরও বসার বিরাম নেই। এইবার ডিম চুরি যায় নি,—তাই মা-পাখি, বাপ-পাখি, উভয়েরই মমতা পড়ে ডিমের ওপরে। সকালে বাপ যখন সমুদ্রে শিকারে ব্যস্ত,—মা তখন তা' দেয় ডিমের ওপরে ব'সে। বিকেলে বাপ এসে বসে ডিমের ওপরে, মা যায় সমুদ্রে। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য ওদের কাছে! পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এ দৃশ্য যদি তোমরা দেখ, মনে হবে, অপূর্ব শৃঙ্খলায় সারির পর সারি দিয়ে কুচকাওয়াজ করছে বিপুল সৈন্যবাহিনী! যুগ-যুগান্তর ধরে প্রাণস্রোতকে অব্যাহত রাখবার প্রাণপণ সংগ্রাম ক'রে যাবার অক্ষৌহিনী সেনা।

মায়েরা ডাকে, বাপেরা ডাকে, "জাগো-জাগো!" মনে হয় যেন সেই ডাক শুনেই একদিন পৃথিবীর আলোয় এসে উত্তীর্ণ হয় নতুন সৈন্যদল। ডিম ফুটে একদিন বেরিয়ে আসে। এ চাঞ্চল্যের তুলনা নেই। মায়েরা-বাপেরা সবাই ব্যস্ত ঠোঁটে ক'রে খাবার নিয়ে আসতে শিশুদের জন্য! শিশুরা ধীরে ধীরে বড় হয়, কচি কচি ঠোঁট নেড়ে ওরাও যেন বলতে চায়—"জাগো-জাগো!"

অদ্ভুত এক আবেগে এদিকে চঞ্চল হয়ে ওঠে মোজেস,—জীওনকে জড়িয়ে ধরে কী এক নিবিড় আনন্দে, বলে,—"মোজেস মরবে,—মুসা বলে এক নতুন লোক এবার ফিরে যাবে দ্বীপে। ঘর বাঁধবে, গান গাইবে, বিকেলের দিকে যখন নীল হয়ে যাবে ভারতমহাসাগর, তখন নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়বে মনের আনন্দে,—ফিরে আসবে সন্ধ্যায় পাখিদের মতো তার ছোট্ট কুলায়টিতে!"

"জীওনকে কী তখন ভুলে যাবে বন্ধু?"

মোজেস হেসে ওঠে। বলে,—"জীওন নয়, তুমি জীবন। লাইফ! তোমাকে কী করে ভুলবো ভাই!"

তীব্র আনন্দের সুধা পান করে যেন জড়িয়ে যায় মোজেসের কণ্ঠস্বর। বলে,— "বিয়ে করবে মুসা দ্বীপে গিয়ে। কাকে বিয়ে করবে বলো তো?"

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বলে,—"যে কোনো শ্রমিক মেয়েকে। খুব লাজুক-লাজুক হবে তার স্বভাব। কথা কইবে কম,—আমাকে দেখে পাতলা ঠোঁটদুটি টিপে সে হাসবে মিটিমিটি। যখন ঝড় বইবে সমুদ্রে, প্রবল বৃষ্টি নামবে, বজ্রপাত হবে মুহুর্মুহুঃ—ভয় পেয়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরবে ভীরু কোমল তরুলতিকার মতো।

জী শুনতে পেয়ে হেসে বলে,—"অর্থাৎ রাজকন্যা চাইছো একটি! ও'রকম মিষ্টি মেয়ে খুঁজছো তুমি এইসব দ্বীপে? দারিদ্র্য সব নষ্ট করেছে হে, মেয়েদের সমস্ত কোমলতা আর মাধুর্য শুষে নিয়েছে।"

অবাক্ হয়ে জাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো মোজেস। ঠিক কথাই ব'লেছে ও। কিন্তু কী-সব ভাবতো সে এতদিন জাঁ-র সম্পর্কে? ও-ও ভাবে, ওরও চোখ আছে!······সমস্ত উচ্ছ্বাস ওদের ডুবে যায় একটা অস্বাভাবিক নীরবতার মধ্যে। শুধু মাঝে মাঝে নিশীথের স্তব্ধতা ভেঙে ডেকে ওঠে দুটো-একটা পক্ষীশাবক!

শাবকেরা ক্রমশঃ বড়ো হয়। পক্ষিকূলের আরেক লীলা। ছোটদের উড়তে শেখায় বাপ-মায়েরা। ঠেলে দেয় সমুদ্রের দিকে, শিশুকে মধ্যে নিয়ে দুপাশে ওড়ে মা আর বাপ,—ঐভাবে কিছুদূর উড়ে যায়, আবার ফিরে আসে। ক্রমশ পরিধি বিস্তৃত হয় ওড়বার। ডানায় আসে জোর! শিশু শিশুত্ব উত্তীর্ণ হয়ে যায় একদিন।

দুটি মুগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে মোজেস আর জীওন। দেখে দেখে কেমন যেন চুপচাপ হ'য়ে গেছে মোজেস। কথা বলে কম, ভাবে বেশি, চোখে-মুখে একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা উপচে পড়ছে যেন!

জীওন বলে,—"কী অতো ভাবছো, মোজেস?"

"ভাবছি?" মোজেস বলে,—"পাখি যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে বসে, দেখেছো ওকে লক্ষ করে? নিচের দিকে যখন তাকায় মনে হয়, ভ্রূকুটি করছে, যেন বিরক্তি আর অসন্তোষে ভরা। কিন্তু যখন ঠোঁট উঁচু ক'রে তাকায় ওপরে আকাশের দিকে, তখন কী মনে হয়, বলো তো?······জীবনের ঊর্ধ্বে একটি কী যেন উদ্দেশ পেয়েছে সে। পেয়েছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অমৃতের সন্ধান!"

চুপ ক'রে থাকে জীওন, এক সময় বলে,—"এবার ত ওরা উড়ে যাবে?"

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস। মোজেস বলে,—"হ্যাঁ, এবার যাবে। আকাশও পরিষ্কার। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ওরা দেখেও নিয়েছে বাতাসের গতি কোন্ দিকে। হ্যাঁ, ভালো কথা, একটা বুড়ো পাখিকে তুমি লক্ষ ক'রেছো?"

"বুড়ো পাখি?"

"হ্যাঁ। পাহাড়েই সময়টা কাটাতো বেশি। ইদানীং তাকে আমি বড্ড বেশি লক্ষ ক'রছিলাম জীবন। সবাই যখন ডিম অথবা শিশু নিয়ে ব্যস্ত,—ও তখন একা ব'সে আছে চুপচাপ। কখনো এক পায়ে দাঁড়িয়ে, কখনো বা ঘাড় বেঁকিয়ে ঠোঁটদুটো পালকের মধ্যে গুঁজে।······ও যখন বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতো, মনে হতো, যেন মন্থর ওর গতি। যেন ঘুরে ঘুরে ওদের সব কিছু তদারক ক'রে বেড়াচ্ছে।"

সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে জীওন তাকায় ওদের দিকে, বলে—"বাঃ! তোমার চোখ আছে তো!"

"ছাই চোখ !"—মোজেস বলে,—"চোখ থাকলে আরও অনেক কিছু হয়তো দেখতে পেতাম !"

আবার কেটে যায় কয়েকটা নীরব মুহূর্ত।

মোজেস বলে,—"জীবন, কী মনে হয় জানো? পাখিদের মধ্যে এতদিন থেকে থেকে যেন নিজেও পাখি হ'য়ে গেছি!"

জীওন প্রশ্ন করে,—"ওরা কোথায় উড়ে যাবে, বলো তো !"

চমক ভেঙে জঁা হঠাৎ এইবার কথা ক'য়ে ওঠে, বলে,—"আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা অথবা এডেনের দিকে।"

ধমকের স্বরে ব'লে ওঠে মোজেস, "খুব জানো তুমি !"

তারপরে সজোরে চেপে ধরে জীওনের হাত, উত্তেজনায় কাঁপছে তার কণ্ঠস্বর, বলে,—"জীবন, তুমি আর আমি ভারতের লোক। জানো, ওরা কোথায় যায়? ……মানস-সরোবরের দিকে। মানস-সরোবরের হংস বলে ওদেরই। অবগাহন করে ওরে সেই অমৃত-সরোবরে। এক ঝাঁক পরীর মতো ওদের আবির্ভাব হয় হিমালয়ের স্বর্গরাজ্যে !"

শীঘ্রই উড়ে যায় ওরা এক রাত্রিশেষের ব্রাহ্ম-মুহূর্তে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওভারসিয়ারের জাহাজ। ছোট-ছোট বহু বোট্ এসে ভিড়েছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে। তোলা হচ্ছে ডিম, ওরা ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে।

এমন দিনেই ডানা মেল্‌লো ওরা। ঝাঁকে ঝাঁকে—লাখে-লাখে। আকাশটা কালো হয়ে গেল। সেই উষার আবির্ভাব-মুহূর্তে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে এ' দৃশ্য দেখতে দেখতে যেন উন্মাদ হয়ে গেল মোজেস। হাত দুটো মাথার ওপর তুলে শুধুই বল্‌তে লাগলো,—"মানস-সরোবর…মানস-সরোবর !"

পাখিরা চ'লে যাচ্ছে। সার বেঁধে একরাশ সাদা ফুলের মালা গেঁথে ছড়িয়ে দিয়েছে কে যেন আকাশে। তার ওপরে এসে পড়েছে প্রথম সূর্যের রক্তিম আভা। এক অব্যক্ত আশীর্বাণী যেন উচ্চারিত হ'চ্ছে গানের মতো আকাশে-বাতাসে,—"শুভ হোক, শিব হোক তোমাদের পথ !"

অবশেষে পাখিদের শেষ সারিটিও ছাড়িয়ে যাচ্ছে দ্বীপের সীমানা। হঠাৎ কী যেন হ'লো, সারির পিছনে উড়ছিল যে পাখিটা একা, সে হঠাৎ কেমন-যেন ডানা ঘুরে টলতে টলতে এসে প'ড়ে গেল দ্বীপের কিনারে !

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা। একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে মোজেস ছুটে গেল তার দিকে। আর কিছুই হ'লো না। অক্ষৌহিণী বাহিনী তেমনি

উড়ে চললো একটা ছন্দকে রূপায়িত ক'রে। কে প'ড়ে রইলো পিছনে, সে দেখবার অবকাশ কই ওদের ?

কিন্তু এদের মধ্যে যে ঘটনা ঘটলো, তা মর্মান্তিক। সবাই গিয়ে উঠলো জাহাজে, শুধু গেল না মোজেস। মূর্ছিত, আহত পাখিটিকে বুকে ক'রে জল দিচ্ছে সে তার মুখে, কিছুতেই সে আসবে না। এলোও না,—'মোজেস' 'মোজেস'ই থেকে গেল, 'মুসা' হয়ে আর ফিরে এলো না।

তাদের দ্বীপে ফিরে এসে সবাই ক্রমে ক্রমে ভুলে গেল তার কথা, ভুললো না শুধু জীওন। একদিন দু'দিন করে এক মাস কেটে গেল,—অস্থিরতায় ছটফট করতে লাগলো জীওন। না, যেমন করে হোক, ফিরিয়ে আনতেই হবে মোজেসকে। ও দ্বীপে কিচ্ছু নেই। কী খেয়ে জীবনধারণ করবে ও ?

জাঁ হেসে বললো,—"খাবারের অভাব! হাতে ছোরা আছে, দ্বীপে কচ্ছপ আছে, খাবারের অভাব কী ?"

"না। তবু আমাকে যেতে হবে। ও দ্বীপে গুয়ানো তোলা হবে না ?"

"না। অন্য দ্বীপে যাবার হুকুম হয়েছে।"

ম্যানেজারের হাতে-পায়ে ধরে গিয়ে জীওন। জাহাজটা একবারের জন্য যেন থামে ঐ দ্বীপে !···

ম্যানেজার উত্তরে ওর বুকে বসিয়ে দেয় বুটের লাথি, তার রাঙা টুকেটুকে বউটি পৈশাচিক আনন্দে হেসে ওঠে খিলখিল করে !

শেষ পর্যন্ত রাজী করা গেল ওভারসিয়ারকে, জাহাজে উঠে। কিন্তু দেড় মাস পরে দ্বীপে নেমে কাকে গিয়ে দেখলো জীওন ?

সেই টাকামাকা গাছ। তার নিচে পড়ে আছে এক কঙ্কালসার দেহ। সমস্ত শরীর নিস্পন্দ, শুধু নড়ছে ঠোঁট, আর পলক পড়ছে চোখের। এলানো ডান হাতটার কাছে পড়ে আছে ছোরা, আর সেই ডায়েরিখানা। ছোরাটা মরচে ধরা। ডায়েরির সমস্ত পাতাই ছিঁড়ে ফেলা, শুধু শেষ পাতাটায় পেনসিলের আঁকিবুকি, চেষ্টা করে একটু একটু পড়া যায়······

······"পাখিটা মারা গেল।···খাওয়া নেই! খাওয়া-খাওয়া করে হন্যে হয়ে গেলাম। একটা কাছিমকে মারতে গেলাম ছোরাখানা হাতে নিয়ে। সে এমন অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকালো যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না,—আমি তাকে মারতে পারি।···আর কাকে মারবো ? যাকে মারতে যাই, সে-ই অবাক

হয়ে তাকায় !…সমুদ্রের গান…টাকামাকার দীর্ঘশ্বাস !…নারকেল পেড়ে কিছুদিন চালালাম !…কিন্তু পরে তা-ও পারলাম না। শক্তি হারালাম।…যেদিকে তাকাই, দেখি, অদ্ভুত প্রাণস্পন্দন ! সবাই বলছে,—'মেরো না—মেরো না—বাঁচতে দাও ! আলো দেখবার অধিকার যেমন তোমার আছে, আমাদেরও আছে !'…

কী করি ? একটা পোকার মধ্যেও যেন দেখতে পাচ্ছি প্রাণের লীলা ! …কী হলো আমার ? পাগল হয়ে যাবো ?…

সর্বত্রই একটা প্রাণ, একটা গতি !…বাতাস এসে গাছের পাতায় পাতায় দোল দিয়ে যায়, সমুদ্র তীরভূমিকে নাড়া দিয়ে যায়, বলে,—জাগো-জাগো !…

মানস-সরোবর… !

প্রবাল-বলয়

আমাদের হৃদয়ে অনুভূতির একটা ক্ষেত্র আছে, যাকে সেই আমার দেখে-আসা নিস্তরঙ্গ নীল গভীর লেগুন বা সামুদ্রিক উপহ্রদটির সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে। কী নীল, কী স্তব্ধ, কী প্রশান্ত! ভিন্নমুখী চিন্তার স্রোতে ভিতরটা এলোমেলো, কিন্তু বাইরে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই! নীল-নীল হ্রদটিকে চারিদিক দিয়ে বলয়ের মতো বেষ্টন ক'রে আছে একটি বলয়াকার দ্বীপ,—অন্তরের অবচেতন স্তরে মধুর কামনাকে যেমন ঘিরে থাকে সচেতনার নীতিনিষ্ঠ কঠিন প্রাচীর! প্রাচীরের বাইরে বাস্তব জীবনের ঢেউ এসে বারবার আছড়ে পড়ে, দুর্বোধ্য মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে অস্থির! প্রবাল-স্তরের পর স্তর জমে স্বাভাবিক নিয়মেই গঠিত হ'য়েছে সেই বলয়াকৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপটি,—ভিতরে তার স্তব্ধ প্রশান্ত হ্রদ,—বাইরে অন্তহীন উধাও সমুদ্রের হাহাকার!

কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন নগণ্য ক্ষুদ্র দ্বীপটির কথা বলতে হলে মূল দ্বীপপুঞ্জটির কথা বলা উচিত সবার আগে। মূল দ্বীপগুলিকে ভারতমহাসাগরের মণি-মাণিক্য বলা হয়ে থাকে। যাঁরা আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করবেন, তাঁদের পক্ষে এ দ্বীপগুলি অবশ্য মহার্ঘ মণি-মানিক, কিন্তু জনৈক ভারতীয় ব্যবসায়ীর বিশিষ্ট কর্মচারী হয়েও আমার কাছে এ দ্বীপগুলি ভিন্ন এক রূপে দিন দিন প্রতিভাত হচ্ছে; যত কেটে যাচ্ছে দিন, ততই মনে হচ্ছে, মণিই যদি হয় তো এরা বিষধর হিংস্র সর্পকুলের মাথার মণি! এই অতিপ্রাকৃত রূপ যাদের চোখে পড়েছে, তাদের কাছে এদের সম্মোহনের কোনো তুলনা নেই।

একটা আদিম উদ্দাম হিংস্রতা যেন জেগে আছে এই দ্বীপগুলির ঘন-বিস্তৃত অরণ্যে অথবা পাহাড়-চূড়ায় অথবা বলয়াকার দ্বীপ দিয়ে বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নীল হ্রদগুলির তীরে তীরে!

ছোট-বড়ো নয়-দশটি দ্বীপ নিয়ে এই আমিরাণ্টে বা আল্‌মিরান্তে দ্বীপপুঞ্জ। সভ্যতার সামান্য স্পর্শটুকুও ফেলে এসেছে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে মাহে-সিসেল্‌সে। সিসেল্‌স্-সরকারেরই অধীন এই দ্বীপগুলি র'য়েছে মাহে-সিসেল্‌সের দক্ষিণ-পশ্চিমে। কয়েকটিতে সম্প্রতি বসতি হয়েছে, তা-ও বিরল বসতি। অধিকাংশ দ্বীপগুলিতে মাঝে মাঝে নৌকা আসে সিসেল্‌স্ থেকে, সেইটুকুই সভ্যতার স্পর্শ, সেইটুকুই সভ্য-জগতের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ!

আমি যে বলয়াকৃতি দ্বীপটির কথা বলতে ব'সেছি, তার একটা বৈশিষ্ট্য আছে বৈচিত্র্য আছে। প্রথমত দ্বীপটি অতিশয় ক্ষুদ্র, মধ্যবর্তী হ্রদটি ততোধিক ক্ষুদ্র। সমুদ্রের তীর দিয়ে দিয়ে ঘুরে দ্বীপটিকে প্রদক্ষিণ করতে ঘণ্টাখানেকের বেশি, লাগবে না। কিন্তু ওই ছোট্ট দ্বীপটিকে প্রকৃতি যা দিয়েছেন, তা অতুলনীয়! একদিকে বালুকাবেলার যেমন বিস্তৃতি আছে, যেমন আছে অসংখ্য নারকেল-কুঞ্জ, অন্যদিকে তেমনি আছে লতাগুল্মে-ঘেরা শ্যামলিমার আভাস। যেদিকে লতা পাতার বিস্তার, সেদিকে মাথা উঁচু ক'রে হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট পাহাড়। এই পাহাড়টাই এ দ্বীপের সব থেকে সৌন্দর্যের আকর এবং ভূতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে একটা বিস্ময়ও বটে। প্রবালদ্বীপে এ ধরনের প্রস্তরের স্তূপ সাধারণত দেখা যায় না! আমার মনে হয়, ঐ প্রকাণ্ড পাথরটাই এই বলয়াকৃতি দ্বীপটির আদিম সৃষ্টি। ডুবো পাহাড়ের হয়ত কোন চূড়া নৈসর্গিক বিপর্যয়ে একদিন অনন্ত সমুদ্রের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তাকে ঘিরে ক্রমে ক্রমে জমলো প্রবালের দল, ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো এই দ্বীপ!

ত্রিকোণাকার প্রস্তরস্তূপটিকে লতাগুল্ম আজ ছেয়ে ফেলেছে, শুধু তীক্ষ্ণ শিখরদেশ মহেশের ধ্যানমগ্ন মুখখানির মতো নির্মল, জ্যোতির্ময়। আরও একটা জায়গায় এই উজ্জ্বল নির্মলতা বিরাজমান, যেখানে স্তূপটির পাদদেশের কাছে একটা প্রকাণ্ড শিলা নীল হ্রদটির উপরে ঝুঁকে পড়েছে, যেন দেখছে নিজের ছায়া যুগ-যুগান্তর ধ'রে। যখন আকাশে চাঁদ ওঠে,—যখন স্তূপটির চূড়ায় আর ঐ ঝুঁকে পড়া নির্মল শিলাটির উপর হীরার মতো ঠিক্‌রে পড়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না,—যখন তারই প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে হ্রদ,—আর মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলতে থাকে অরণ্য,—তখন সব মিলিয়ে যে অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করে,—তা' বর্ণনা করা অসম্ভব। তখন মুহূর্তের জন্য ভুলে যাই আমার বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা, মুহূর্তের জন্যই মনে পড়ে,—আমি ভারতের এক মারাঠী ব্রাহ্মণপরিবারের ছেলে,—শৈব। আমাদের গ্রামের সেই ছোট্ট শিব মন্দিরটির কথা মনে পড়ে, মায়ের ঠাকুরঘরে সাজানো সেই মহাদেবের আবক্ষ-মূর্তিটির কথা মনে পড়ে। শিরে চন্দ্রকলা, গলায় জড়ানো বলয়ের মতো একটা সাপ,—মুখখানি কী অপরূপ শান্ত, স্নিগ্ধ, কমনীয়! শিল্পকলার দিক থেকেও প্রণাম জানানো যায় মূর্তিটিকে।

আজও চারদিক উদ্ভাসিত অবারিত জ্যোৎস্নায়। সমুদ্রও আজ শান্ত, সর্বত্র একটা অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে এই নিশীথ রাত্রে। শুধু বলয়াকৃতি দ্বীপটি থেকে মাঝে মাঝে ডানা মেলে সমুদ্রের দিকে কিছুটা উড়ে আসছে দুটি-একটি শুভ্র সাগরপক্ষী, কেউ-কেউ ডেকেও উঠছে ভোর হয়েছে মনে করে, পরমুহূর্তেই

যেন ভুল বুঝতে পেরে নীরব হয়ে যাচ্ছে, যারা সমুদ্রের দিকে উড়ে এসেছিল, তারাও ফিরে যাবে দ্বীপে।

আমার ছোট্ট মোটর-বোটটি শুধু জলরেখা এঁকে এঁকে এগিয়ে চলেছে একঘেয়ে একটানা শব্দ ক'রে। আমার নিগ্রো সঙ্গী দুটির একজন ইঞ্জিন নিয়ে ব্যস্ত—অপরজন আপন মনে গান ধরেছে উধাও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। ওর গানের সুরও একঘেয়ে—একটানা ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে মিশে-যাওয়া।

শেষ হ'য়ে গেছে আমার দশদিনের স্বেচ্ছাচারিতা,—দশদিনের ছুটি-নেওয়া সভ্যজগত থেকে,—ফিরে চলেছি মাইল তিন-চার দূরের আলফোঁসে দ্বীপে। আলফোঁসে দ্বীপে বসতি আছে,—ওখানেই ব্যবসায়-সূত্রে আমাকে আসতে হয়েছিল সিসেল্‌স্ থেকে মনিবের নির্দেশে। কাজ করেছি যথারীতি, শুধু এই দশটা দিনের হিসাব দিতে পারবো না ব্যবসায়ীর কাছে। এই দশটা দিন শুধু আমারই হ'যে থাক,—যদি এর হিসাব সত্যিই দিতে হয় তো দেবো হৃদয়ের ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদের কাছে,—আমদানী-রপ্তানির স্থূল ব্যবসায়ীর কাছে নয়!

কিন্তু লিসার কাছে এই দশটা দিনের কথা কতটুকু বলবো? হাসিই এসে পড়ে ঠোঁটের কোণে,—বলার দরকারই বা কী? যে দশটা দিন ঐ বলয়াকৃতি নাম-না-জানা দ্বীপটিতে তাঁবুর মধ্যে কাটিয়েছি—আমার নিগ্রো সঙ্গী দু'টি দিনমানে বোট নিয়ে সমুদ্রে ঘোরাফেরা করেছে মাছের আশায়, খাবার-দাবার, চিঠিপত্র প্রভৃতি নিয়ে আসতে গেছে রোজ তিন-চার-মাইল দূরের আলফোঁসে দ্বীপ থেকে। চিঠিপত্র আমি একটাও খুলিনি এই দশদিন। শুধু লক্ষ করেছিলাম, দেশ থেকে চিঠি এসেছে একটা, মায়ের চিঠি। আর আছে মাত্র একটি নীল খাম, লিসার চিঠি।

এ চিঠিটাও খুলিনি। খুলবো, সবই খুলবো; একেবারে আলফোঁসেতে জাহাজে উঠে,—সিসেল্‌সে ফিরে যাবার পথে।

লিসাকে বিয়ে ক'রেছিলাম নিতান্ত খেয়ালের বশে প্রায় মাস ছয়েক আগে। জানি, খেয়ালের বশেই একদিন বিচ্ছেদ টেনে দেবো এই সম্পর্কে। খেয়ালের বশে লিসাও ছেড়ে যাতে পারে আমাকে যে-কোনো মুহূর্তে। সিসেল্‌সে বিয়ের স্বরূপই এই! মেয়ের সংখ্যাও যেমন বেশি, বিবাহ অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদও তেমনি ঘন ঘন,—সংখ্যায়ও প্রচুর। হয়তো ঐ নীল খাম, ওটা বিবাহ-বিচ্ছেদেরই বিজ্ঞপ্তি, কে বলতে পারে? এ দেশে বিবাহ বা বিচ্ছেদ, কোনটাই কঠিন নয়। কঠিন বোধ হয় বলয়দ্বীপের নিস্তরঙ্গ নীল গভীর হ্রদটির মতো গভীরতম ভালোবাসার আনন্দে মগ্ন হয়ে যাওয়া!

লিসাদের দোষ নয়। আমি বোম্বাইয়ের মতো অট্টালিকা-ঘেরা মহানগরীতে

মানুষ হয়েছি, আমি জানি,—দোষ কার, কোন্ অবস্থার! এই দ্বীপপুঞ্জের প্রকৃতির এই উদ্দাম অবারিত আদিমতার মধ্যেও মানুষ একটি কৃত্রিম সমাজ তৈরি ক'রে নিয়েছে, তৈরি করেছে সিসেল্‌সে ভিক্টোরিয়ার মতো বন্দর,—সেই ক্লাব, সেই বল-নাচ, সেই পানীয়ের স্রোত! যদি সুয়েজখাল না খনন করা হ'তো, ইয়োরোপকে আসতে হ'তো এশিয়ায় আফ্রিকার পাদদেশ ছুঁয়ে সেই আগেকার মতো,—তা'হলে সিসেল্‌সের বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মূল্য বেড়ে যেতো প্রচুর, ভিক্টোরিয়াও বোম্বাইয়ের মতো পরিণত হতো বিরাট মহানগরীতে।

ভিক্টোরিয়া আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও দ্বীপপুঞ্জের প্রকৃতিদুলালদের বাঁধা হ'য়েছে যথারীতি সোলার হাল্‌কা টুপি আর টাইয়ের ফাঁস দিয়ে। বণিক আর পুরোহিত এসেছে একই সঙ্গে। সহজাত প্রাকৃতিক জীবনের উল্লাস থেকে যেন বিচ্ছিন্ন ক'রে এনে সভ্যতা-নামের এক কাল্পনিক অনুশাসন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে মানুষগুলিকে। জীবনের সহজ স্রোতকে ব্যাহত ক'রে সেই স্রোতশক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে এক বাণিজ্যিক চক্রকে চলমান রাখতে। মোটর বোটে যেতে যেতে আমার বার বার আজ এই কথাগুলিই নাড়া দিচ্ছে মনকে। দশ-দিনের অজ্ঞাতবাসে থেকে আমি যা' দেখেছি, পেয়েছি, ভেবেছি,—তা আমার জীবনের ধারাকে বোধ হয় আমূল পরিবর্তনের স্রোতে এবার ভাসিয়ে দেবে! দু'বছরেরও বেশি বোধ হয় হয়ে গেল আমি দেশ ছেড়েছি,—একখানাও চিঠি দিইনি বাড়িতে,—অথচ, প্রতি মেল-এ আমার মায়ের চিঠি আসার বিরাম নেই।

জাঞ্জিবারে আমার এক জ্ঞাতিভাই থাকেন, চাকরির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে অবশেষে তাঁর দ্বারস্থ হই,—তাঁরই চেষ্টায় ও সুপারিশে আমার এই সিসেল্‌স দ্বীপের চাকরি।

কিন্তু যাক সে কথা। লিসার প্রতি কেমন ক'রে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লাম অথবা ও-ই বা কখন আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো,—সেসব না বললেও চল্‌বে। নৈশ ক্লাববিহারিণী লাস্যময়ী সিসেল্‌সের সাধারণ মেয়েদের মতোই একটি মেয়ে ও। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ওর প্রাণপ্রাচুর্য। ওর থেকে সুন্দরী, ওর থেকে নৃত্য-গীত-পটিয়সী বহু মেয়ে আমি বোম্বাইয়ে দেখেছি, কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে দেখেছি, কিন্তু যেটা ওর সম্পদ,—সেটা হচ্ছে ওর চরিত্রের প্রাণচাঞ্চল্যের দিক,—মাদকতাময় একটা অদ্ভুত বন্যতার দিক।

সম্ভবত এটাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি। ও যখন হ'য়ে ওঠে হাস্যে-লাস্যে উদ্দাম, খামখেয়ালীতে গহন অরণ্যের মতোই রহস্যময়ী,—তখন আমার মধ্যেও দাপাদাপি করতে থাকে এক মুক্ত অরণ্যচারী!

আমাদের বিয়ের প্রথম রাত্রির কথাই বলছি। রাত অনেক হয়েছে তবু আমার বাংলোবাড়ির হলঘরে উল্লাসের বিরাম নেই,—অভ্যাগত বন্ধু-বান্ধবীদের সাহচর্যে নৃত্য-গীত পানীয়ের স্রোত ব'য়ে চলেছে! ওদের অলক্ষে হঠাৎ এক সময় বাইরে এসে দাঁড়ালাম নির্জন অন্ধকার বারান্দাটার এক কোণে। আমার খেয়ালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এটা-ই। মত্ততার উচ্চচূড়ে উঠে হঠাৎ-ই সবকিছুর ওপর যতি টেনে দেওয়া। আমার মনটা তখন কেমন যেন গুমরে-গুমরে কাঁদতে থাকে,—যেন এই সুসজ্জিত টাই-পরা দেহের প্রাচীর ভেঙে মনটা উড়ে যেতে চায় ঐ অরণ্যের মধ্যে, পাহাড়ের পথে অথবা সমুদ্রের তীরে!

লিসা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাসির উচ্ছ্বাসে, নাচের শ্রমে, নেশার জড়তায় ওর দেহটা কাঁপছে, মুখখানায় ক্লান্তির ছায়া নামলেও উত্তেজনায় উত্তপ্ত। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'কতো হুইস্কি তুমি খেতে পারো! আমি বেশ কিছুদূরে যেতে পারি, তুমি আমাকে ছাডিয়ে যাও দেখি আজ?'

উত্তরে ওকে শান্ত করতে করতে হয়ত ভালবাসার কথাই কিছু বলে থাকবো,—ও হঠাৎ বাধা দিয়ে বললো, 'ভালবাসাও একটা নেশা, তা' জানো? জোরালো হুইস্কিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে!'

বিয়ের প্রথম রাত্রি। সন্ধ্যায় থেমে গিয়ে মধ্যরাত্রে আবার বইছে সমুদ্রের হাওয়া, মনেরও একটা বিহ্বল অবস্থা। বলেছিলাম, 'ভালোবাসা! এর আগে ভালোবেসেছো কখনো কাউকে?'

হেসে উঠেছিলো লিসা, যেন এক শিশুকে আদর করছে, এমনিভাবে আমার মুখখানা দুহাতে ধ'রে হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'মিস্টার ইণ্ডিয়ান, তুমি কি জানো না, তুমি আমার তৃতীয় স্বামী?'

'জানি।'

'তবে?'

বললাম, 'জানবার পরই ত জিজ্ঞাসা করছি ভালবাসার কথা।'

লিসা আবার হেসে উঠলো, বললো, 'মদের নেশা কতক্ষণ থাকে?'

'তুমিই সেটা ভালো বলতে পারবে।'

হঠাৎ হাসিটা রূপান্তরিত হয়ে গেল কান্নায়, আমার বুকে মুখ রেখে লিসা বললো, 'মিস্টার ইণ্ডিয়ান, নেশায় চিরকাল আচ্ছন্ন থাকবো, এমন কোনো জোরালো নেশার কথা বলতে পারো আমাকে? যা আজীবন টিঁকে থাকবে, মুহূর্তের জন্যও কেটে যাবে না?

'একথা আমাকেই জিজ্ঞাসা করলে শেষ পর্যন্ত বেছে বেছে?

'হ্যাঁ। তোমাকেই। তুমি ভারতীয় যে।'

একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কী রকম?'

লিসা মৃদু ধীর কণ্ঠে বললো, 'শুনেছি ভারতের কথা। তোমাদের ভালোবাসা নাকি গভীর, তোমাদের ভালবাসার ধরনই নাকি আলাদা'!

এইবার হাসবার পালা আমার, কিন্তু বিয়ের প্রথম রাত্রে বধূর কানে তরুণ বরের মধুগুঞ্জরণই তো কাম্য! প্রিয়াকে সান্নিধ্যের নিবিড়তায় টেনে নিয়ে চিরন্তন নরের বাণীই বললাম চিরন্তনী নারীকে! তারপর এক সময় ভেঙে গেল উৎসবের ভিড়, রাত্রি এগিয়ে গেল শেষের দিকে, তবু সে গুঞ্জনের বিরাম ছিল না! পশ্চিম আকাশে চাঁদের ওপর দিয়ে স্বপ্নের মতো ভেসে যেতে লাগলো লঘু মেঘের তরী, মধুর মুহূর্তগুলি কেটে যেতে লাগলো অপূর্ব এক আবেশের মধ্য দিয়ে!

লিসা বললো, 'এই নেশায় তুমি আমাকে চিরজীবন ডুবিয়ে রেখো!'

বললাম, 'আমার পূর্ববর্তীদের কথা শুনতে চাই।'

হেসে বললো, 'আমাকে নেশা ধরায় আমার প্রথম স্বামী। ভালোবাসার নেশা যে কী প্রচণ্ড, তা বুঝেছিলাম প্রথম কিছুদিন। কিন্তু আমি কেন পারবো ছুটতে ওর সঙ্গে সমান তালে? ওর পানীয়ের মাত্রা ক্রমশই বাড়তে লাগলো। ভয়াবহ রকম বেড়ে গেল এক সময়। বাধা দিতে গেলে বলতো, তোমার দেহের পেয়ালায় দেবো শেষ চুমুক, মদের পেয়ালায় তারই প্রস্তুতি চলছে!'

'তারপর?'

লিসা হেসে বললো, 'কিন্তু আমার নেশা একদিন ছুটে গেল মিস্টার ইণ্ডিয়ান। বিচ্ছেদের ছুরি দিয়ে একদিন কেটে দিলাম সব সম্পর্ক।'

'কিন্তু, কোথায় গেল সে?'

ঠোঁট উল্টে বললো, 'জানি না।'

কে যেন একবার দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা ক'রে বলেছিলেন, সব নারীই সমান। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্তত তা বলে না। লিসার মধ্যে যে এক অদ্ভুত চুম্বক-শক্তি দেখেছিলাম, তা আমি আর কারুর মধ্যে পাইনি, একথা মুক্তকণ্ঠে বলবো। যে কথা আমাকে বলার নয়, এমন কথা অতি সহজেই বলে ফেলতো আমার কাছে, নারীর কাছে যে নিষ্ঠুরতা সচরাচর লোকে আশা করে না, সে নিষ্ঠুরতাও প্রকাশ পেতো মাঝে মাঝে ওর আচরণে। কষ্ট পেতাম, দুঃখ পেতাম, তবুও ও আমাকে টানতো দুর্নিবার আকর্ষণে। একদিন জানতে চাইলাম ওর দ্বিতীয় স্বামীর কথা। তেমনিই হাসতে লাগলো আমার কথা শুনে। স্থানীয় কোডোর সিগারেটে জোরে এক টান দিয়ে বললো, 'দৈহিক শক্তিতে ইনি অপরূপ। নামকরা কুস্তিগীর ছিল এই দ্বীপের।'

'বিয়ে হলো কেমন ক'রে ?'

'যেমন করে হয় এখানে। বল্লো। আমিও রাজী হয়ে গেলাম।'

'কতদিন টিকে ছিলে এই বিয়ে ?'

'বছর খানেকও নয়। এই তো সেদিনের কথা।'

বললাম, 'তারপরে ?'

'তারপরে ?'—হেসে উঠ্লো লিসা, বললো, 'তারপরে পাগল হয়ে গেল লোকটা।

কোথায় এখন সে ?'

প্রথম স্বামীর বেলায় যেমন উত্তর দিয়েছিল, তেমনি ঠোঁট উল্টে এবারও বললো, 'জানি না।'

সরকারী দপ্তরে লিসা করত টাইপিষ্টের কাজ। কোন কোন দিন ওর অফিসের পর চলে আসতো আমার অফিসে, আমার কাজ থেকে জোর করে টেনে তুলতো আমাকে, ঘুরতে বেরিয়ে পডতাম একসঙ্গে। কোনদিন সন্ধ্যা কাটতো গর্ডন স্কোয়ারে এক পাগল বেহালাবাদকের সুরের মূর্ছনা শুনে। কোনদিন বা লং পায়ার ধরে দুজনে হেঁটে চলতাম বহুদূর, কোনো জেটির কাছে হয়ত কোনদিন বসে থাকতাম চুপচাপ। ফেরবার পথে প্রিন্সেস হোটেলেব বার ঘুরে বাড়ি আসতাম, দুজনেরই পা টলছে, কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যাচ্ছে।

এর পরে বাড়ির আসর তো আছেই। লিসা থেকেই হতো পানীয়ের শুরু। এক একদিন হঠাৎ বলে উঠতো,—'না—না, তুমি অমন করে খেও না, তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি কিন্তু।'

অথচ, আসরের প্রারম্ভে ও-ই হাসতে হাসতে লীলায়িত ভঙ্গিতে হাতে তুলে দিতো গ্লাস। শরীরে যখন জাগতো আসুরিক মত্ততা, তখন আমার উদ্যত বাহু আর বিস্ফারিত রক্তিম চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ হু-হু করে কেঁদে উঠতো, বোতলগুলি কেড়ে নিয়ে বলতো, 'না—না, এ তুমি কী করছো! এ তুমি কোথায় নেমে গেলে!'

আজ মোটর বোটে করে যেতে যেতে বুঝতে পারছি লিসার মনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে। আমার মধ্যে আমাকেও যেমন দেখতে চাইতো, তেমনি চাইতো আমার মধ্যে দুর্দান্ত কোনো একজনকে। সেই মত্ত দুর্দান্ত মানুষটি যখন আবির্ভূত হতো আমার মধ্যে, ওর চোখে মুখে জেগে উঠতো একটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির দীপ্তি!......কিন্তু কয়েক মুহূর্তের ক্ষুধা সেটা, তারপরই ওর অন্তরটা হাহাকার

করে উঠতো আমার মধ্যে স্বাভাবিক আমিকে দেখবার জন্য, সমুদ্র যেমন হাহাকার করে তীরভূমির কাছে আদিতম প্রকৃতির গুণ্ঠন মোচনের জন্য! অদ্ভুত! বিচিত্র এই নারীমনের লীলা!

কিন্তু সত্যি বলছি, হাঁপিয়ে উঠতাম মাঝে মাঝে। যে জন্য বোম্বাই থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম দূরে, ঠিক সেই কারণে মনটা চাইতো ভিক্টোরিয়া থেকেও দূরে সরে যেতে! কিন্তু ফেনায়িত রঙীন মদের মতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে রহস্যময়ী লিসা, ওর সম্মোহনের শিকল কেটে ভেসে পড়বো বাইরের আকাশে, সে সাধ্য আমার কোথায়?

মায়ের আশীর্বাদের মতোই অবশেষে এলো একদিন মনিবের চিঠি। ব্যবসায়িক কাজে অবিলম্বে যেতে হবে আলফোঁসে দ্বীপে।

আলফোঁসে দ্বীপে এসে স্বাদ পেলাম মুক্তির। জনবিরল দ্বীপ, প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য।

কাজ শেষ করতে কিছু সময় লাগলো। দ্বীপের লোকগুলি সহজ, সরল, আতিথেয়তায় ওদের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু এখানেও নিয়ম আছে, একটা সামাজিকতার সূক্ষ্ম বেড়াজাল আছে! এরও কি বাইরে যাওয়া যায় না?

কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়তো এই বলয়াকৃতি নাম-না-জানা ক্ষুদ্র দ্বীপটি। দ্বীপের ঐ প্রস্তরস্তূপটিই আমাকে আকৃষ্ট করতো সব থেকে বেশি। মাঝে মাঝে লক্ষ করতাম, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে দ্বীপের মধ্যে। তাহ'লে নিশ্চয়ই বসতি আছে ওখানে। আছে লোকজন।

স্থানীয় লোকেরা বললো, 'ও দ্বীপে বসতি নেই। নারকোলের সময় অথবা পাখিদের ডিম কুড়োবার সময় আমরা এখান থেকে ওখানে গিয়ে কিছুদিনের জন্য আস্তানা গাড়ি, তারপর কাজ ফুরোলে চলে আসি। ওখানে কোনো মানুষ থাকে না।'

'কিন্তু, ধোঁয়া?'

ওরা বললো, 'এক দৈত্য বাস করে ঐ দ্বীপে। ধোঁয়ার কথা বলছেন? চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালায় কচ্ছপের মাংস পুড়িয়ে খাবার জন্য।'

আশ্চর্য হয়েই বললাম, 'দৈত্যের কথা কী বলছেন?'

'দৈত্য ছাড়া আর কী বলবো বলুন? মানুষ কি কখনো একা বাস করতে পারে ঐ নির্জন দ্বীপে, দিনের পর দিন।'

একটু থেমে ব্যাপারটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করে বললাম, 'তাহলে আসলে মানুষই। পুরাণ-কাহিনীর সেই অতিকায় কোনো ভয়ঙ্কর জীব নয়!'

'তা অবশ্য নয়। আকারে-প্রকারে মানুষই বটে, কিন্তু অদ্ভুত মানুষ।

পাহাড়ের গুহায় বাস করে। দূর থেকে মানুষ কেউ গেলে প্যান্ট পরে সামনে আসে, নইলে সাধারণভাবে কোনো আবরণই ওর দরকার হয় না।'

মনে মনে চমৎকৃত হয়েছিলাম, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠেছিলাম, 'বাঃ!'

শুভাকাঙ্ক্ষীরা বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু বলয়াকার দ্বীপটিতে যাওয়া আমার আটকাতে পারেনি কেউ। নিগ্রো সঙ্গী দুটি বোট নিয়ে সারাদিন সমুদ্রে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যায় ফিরে এসে সঙ্গদান করেছে রাত্রে, আমার তাঁবুর সামনে বসে দিন কেটেছে সেই অদ্ভুত রহস্যময় লোকটার সঙ্গেই।

প্রথম দর্শনেই তীক্ষ্ণ রাঙা চোখদুটি দিয়ে আমাকে বিশ্লেষণ করে নিয়েছিল সে, গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল, 'অসময়ে এ দ্বীপে মানুষ? এখন তো পাখিদের ডিম পাড়বার সময় নয়!'

আবরণের মধ্যে শুধু ছেঁড়া মোটা কাপড়ের একটা প্যান্ট, দীর্ঘ দৃঢ় চেহারা, তামাটে রঙ্, লাল্‌চে মাথার চুল। একটু হেসে বলেছিলাম, 'তোমার কথা খুব শুনেছি। আলাপ করতে চাই তোমার সঙ্গে।'

পাখিদের সচকিত করে হা-হা একটা প্রকাণ্ড অট্টহাসির লহর তুলে দ্রুত পদক্ষেপে আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল লোকটা।

পরদিন সকালে নিগ্রো সঙ্গীরা বেরিয়ে গেছে সমুদ্রে, তাঁবুর সাম্‌নে হাল্‌কা চেয়ার আর টেবিলটা টেনে নিয়ে ব'সে আছি, লোকটি আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো কাছে। ঠিক তেমনি বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো আমাকে, আমিও ওর মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলাম। পাতলা দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে একটা শিস তুলে ভঙ্গিভরে একেবারে টেবিল ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো, টেবিলে-রাখা বোতল আর গ্লাসের দিকে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে একটু মুচ্‌কি হেসে লোকটি বললো,—'সকাল বেলাতেই আরম্ভ ক'রেছো?'

হাসলাম আমিও, বললাম,—'চলবে নাকি?'

তেমনি হাসতে হাসতেই হাতে তুলে নিলো বোতলটা, লেবেলটা পড়তে পড়তে বললো, 'স্কচ?'

পরক্ষণেই রেখে দিলো বোতল, বললো,—'ভিক্টোরিয়া থেকে আসছো নিশ্চয়ই?'

একটু ঝুঁকে আগ্রহের স্বরে বললাম,—'কথা শুনে মনে হ'চ্ছে, আমরা একই পথের পথিক!'

'একই পথ!'—ব্যঙ্গভরেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলো লোকটা! পায়চারি করতে করতে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল সে, হঠাৎ একটু দ্রুত পায়ে ফিরে এলো কাছে, টেবিলের সব সরঞ্জাম হাতে তুলে নিয়ে কাছেই ঝক্‌ঝকে বালির

উপর ফেলল নারকেলের ছায়ায়, তারপর হাত ধ'রে টানলো আমাকে, বললো,—'ফেলে দাও তোমার টেবিল-চেয়ার, হাত-পা ছড়িয়ে সোনার মতো এই বালির গদির উপর গড়াও দেখি ? এই নির্জন দ্বীপে এসেও টেবিল-চেয়ার !'

বললাম,—'ঠিক বলেছো।'

পাশাপাশি বালুবেলার ওপর ব'সে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। বলা বাহুল্য, লোকটা পানীয় স্পর্শও করলো না, আপন মনে শিস দিতে দিতে সত্যিই নরম বালির উপর শুয়ে পড়লো সে। বললাম,—'একটা কথা বলো তো বন্ধু ?'

'কী ?'

'তুমি কোন্ দেশের মানুষ ? ইয়োরোপের ?'

লোকটা বললো,—'সৌরজগৎ ব'লে একটা কথা জানা আছে ? সেই সৌর-জগতে আছে পৃথিবী ব'লে একটা গ্রহ, আমি সেই গ্রহেরই মানুষ। এর বেশি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করো ত' গুহার মানুষ ফিরে যাবে গুহায়, বাইরে এসে তোমাদের মুখও সে দর্শন করবে না !'

বললাম,—'আমি জানি তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার বন্ধুত্ব কামনা করতে এসে তোমার কিছুই জানতে চাইবো না—এটাও অস্বাভাবিক।'

লোকটা উঠে বসলো, বললো,—'সত্যি ক'রে বলো ত', কেন এসেছো এই দ্বীপে ? কোনো রাজনৈতিক কারণ ?

'মানবনৈতিক কারণ !'—বলে উঠলাম—'আলফোঁসে দ্বীপে তোমার কথা খুব শুনেছি। শুনে শুনে মনের অবস্থা এমন হ'লো যে, তোমার কাছে না এসে পারলাম না।'

একটু বাঁকা হাসলো, বললো,—'বেশ।'

বললাম,—'যদি বলি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই সভ্যজগতে ?'

অট্টহাসিতে আবার ফেটে পড়লো সে, বললো,—'একথা আরও দশজন দশবার দশ রকমে ব'লে গেছে। নতুন কিছু বলো।'

চুপ ক'রে রইলাম। সমুদ্র সেই একইভাবে বেলাভূমিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বেলা যত বাড়ছে, দ্বীপের মধ্যেকার হ্রদটি ততই গাঢ়, নীল হ'য়ে উঠছে। লোকটি বললো, ঘুরে ঘুরে দ্বীপের সব কিছু দেখ, তবে ঐ পাহাড়ের দিকে বেশি দূর যেও না। যদি যাও ত' হাতে অস্ত্র নিও।'

'কেন ?'

'জন্তু-জানোয়ার-সরীসৃপ—কতো কী থাকতে পারে। এ অঞ্চলের সুবৃহৎ কূর্মকুল ত' আছে।'

'জন্তু-জানোয়ার এলো কী ক'রে এই দ্বীপে ?'

হেসে বললো,—'অনেক আগে এইসব দ্বীপে ছিল আরব জলদস্যুদের ঘাটি। তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তোমার হয়ত তেমন ধারণা নেই। জন্তু-জানোয়ারের উল্লেখটা কথার কথা, কিন্তু নিগূঢ় কারণে সরীসৃপকুলের যে তারা আমদানী ক'রেছে এই সব দ্বীপে, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

সাগ্রহে বললাম, 'আমাকে বলো এ'সব কথা। আরব দস্যুর রহস্যময় জীবন-যাত্রার কথা।'

বাঁকা হেসে বললো, 'কাকে জিজ্ঞাসা করছো? আমি নিজে হয়তো ঐ দস্যুদেরই একজন।'

'কী রকম?'

'কে বলতে পারে? আরব জলদস্যু অথবা দুর্ধর্ষ স্প্যানিয়ার্ড, কার রক্ত আমার ধমনীতে টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছে কে জানে! কতো বিচিত্র জাতির যে মিশ্রণ ঘটেছে এই সিসেল্‌স্‌ আরকিপেলেগোতে,—তার কি কোনো হিসাব আছে?'

বলতে বলতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর, বললো,—'মাঝে মাঝে প্রবল উন্মত্ততা জাগে। মনে হয়, যারা মানুষের সহজ সবল জীবনধারাকে নষ্ট ক'রে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করে জীবনকে জটিলতার নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে,—তাদের টুঁটি টিপে মেরে ফেলি,—অথবা হারপুন ছুঁড়ে এ'ফোঁড়-ও'ফোঁড় করে দিই সেই শয়তানদের বুক।'

দিন ছয়-সাত এমনিভাবে কেটে গেল আমার দ্বীপে। শুক্লপক্ষ। ক্রমশই চাঁদ বড়ো হচ্ছে। রাত্রিগুলি কী মাদকতাময়ই যে হয়ে উঠছে দিন দিন! কিন্তু সন্ধ্যার পর ওকে আর পেতাম না। একদিন লেগুন থেকে স্নান ক'রে উঠে ওকে বললাম,—'রাত্রে তোমাকে পাই না কেন?'

বললো,—'রাত্রে আমি আর একজনের।'

'আর একজনের! সে কে?'

হেসে বললো,—'একা নই ভাই, একা নই। আমারও সঙ্গী আছে।'

এতদিন এসব কথা শুনিনি কিন্তু। অথবা টেরও পাইনি অন্য কারুর অস্তিত্ব। বললাম,—'কী বলছো তুমি!'

বললো,—'তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে না সভ্যজগতে ফিরে যাবার কথা? উল্টে আমি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারি এই দ্বীপে চিরজীবনের মতো। কিন্তু তা করবো না। তুমি অবশ্যই ফিরে যাবে তোমার ঘরে।'

সমস্ত রাতটা কাটতো আমার ওর প্রতীক্ষায়। মনে হ'তো, কখন ভোর হবে, কখন ও আসবে। নিগ্রোরা চ'লে যাবার পর ও এসে দেখা দিতো। কিন্তু

কখনো অংশ নিতো না আমার পানীয়ের বা খাদ্যের। শত অনুরোধ সত্ত্বেও না। অথচ এই ভয়ঙ্কর লোকটির প্রতি আমার আকর্ষণ ক্রমশই প্রবল হ'য়ে উঠছে।

আরেকদিন বললাম, 'তোমার সঙ্গীর কথা তুমি বললে না?'

হেসে বললো, 'এত আগ্রহ কেন?'

বললাম, 'কে জানে! অতি প্রাকৃত কোন কিছুর প্রতি মানুষের যেমন একটা অদ্ভুত ভয় আছে, তেমনি অদ্ভুত আগ্রহও আছে।'

দশদিনের দিন সকালে বললো, 'আজ পূর্ণ চাঁদ উঠবে আকাশে। তৈরি থেকো বন্ধু, রাত্রে আসবো তোমার কাছে, তোমার নিগ্রো সঙ্গী দু'টি মদ খেয়ে নির্জীব হয়ে ঘুমিয়ে পড়বার পরে। তুমি আজ রাত্রে পানীয় স্পর্শ না ক'রে পারবে?'

বললাম,—'দেখি চেষ্টা ক'রে।'

'কিন্তু আজই তোমার শেষ রাত্রি এই দ্বীপে।'

'কেন!'

ফিসফিসিয়ে বললো,—'যা তুমি দেখবে, এর পরে থাকতে পারবে না এই দ্বীপে, কেউ পারেও না, তোমাকে যেতেই হবে।'

হেসে বললাম,—'দেশে অসাধারণ ডানপিটে ব'লে বিখ্যাত ছিলাম। কী এমন তুমি দেখাবে যে ভয় পেয়ে পালাতে হবে আমাকে?'

'ভয়?'—বাঁকা হেসে বললো,—'ভয় ছাড়াও ভয়ঙ্কর কিছু নেই কি?'

বললাম,—'দেখা যাক।'

হাতটা ধরে ফেললো, বললো,—'আমার প্রেয়সীকে তোমাকে দেখাবো আজ! ভালবাসার পাত্রী যে কতবড়ো নেশার পাত্রী হ'য়ে উঠতে পারে, তা' তুমি জানো?'

নিগ্রো দুটি প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। লণ্ঠনের শিখাটি নিভিয়ে দিয়ে তাঁবুর বাইরে চুপচাপ ব'সে ছিলাম। পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্নায় চারদিক উদ্ভাসিত। প্রতি মুহূর্তেই আশা করছি তার। দু'একবার ডেকে উঠছে দু-একটা সাগরপক্ষী, তীরভূমিতে ঊর্মিকল্লোল। আর দ্বীপের মধ্যে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে ঐ স্থির গভীর নীল হ্রদটিকে। ঝুঁকেপড়া পাথরটির ওপর চাঁদের আলো ঠিকরে প'ড়ে হ্রদের ওপর এসে খেলা করছে।

পা-টিপে পা-টিপেই এসেছিল সে, আমার হাতটা ধ'রে পা-টিপে পা-টিপেই সে নিয়ে যেতে লাগলো আমাকে হ্রদের দিকে। হ্রদের তীর ধ'রে ধ'রে যেতে লাগলাম আমরা। দু'টি মানুষ নয়, দু'টি ছায়া যেন এগিয়ে চলেছি সেই লতাগুল্মে-ঘেরা প্রস্তর স্তূপটির দিকে। ওর হাত ধ'রে উঠতে লাগলাম উঁচুতে। বেশি দূর নয়।

ও' আমাকে একটা তরুণ বৃক্ষের কাছে দাঁড় করিয়ে দিলো! আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো কোমরে দু'হাত রেখে। বিস্ফারিত অস্বাভাবিক দু'টি চোখ, কী এক দুর্দমনীয় নেশার আবেশে কাঁপছে যেন ওর শরীর, টলছে যেন ওর পা। ফিসফিসিয়েই বললে,—'আর এগিয়োনা তুমি। বিপদ হ'তে পারে। যা দেখবার এখান থেকেই দেখ।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি অবাক্ হ'য়ে! মদ ও স্পর্শ করতে চায়নি, অথচ নেশায় কাঁপছে সর্বশরীর, বলল,—'আমার প্রেয়সীকে দেখতে পাচ্ছো? ঐ দেখ জ্যোৎস্না-ঠিকরে-পড়া পাথরটার দিকে চেয়ে।'

দেখতে পেয়ে সত্যিই হিম হ'য়ে গেল যেন সর্বাঙ্গ! লোকটি হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে লাফিয়ে গিয়ে পড়লো পাথরটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলী ত্যাগ ক'রে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালো বড়ো একটা সাপ। ভয়ঙ্কর লোকটা মুখ এগিয়ে দিলো ওর মুখের কাছে,—ওর হাত বেয়ে ওর দেহটাকে বেষ্টন ক'রতে লাগলো বিচিত্র সেই সাপ।

চাঁদের আলো এসে প'ড়েছে লোকটির মুখের ওপর। প্রসন্ন প্রশান্ত মুখখানা আমার দিকে ফেরানো, বুকের ওপর বলয়ের মতো ওকে ঘিরে আছে সাপটা। আমাদের বাড়ির মন্দিরের সেই মহাদেবের আবক্ষ-মূর্তিটি মুহূর্তের জন্যই ভেসে উঠলো মনে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'লো আরও একটা কথা। একটা বিচিত্র নেশার কথা শুনেছিলাম, মদের চেয়েও তীব্র সে নেশা, ছোট সাপের ছোবল খাওয়া। এ'সাপটি বড়ো, হয়তো জলচর কোনো সাপ হবে, আকারে বৃহৎ, বিষের তীব্রতার দিক থেকে ক্ষীণ-শক্তি!...

সম্মোহিতের মতো বিচিত্র লোকটির দিকে তাকিয়ে আছি—হঠাৎ কী যে হলো, একটা ঝটাপটির মতো শব্দ,—সাপটাকে যেন দুর্দান্ত আক্রোশে দু'হাতের মুঠোর মধ্যে পিষে ফেলছে সে, তারপরে সজোরে ছুঁড়ে আছড়ে ফেললো পাথরটার ওপর। আছড়ে প'ড়ে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল সাপটা, তারপরেই জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত ঝাঁপ দিলো জলের মধ্যে, কয়েকটি ক্ষুদ্র ঢেউয়ের আবর্ত তুলে মিলিয়ে গেলো জলের মধ্যে। লোকটি কিন্তু ততক্ষণে উধ্বর্শ্বাসে ছুটে আসছে আমার দিকে। কেমন যেন আর্ত কণ্ঠস্বর, বললো,—'দেখেছো তুমি, সাপটাও আমাকে আর ছোবল মারতে চায় না, ওর মধ্যেও এসেছে স্নেহ আর ভালবাসা! ভালবাসা আর স্নেহ!'......

পাগলের মতো আবার ফিরে গেল জলের দিকে। যেখানটায় কয়েকটি ঢেউ তুলে মিলিয়ে গেছে সাপটা, সেইদিকে তাকিয়ে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলো, 'লিসা—লিসা!'......

অকস্মাৎ হাঁক দিয়ে উঠ্‌লো বোটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমার নিগ্রো সঙ্গী। বোট ভিড়ছে তীরে। আলফোঁসে দ্বীপ।

———

প্রেম

বিপুল জনসমুদ্রের মধ্যে যেন ছোট্ট একটি শ্যামল দ্বীপের ওপর একা চুপচাপ বসেছিল লোকটি। চার বছর হলো কলকাতায় এসেছি, সুদূর বিদেশ থেকে এসেছি দেশে, দেখে-দেখে চোখ এখনো ক্লান্ত হয় নি, পথে যেতে আসতে কত লোকইত চোখে পড়ে, কতো বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন চেহারার—বিভিন্ন পোশাকের লোক! এক-একসময় মনে হয়, নানান দেশের নানান ধরণের লোককে একটি গণ্ডির মধ্যে রেখে আমরা 'বাঙালী' নাম দিয়েছি বটে, কিন্তু কে যে কোন্ বিচিত্র পথে, কোন্ বিচিত্র রক্তধারার মধ্য দিয়ে এসে এদেশের ভাষায় আজ কথা বলছে এদেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তা কে জানে? এর সঙ্গে ওর মিল নেই। এর মুখ লম্বা, ওর মুখ গোল, এ ফরসা, ও কালো, এর মাথায় চুল বড়ো বড়ো, ওর কর্কশ, কোকড়ানো। ওর চোখ টানাটানা, ওর চোখ গোলাকার—ছোট্ট।

তিনদিক দিয়ে গর্জন তুলে ঘুরে ঘুরে আসছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাস, বিকেলের অফিস-ফেরতা ক্লান্তমুখ যাত্রীদল বোঝাই করে,—মাঝখানে ত্রিকোণাকার ছোট্ট এক টুকরো শ্যামল মসৃণ ভূমিখণ্ড,—তার ওপর বসে ছিল সে, একটি ছেঁড়া খাকীর হাফ-প্যাণ্ট মাত্র পরা, গায়ে কোন জামা নেই। গায়ের রঙ হয়ত একদিন ফরসা ছিল, রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, মাথার বড় বড় অবিন্যস্ত চুল অযত্নে আর ধুলোয় লালচে দেখাচ্ছে। মুখ-ভর্তি দাড়ি, তা-ও লালচে। ঘন কালো দুটি ভ্রূর নিচে দুটি অদ্ভুত চোখ, সামনে নিবিষ্ট দৃষ্টি, কতো লোক, কতো যান, কতো কোলাহল, সব ছাড়িয়ে তার চোখের দৃষ্টি যেন কোন এক উধাও অসীম স্মৃতি-সমুদ্রের তরঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে!

পথ হাঁটতে হাঁটতে কেন যে হঠাৎ আমার চোখ পড়লো লোকটির ওপরে, কেন যে অদূরে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখতে শুরু করে দিলাম লোকটাকে, কে জানে—ওকে দেখতে দেখতে আমার হঠাৎই মনে পড়ে গেল তাকে। এমনি-ই দীঘল চেহারা, এমনি আজানুলম্বিত দুটি বাহু, এমনি তামাটে দেহের বর্ণ, এমনি অবিন্যস্ত লালচে মাথার চুল আর দাড়ি, এমনি জলজল করা স্বপ্নিল নক্ষত্রের মত দুটি চোখ! এখান থেকে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে, সেই সেখানে—বিষুবরেখার দক্ষিণে ৪°৩৫' দক্ষিণ দ্রাঘিমারেখা এবং ৫৫°৪৬" পূর্ব অক্ষরেখার সুনীল সমুদ্র-মেখলা-বেষ্টিত সুনির্জন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে—যা এক শো ছাপ্পান্ন ফিট উঁচু

একটা টিলার মতন, মাত্র আধমাইল যার বিস্তার—অসংখ্য নারকেলকুঞ্জে যেখানে চারিদিক থেকে এসে লাগে অবাধ অগাধ হু-হু হাওয়া।

এখানে একা—একেবারেই একা থাকে সে! চারখানা ছোট্ট ঘরওয়ালা একটা টালি-ছাওয়া পুরনো বাড়ি। বাড়ির বাইরে সব দেয়ালগুলিই লতাপাতায় ঢেকে আছে, লাল টালির ওপরে অসংখ্য সাপের মত নানান লতাপাতার কচি-কচি ডগাগুলি এসে মাথা নুইয়ে পড়েছে।

ঘরের সামনে খুব বড় একটা উঠোনের মতো—ঝকঝকে-পরিষ্কার, একটা ঝরা পাতাও পড়ে থাকতে দেয় না সে! এই উঠোনটাই একটু এগিয়ে নেমে এসেছে ধাপে-ধাপে একেবারে নিস্তরঙ্গ একটা জলাশয়ের ধারে, অনেকটা জায়গা জুড়ে এখানে বালির রাশি—মাঝে মাঝে প্রহরীর মতো প্রকাণ্ড উঁচু-উঁচু নারকেল গাছ।

মরা নারকেল গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে এখানেই চৌকো-মতন একটা বালুকাময় জায়গাকে দেয়ালের মতো কঠিন করে ঘিরে রাখা হয়েছে। নারকেলের গুঁড়ি চিরে চিরে পাতলা কাঠের মত করে ঘর তৈরি হয়েছে ছোট ছোট, আমাদের গাঁ অঞ্চলে হাঁস-মুরগী যেমন ঘরে রাখে, তেমনি ঘর।

এই 'ঘর' আর ঘরের জীবগুলিকে নিয়েই ওর সংসার। ছোট্ট থেকে বড় নানান আকারের চকচকে ধারালো দায়ের মতো সব অস্ত্র, একটা প্রকাণ্ড ক্ষয়ে-আসা পাথরের গায়ে শান দিতে দিতে বীভৎস হাসিতে এক এক সময় ফেটে পড়ে লোকটা। বেড়ার ধারে কাকে যেমন লক্ষ করে বলতে থাকে, চোখ মিটমিট করে চেয়ে আছিস কী! এবার তোর পালা। নির্ঘাত তোকে এবার কাটবো!

যাকে বলা হলো—দীর্ঘদিন এই মানুষটার সাহচর্যে থেকে সে বোধ হয় এর ধরন-ধারন একটু একটু বুঝতে আরম্ভ করেছে। বালিতে শুয়ে-বসে থাকার ফলে সর্বাঙ্গে বালি লেগে ধূলি-ধূসরিত। অতিকায় শক্ত খোলের মধ্য থেকে চারটি পা বার করে পোষা কুকুর বা বিড়ালের মত বসেছিল খানিকটা বালি খুঁড়ে, বালির মধ্যে। ওর কথায় সরু মুখটা একটু-একটু করে বাইরে এনে, হলদে-আভা-যুক্ত দুই বিন্দু পোখরাজ মণির মতো দুই চক্ষু একবার ওর দিকে ফিরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বালির ওপর সরু মাথাটা নামিয়ে রাখলো।

ওইভাবে বালি খুঁড়ে বালির মধ্যেই পড়ে থাকে, ওঁর ঘর নেই! এই মানুষটিও যেমন লাল টালির ঘর থাকতেও তার মধ্যে না থেকে ঝকঝকে উঠোনে খাটিয়া টেনে তার ওপরে পড়ে থাকে সারা দিনরাত ওই নারকেল-কুঞ্জের ছায়ার নিচে, তেমনি এর নারকেল-তক্তার ঘর থাকা সত্ত্বেও সারা দিনরাত পড়ে থাকে বাইরে। মানুষটির সঙ্গে তফাৎ এই—ঝড়বৃষ্টিতে তাকে আশ্রয় নিতে হয়

লাল টালির ঘরে, একে নিতে হয় না। ঝড়বৃষ্টি-রোদ ঠাণ্ডা সব চলে যায় ওর দেহের ওই শক্ত খোলটার ওপর দিয়ে!

একটা আধটা দিন নয়, এক-এক করে দশ-দশটি বৎসর তাদের দুজনের এমনি করে কেটে গেছে।

হাতের চকচকে ধারাল দা-টা ফেলে দিয়ে হঠাৎই এক সময় উঠে দাঁড়ালো লোকটি, বললে, এবার একটু একা-একা থাক্। আমি ঘুরে আসি একটু। সারা সকালটা তোর সঙ্গে এমনি ফষ্টিনষ্টি করলে আমার চলবে নাকি?

বলতে না-বলতেই উঠে দাঁড়ালো সে—দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে খাকী রঙের একটা হাফপ্যান্ট শুধু—আপন মনে শিস দিতে দিতে তর তর করে উঠে গেল ওপরে, নিজের বাড়ির ঝকঝকে উঠোনে কোথা থেকে উড়ে দুটো পাতা আর পাখির বাসার খড়কুটো পড়েছিলো, সেগুলি তুলে ফেলতে ফেলতে—অদূরের ঝাঁকড়া-মাথা নিষ্ফলা জামগাছটাতে আশ্রয়-নেওয়া, চিকচিক করা চড়ুইয়ের মতো পাখিগুলির উদ্দেশে অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠলো। তারপর একটা বাঁকা নারকেল গাছের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথটি ধরে আরও ওপরে উঠে গেল।

ওপরে—একেবারে কূর্মপৃষ্ঠের মতো জলের উপর মাথা তুলে ওঠা পাহাড়টার মাথায়। অতিকায় কূর্মপৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের মতো এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে আধ-মাইল জুড়ে। যেদিকে দু চোখ যায়, জন নেই, যান নেই—শুধু নারকেল গাছের মেলা, কিছু কিছু ঝাঁকড়ামাথা জাম বা ওই জাতীয় গাছ।

পর্বত-চূড়ার এক জায়গায় প্রকৃতির খেয়ালে অদ্ভুত একটা পাথর দাঁড়িয়ে আছে, মিশ-কালো নয়, গাঢ় খয়েরী রঙের, অন্ধকারে তাকালে মনে হয়, ঠিক একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সরু লম্বা সাড়ে পাঁচ ফিটের একটা পাথর। তারই ঠিক পাশে চৌ-কোণা একটা পাথর, তিন কি সাড়ে তিন ফিট হবে দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে। আর আশ্চর্য, পাথরটা এমনভাবে রয়েছে যে, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে ওই মসৃণ পাথরটার ওপরে, সেই আলো ঠিকরে পড়ে নিচে তার উঠোনটির একপাশে তার লাল টালির ঘরগুলির দাওয়ার ঠিক সামনে।

দাওয়ার সামনেকার সেই অদ্ভুত হলদে হলদে আলোর রেখা দেখে তার ঘুম ভাঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় ওপরে, পাথরটার কাছে। আয়নার মতো ঝিলমিল করতে থাকে পাথরটা, তখন ওকে জীবন্ত মনে হয়! তারপরে ক্রমে ক্রমে প্রখর হতে থাকে সূর্যের আলো, পাথরের ঝিলমিলে ভাবটা কমতে কমতে একেবারে মিলিয়ে যায়। তখন সেই লম্বা খাড়া পাথর আর এই চৌকো পাথরটা—দুটো মিলিয়ে মনে হয়, একটি মানুষ আয়না নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কার অভিশাপে যেন হঠাৎ পাথর হয়ে গেছে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে পাহাড়ের এই চুড়োয় বসে পশ্চিম দিগন্তে স্পষ্ট চোখে পড়ে—'তমালতালিবনরাজিনীলা', একটি রেখার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

ভিক্টোরিয়া শহর এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে? আর পূর্ব দিগন্তে চোখে পড়ে শ্যামলী মেয়ের কপালে কালো একটা টিপের মতো 'ব্রিজেট দ্বীপ'—ছুরিকেই লোকালয়। আর চোখে পড়ে শান্ত, প্রসন্ন দিনে অসংখ্য সাদা বিন্দুর মতো পাল-তোলা মাছ-ধরা নৌকো! মানুষ! ওরা কি একবারও এসে ভিড়বে না এই ভূমিখণ্ডে?

ভিড়বে। প্রতিবারই ভেড়ে। মাসখানেক ধরে এই নিস্তব্ধভূমি হয়ে ওঠে কোলাহল মুখরিত! সেই একটি মাস লোকটি ভীরুর মত বাস করে ঘরের মধ্যে, ওর নিজের কাজও থাকে বন্ধ। লোকগুলি আসে নারকেল পাড়ার মরসুমে। এই ভূমিখণ্ড ইজারা নিয়েছেন যে বড় মানুষ, তারই ভাড়া-করা শ্রমিক হিসাবে মানুষগুলি আসে। কেউ-কেউ ওকে টেনে বার করতে চায় ঘর থেকে সন্ধ্যার উৎসব-মুহূর্তে।

—এই, কী নাম তোমার?

—কোন দেশের লোক?

ও কোনও উত্তর দেয় না! প্রাণপণেনিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে ওই কূর্মকুলের মতো! ওরা হাসে, ছেড়ে দিয়ে অবশেষে চলে যায়। ফিরে গিয়ে রঙ ফলিয়ে নানান গালগল্প রটনা করে লোকটিকে নিয়ে। এমনি করে করে দশ-দশটি বছর।

কিন্তু বছরের আর বাকি দশ মাস? আসে বই কি লোক। জোহার, জোনাখান আর বিশ্ব। আর ছোট্ট স্টিম-লঞ্চটার জনকয়েক মাঝিমাল্লা! প্রকাণ্ড বার্জ-টাকে লঞ্চের পাশে বেঁধে নিয়ে আসে ওরা, সমুদ্রের যে খাড়িটি সরোবরের মতো ভিতরে ঢুকে এসেছে, মুখের কাছে প্রকাণ্ড একটা পাথর থাকায় অশান্ত ঢেউগুলো তারই ওপরে গর্জে মরে, ভিতরে আসতে পারে না, সেই খাড়ি দিয়ে পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসে ওরা। শুরু হয় হাঁক-ডাক! বার্জ থেকে দড়ি বেঁধে ওপরে তার সেই নারকেল-কাঠের দেয়ালঘেরা প্রাঙ্গণে তোলা হয় চতুষ্পদ জলজ প্রাণীগুলিকে। আকারে খুব বড় নয়। বড় বড় টিপিঁর মতো জড়ো করা হয় ওদের। দু-তিন দিনের মধ্যে একটি ধারালো খাঁড়া দিয়ে সব সে শেষ করে দেয়—মাংসগুলি আলাদা আর খোলগুলি আলাদা করে নিয়ে আবার ওরা ফিরে যায়। বিরাট ব্যবসা, এ-ও ইজারাদারকে একটা লভ্যাংশ দান করে। কিন্তু আরেকটা যে ওদের গোপন ব্যবসা আছে—সেটা? অবশ্য খুব কমই দেখা দেয় সে ঘটনা। বছর দশেকের মধ্যে গোটা দশেকের বেশি নয়!

সবাইকে লুকিয়ে মোটা টাকার ব্যবসা নাকি। তখন ওই লাল টালির সর্বদক্ষিণের তালা-দেওয়া ঘরখানা কাজে লাগে। বাকি ঘরগুলিতে তো আসর জমায় জোনাথান-জোহাররা। সবাই সিসেলাস দ্বীপপুঞ্জের লোক, সবাই থাকে শহর ভিক্টোরিয়ায়, কিন্তু পরিচয় দেবার বেলায় বলে, আমি ইহুদী, আমি মিশরী, আমি ভারতীয়। কিন্তু সে নিজে কী? ওরা ডাকে 'জো' বলে—কী তার সত্যিকারের নাম? কোথা থেকে এসেছিল তার পূর্বপুরুষ, ইস্রায়েল, মিশর, না ভারত?

উঁচু পাহাড়-চূড়া থেকে দেখতে পেয়েই তরতর করে নেমে এলো সে। এসে গেছে লঞ্চ—অর্থাৎ জোনাথান, জোহার আর বিশ্ব, আর মাঝিমাল্লা। আর সেই বার্জ। বার্জ হচ্ছে মাল-বওয়া নৌকোর খোলের মতো—লঞ্চ টেনে নিয়ে আসে। শুরু হয় দড়ি দিয়ে বেঁধে তোলা সেই প্রাণীগুলোকে।

কাজে ব্যস্ত থাকতে থাকতেই হঠাৎ চোখে পড়লো ওর। লঞ্চের ভিতর থেকে প্রথমে এলো বাক্স-বিছানা—যেমন আসে। তারপরেই আশ্চর্য—জোনাথান আর বিশ্বের পাহারায় একটি মেয়ে।

প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল জোহার, এই জো, হচ্ছে কী? কাজ কর নিজের? কাজ চলতে থাকে। দড়ির ফাঁস বেঁধে ওদের শুধু ওঠানোই নয়, চকচকে ধারালো দা দিয়ে রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডগুলি বার করে আনতে হয়।

দু দিন পরেই বার্জ-বোঝাই মাংস আর খোল নিয়ে চলে গেল ওরা। জোনাথান বললে, মেয়েটাকে রেখে গেলাম। তিনদিন পরে ফিরবো। সাবধান।

এতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। বলে, ঠিক আছে।

এই ছোট্ট ভূমিখণ্ডে একা একা কোথায় ঘুরবে মেয়ে? কোথায় পালাবে? একটি মেয়ে সেই বহু বছর আগে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে! অতিকষ্টে যখন তাকে তোলা হয়, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সে তখন বিপর্যস্ত, জ্ঞানহারা।

জোনাথানের সাবধানতা এইখানে! নইলে সবাই জানে, গুমরে গুমরে শুধু কাঁদবে মেয়েগুলো, খেতেও চাইবে না, আর নয়তো উন্মত্তের মতো এক এক সময় জো-কে বলবে, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

মনে মনে হাসে জো। কে কাকে ছাড়বে? বেঁধেই বা রেখেছে কে কাকে? এই তো আধ-মাইল পরিধির মধ্যে ছোট্ট জগৎ, এর মধ্যে সে নিজে আছে দশ বছর! একটি দিন, একটি মুহূর্তের জন্যও বাইরে যায় নি, যেতে পারে নি।

এক-একদিন রুদ্ধ এক দুর্বার আক্রোশ জমে উঠতো মনে। সেই যে প্রথম মেয়েটিকে এনেছিল ওরা, তার দিকে কেন যেন অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় ভাল করে

তাকিয়েও দেখে নি সে, অবশ্য সেবারে জোনাথান ছিল এখানে—তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে গেছে তাদের এই জো-কে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ মেয়েগুলির বেলায় জোনাথান আর থাকে নি, তারই ওপর দিয়ে গিয়েছিল সব ভার, ওকে তারা সর্বরকমে বিশ্বাসও করেছিল বোধ হয়। বিশ্বাসভঙ্গ সে করে নি, অর্থাৎ সাহায্য সে করে নি মেয়েগুলিকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু বিশ্বাসের অর্থ যদি অন্য কিছু হয় তো সেখানে সে চরম আঘাত হেনেছিল ওই মেয়েগুলির বেলায়।

কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল মেয়েগুলি। এই ভূমিখণ্ডে পা দিয়েই ওরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, কী হবে ওদের অবস্থা! কেমন করে জোহার-জোনাথানদের খপ্পরে পড়ে মেয়েগুলি, কে জানে—লঞ্চে আসবার সময় কোনও চাঞ্চল্য নেই, এখানকার মাটিতে পা দিয়েই শুরু হয় কান্না আর কান্না।

ওরা তার পায়ে পড়ে যত কাঁদতো অসহায়ের মতো, তত পৈশাচিক দানবতায় উল্লসিত হয়ে উঠতো ওর মন। সিসেলাস-এরই মেয়ে ওরা—কিন্তু জোনাথানদের হাতে পড়েছে, এরপর কোন্ দূর-দেশ-দেশান্তরে গিয়ে ওদের স্থিতি হবে কে জানে, এই দু দিনের জন্য ওর আতিথ্যে আছে যখন, তখন সে ই বা ছেড়ে দেবে কেন? নিরুদ্ধ বঞ্চিত যৌবন যেন ক্ষুধিত বিষাক্ত কোন সাপের মতো ক্রূর হয়ে উঠতো।

কিন্তু তারপর? পঞ্চম বৎসর থেকে শুরু হয়েছিল ওর ভাবান্তর। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম আর নবম মেয়েটির বেলায় তার কোন কৌতূহলই জাগে নি। টালি-ছাওয়া বাড়িটার দক্ষিণের ঘরটা খুলে দিয়েছে, ভাঁড়ার দেখিয়ে দিয়েছে, ব্যস, ওই পর্যন্ত। চতুষ্পদ ও জলজ প্রাণীগুলির মতই কোন ভীরু প্রাণী যেন ওরা, কান্নাকাটি করছে—চকচকে ধারাল ছুরি দিয়ে হৃৎপিণ্ড বার করে আনার মুহূর্তে লম্বা মুখখানা যন্ত্রণায় বাব করে নিষ্প্রাণ পাথরের চোখের মতো ওরা যেমন তাকায়—কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত লঞ্চে ওঠবার মুহূর্তে ঠিক তেমনি চোখেই শেষবারের মত মেয়েগুলি তাকিয়ে গেছে তার দিকে।

সেই নারকেল-তক্তা দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। তেমনি বালি খুঁড়ে সর্বাঙ্গে বালি মেখে শুয়ে আছে অতিকায় প্রাণীটা। জো ধীরে ধীরে এসে বসে পড়লো তার অনতিদূরে, তারপর বললে, জানিস, ওরা চলে গেল। দশ-দশটা বছর ধরে এতগুলিকে একে একে শেষ করলাম, তোকে আর কিছু করতে পারলাম না।

ময়াল সাপের মাথার মতো মাথাটা নুইয়ে রেখেছিলো বালির ওপরে,

ওই কথার উত্তরে মাথাটা একটু হেলালো, পোখরাজ মণির মতো দুটি চোখ যেন নীরব হাসির আভায় মুহূর্তের জন্ত উঠলো ঝিলমিল করে।

আচ্ছা? প্রাণীটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলো জো, সবারই জুড়ি থাকে, তোর কোনও জুড়িও নেই রে?

মাথাটা সোজা করে চুপচাপ নিস্পৃহের মতো পড়ে থাকে প্রাণীটা।

জো বলে, দশ বছর আগে যখন এসেছিলাম, তখন থেকেই তোকে দেখছি। জবুথবু বুড়ো। তাড়া করলাম, তুই পালাতে পারলি না। হত-ভাগা! তোকে সেদিনই কেটে ফেলতাম—ওই বিশ্ব এসে বাধা দিয়েছিলো বলে তুই বেঁচে গেলি। বললে, এটা বুড়ো, একে মারিস না। ও আবার এ সব জানে-টানে কি না, তোকে ভালো করে উলটে-পালটে দেখে নিয়ে সেবারই বলেছিলো, এটা পাথুরে বুড়ো, এক-শো-রও বেশি বয়েস। তা হ্যাঁরে, তোরা নাকি দেড-শো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকিস?

যাকে প্রশ্ন করা হলো, সে নির্বিকার। একটা নারকেল-খোলে কিছু জল নিয়ে এসে ন্যাকড়া দিয়ে ওর গা পরিষ্কার করতে বসলো জো। ও একবার মুখ তুলে দেখে নিয়ে মুখটা খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, শুধু পোখরাজ মণির মতো দুটি চোখ আর মাথার অগ্রভাগটা রইল সামান্য একটু বেরিয়ে।

জো ওর গায়ের বালি পরিষ্কার করতে করতে বললো, ঈশ! অমনি লজ্জায় মুখ লুকানো হলো। গা ধুইয়ে দিচ্ছি কি না! দেখ, আমাকে ওরা জো বলে ডাকে, আমার নামধাম সব ওরা ভুলিয়ে দিয়েছে, আমিও তোর ও নাম ভোলাবো, তোকেও ডাকবো 'জো' বলে, বুঝেছিস?

অতিকায় প্রাণীটা নিস্পন্দ হয়ে যেন ওর কথাই শোনে।

এই শোন্? জো জো-কে ফিসফিস করে বলতে লাগলো, এ মেয়েটা কাঁদে না রে! আমাকে বললে, বেশ স্বাস্থ্য তো তোমার, কত বয়স হলো?

আমি তো মনে মনে হেসে বাঁচি না!

বয়স? বয়স আবার কী? তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ, যা কিছু একটা ধরে নাও না। অবশ্য মুখে কিছুই বলতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম তোর কাছে! ঈশ! কী বালি মেখেছিস!

বলে জোরে জোরে ওর গা-টা ঘষতে থাকে ন্যাকড়া দিয়ে, চুপিচুপি বলে, তোকে রোজ কাটবো বলি, তুই তো পালিয়েও যেতে পারিস সমুদ্রে। তোকে তো আর আমার মতো এখানে কেউ লুকিয়ে রাখে নি! তোর মতো অবস্থা হলে আমি ঠিক শহরে চলে যেতাম একটা নৌকো তৈরি করে নিয়ে।

কিন্তু যাবো কোথায়? জোনাথান বলেছে, দেখতে পেলেই নাকি আমাকে ধরবে। তাই পড়ে আছি, খাই-দাই আর আনন্দে ঘুরে বেড়াই।

আপন মনেই বিড়বিড় করে যাচ্ছিল জো, হঠাৎ একটা মেয়েলি চিৎকারে রীতিমত চমকে উঠলো সে।

দেখে—সেই মেয়েটি। কাল-পরশুর মতো গাউন পরা নয়, ভিক্টোরিয়ার যে কয়েকঘর ভারতবাসী আছে, তাদের মেয়েদের মতো শাড়ি পরেছে আজ, পাতলা হলদে রঙের একটা শাড়ি। 'প্রাণী-জো' সেই দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে 'মানুষ জো'কে যেন বললে, ওটা কী?

জো তাকিয়ে ছিলো ওর দিকে অবাক হয়ে, কোন কথা বলতে পারে নি।

মেয়েটি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ততক্ষণে, বললো, বাব্বাঃ! কী প্রকাণ্ড কচ্ছপ! ওটা তোমাকে কামড়ে দেয় না?

এবারেও উত্তর দেয় না জো, অচেনা মানুষের সামনে সত্যিই তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে, সহজে কথা ফোটে না। জোরে জোরে সে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষতে থাকে জো'র শক্ত পিঠ। মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, তারপরে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যায় ছোট ঘরগুলির দিকে, তক্তার ফাঁক দিয়ে বন্দী কূর্মকুলকে যতদূর লক্ষ করা যায় দেখে এসে বলতে থাকে—ওটার মত বড় তো একটাও নেই, ওগুলো সব ছোট-ছোট। জুড়ি নেই ওর?

জলদগম্ভীর স্বরে এবার বলে ওঠে জো,—না।

তারপরেই উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে চলে আসে সীমানার বাইরে, তারপরে তরতর করে উঠে আসে ওপরে, নিজের ঘরের উঠোনে। ভাঁড়ার খোলা রয়েছে—জোনাথানদের দেওয়া খাদ্য-ভাণ্ডার। এবার রান্নার ব্যবস্থা করা দরকার।

মেয়েটি তার পিছনে পিছনে এসে বসে পড়েছিল উঠোনেই— তার খাটিয়াটার ওপরে।

—এই, শোনো!

মেয়েটির সপ্রতিভ ব্যবহারে ক্রমশই অবাক হচ্ছিল জো—উনোনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে এলো সে, তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বললে, কী?

সোজা ওর চোখের দিকে তাকালো মেয়েটি, বললে—কতদিন আছো এখানে?

গর্জন করে উঠলো জো, বললে, তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটি, চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না বয়স, গায়ের রঙ ঠিক কালোও নয়, ফরসাও নয়, মুখখানা সুন্দর, টিকলো নাক, টানাটানা চোখে কালো দুটি চোখের তারা, মাথার চুল বব্ করা নয়, লম্বা আর ঘন—পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। বেশ সপ্রতিভ ঝকঝকে মুখের ভাব।

ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ করলো নীরবে, তারপরেই আপন মনে বলে উঠলো, কী লোক রে বাবা। কথা কইতে জানে না! খেঁকিয়েই আছে!

উনোনে হাঁড়ি বসিয়ে তার মুখে ঢাকা দিতে দিতে বোধ হয় কথাগুলি কানে গিয়েছিলো জোর—একটা অদ্ভুত অসহিষ্ণুতা আর অব্যক্ত জ্বালায় মনটা ভরে থাকলেও এগিয়ে এসে কথা বলতে পারল না সে—তাড়াতাড়ি ওকে পাশ কাটিয়ে আবার নেমে গেল নিচে।

ওর জো ততক্ষণে আবার কী করে যেন বালি মেখেছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওর কাছেই নারকেল তক্তায় ঠেস দিয়ে বসে পড়লো জো বালির ওপরে, বললে, কে রে মেয়েটা। কাঁদেও না! বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। খুলে বলবো নাকি সব?

ওর জো ততক্ষণে চারটি আঁশ-ওয়ালা পা ছড়িয়ে মুখটা নামিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে, নিঃসাড়।

—কী রে, ঘুমুলি নাকি? ওর দিকে তাকিয়ে জো বলে, তা ঘুমো! যতদিন মাংস জুটছে, কিছু বলছি না, মাংস ফুরোলেই তোকে শেষ করবো। তখন বুড়ো বলে মানবো না।

—ও বুড়ো নাকি?

চমকে মুখ তুলল জো। মেয়েটা আবার কখন চুপচাপ নেমে এসেছে। ধড়মড করে উঠে দাঁড়ালো জো, তেমনি তীব্র-কণ্ঠেই বললে, তাতে তোমার কী?

—আমার আবার কী! মেয়েটি বললে, কিন্তু চলে এলে যে! আমি একা থাকবো নাকি! কথা কইবো কার সঙ্গে? আচ্ছা লোক রেখে গেছে খবরদারি করতে!

—করবো না খবরদারি!—বলে দুমদুম করে পা ফেলে ওপরে উঠে এলো জো। বলা বাহুল্য, পিছনে-পিছনে মেয়েটাও।

অব্যক্ত নিদারুণ একটা ক্রোধের জ্বালায় যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে জো—একটা অদ্ভুত অস্বস্তি! এ কী ধরনের মেয়ে এলো এখানে! এ তো ঘরে বসে কাঁদেও না, ভয়ে আড়ষ্ট হয়েও যায় না!

অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ালো জো, মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে তীব্র-কণ্ঠে বলে উঠলো, জানো না?

—কী!

জো উত্তেজিত—চাপা কণ্ঠে বললে, কেন তোমাকে আনা হয়েছে?

—কেন?

জো রুদ্ধনিশ্বাসে বললো, তিন দিন পরে ওরা ফিরে আসবে।

—জানি।

—জানো?—জো বললে, কোথায় তোমায় নিয়ে যাবে, সেটা জানো?

—জানি। বিশ্ব আমাকে বলেছে। ইণ্ডিয়ায়!

চিৎকার করে উঠলো জো—চুলোয়! তোমাকে ওরা দূরে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে!

তবুও যেন ভয় পেলো না মেয়েটি, ঠোঁট উল্‌টে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, কে কাকে বেচে দেখা যাবে!

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো জো।

—কী! দেখছো কী!—লীলায়িত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলে, তা দেখ যত খুশি. কারণে-অকারণে অমন খেঁকিয়ে উঠো না বাপু!

পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড ক্রোধের বিদ্যুৎ জ্বলে উঠলো দেহে, মুখ বিকৃত করে উন্মত্ত পশুর মত হঠাৎই একটা বিকট চিৎকার করে উঠলো জো, তারপর লাফ দিয়ে একটা জন্তুর মতই ছুটতে ছুটতে সে উঠে গেল আরও ওপরে, মানুষের পাথর হয়ে যাবার মতো সেই যে লম্বা পাথরটি দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশীর্ষে, একেবারে দু হাতে তাকে বেষ্টন করে বসে পড়লো তার পায়ের কাছে।

কিছুক্ষণ ধরে দম নেবার পর, তার মনে হলো, তার পিছনে পিছনে এখানেও উঠে আসে নি তো মেয়েটা?...না, তা আসে নি, যে খাড়া চড়াই—সহজে উঠে আসা সম্ভবও নয়! কথাটা মনে হতেই কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে জো, তারপরে সেই আয়নার মত চৌকো পাথরটার মাথায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে।

বেলা অনেক হয়ে গেছে, তবুও রোদ্দুর মিষ্টি-মিষ্টি লাগে। রোদ্দুর আর হু হু হাওয়ার মধ্যেও যেন ঘুম জড়ানো আদরের ছোঁয়া। নীল আকাশের ওপর দিয়ে সাদা-সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ উড়ে যাচ্ছে, দেখতে দেখতে এক সময় পাশ ফিরে দিগন্তের দিকে তাকাতে গিয়েই অতর্কিত বিস্ময়ে মুখ তোলে জো। কালো একটা রেখার মত ক্রমশ ঘন হলো সেই

রেখা। বাড়তে লাগলো সেই কালিমা। সাদা পালতোলা নৌকোগুলো সব ফিরে গেছে। আসছে ঝড়—বুক দুরু-দুরু-করা ঝঞ্ঝার স্বেচ্ছাচার!

নিচে নামতে গিয়েও চট্‌ করে নামতে পারলো না জো। কাকে গিয়ে আগে সামলাবে? মেয়েটাকে? না, সেই বালির ওপর হুমড়ি-খাওয়া বৃদ্ধ জীবটাকে? বলবে, ভয় নেই, আমি আছি। বহু ঝড় কেটে গেছে এই দশ বছরে, কোন ঝড়ই আমাকে টলাতে পারে নি, আজও পারবে না।

কিন্তু মেয়েটার ওপর সে অমন করে ক্ষেপে উঠলো কেন হঠাৎ! কেন হিংস্র জন্তুর মতো গর্জন করে উঠলো সে অমন করে! মেয়েটা নিশ্চয় ভয় পেয়ে গেছে। মনে-মনে হাসলো জো—ভয় পাইয়ে দেওয়াই ভালো! ভয় একটু পাক। এই নির্জন ভূমিখণ্ড, এরও একটা ভয়ঙ্করী রূপ আছে! আজ দশ দশটি বছর প্রতি রাত্রি সে তা অনুভব করেছে মর্মে-মর্মে! দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—একা থাকা যে কী কঠিন এমনি করে, তা যে না থেকেছে, সে বুঝতেই পারবে না!

ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে নেমে এলো জো! তার খাটিয়ার ওপরে তেমনি করেই বসে আছে মেয়েটি। পায়ের শব্দে মুখ তুললো। তাকালো। কিন্তু কিছু বললো না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে জো বললে, ঝড় আসছে, ঘরে যাও।

মেয়েটি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। পাহাড়ের চূড়াটার আড়ালে দিগন্ত ঢাকা পড়েছে, যেটুকু আকাশ তার চোখে পড়লো তা নীল—ঘন নীল কালো মেঘের কোনো ছোঁয়াও নেই। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তেমনি চোখেই তার দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটি।

জো-র মনে হলো, এমনও হতে পারে, প্রচণ্ড ভয়ে ভিতরে-ভিতরে বিহ্বল হয়ে পড়েছে মেয়েটি এবং সে বিহ্বলতা এতো বেশি যে, কথাই ফুটছে না তার মুখে।

মুহূর্তের জন্য মমতায় স্নিগ্ধ হলো মন, মেয়েটির কাছে এসে বললে, ভয় পেয়েছো, না? আমি অমন চিৎকার করে উঠেছিলাম বলে ক্ষমা করো। দশ বছর আছি, কেমন যেন হয়ে গেছি। পাগলের মতো।

মেয়েটি মুখ তুলে তেমনি তাকিয়েছিলো, বললে, একা একা আছো—সঙ্গী নেই, সাথী নেই, মাথার গোলমাল তো একটু হতেই পারে!

—কী! মুহূর্তে রুখে দাঁড়ালো জো, সত্যি সত্যিই আমি পাগল?

মেয়েটি একটু হাসলো, বললো, তোমার খুব কষ্ট, না?

মনে হলো, তার বুকে চকচকে ধারালো দা দিয়েই আঘাত করলো কে যেন! ক্ষিপ্তের মতো হাত-পা শক্ত করে আবার ইচ্ছা হলো তেমনি চিৎকার

করে ওঠে ! কিন্তু না, অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিলো সে, তারপরে ছুটে চলে এলো নিচে।

সেই বালিমাখা বৃদ্ধ জো। বললে, মেয়েটা আমাকে পাগল করবে রে ! এর চেয়ে ফাঁসির কাঠে লটকে মরাও ছিল ভালো।

বিড়বিড় করে আরও কী যেন সে বকে যাচ্ছিলো, হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলো সে। কালো হয়ে গেছে আকাশটা, কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে সমস্ত আকাশ জুড়ে। আর হাওয়া !—মনে হলো এখুনি উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাকে !

ছুটতে ছুটতে এলো ওপরে। মেয়েটি উঠোন ছেড়ে নিজেই গেছে দক্ষিণের ঘরে। কপাটটা টেনে বন্ধ করে দিয়েছে।

শুধ্ ঝড় নয়, জলও। ঝর্ঝর্ ঝম্ঝম্ অশ্রান্ত বৃষ্টি। নিচে, বুড়ো জো-র ঘরটা খোলাই দেখে এসেছে, জো আস্তে আস্তে নিজেই চলে যাবে, ওকে নিয়ে ভাবনা নেই। ভাবনা এই মেয়েটিকে নিয়ে। জল নামবার আগেই মাংসের হাঁড়িটা ভিতরে নিয়ে এসেছিলো জো, হয়েও গিয়েছিলো রান্না। এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। স্নান বোধ হয় ভোরেই সেরে নিয়েছে মেয়েটা। উঠোনের নিচে বিপরীত দিকে প্রকৃতির খেয়ালে পাহাড়ের বুকেই পুকুরের মতো হয়ে আছে, বৃষ্টির জলধারা থাকে তাতে। সেই জল বালতিতে উঠিয়ে স্নান, সেই জল ফুটিয়েই খাওয়া।

কোনক্রমে নিজের ঘরের কপাট খুলে পাশের ঘরে গিয়ে ঘা দিলো জো। বৃষ্টির ছাটে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। মেয়েটি দরজা খুলতেই তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো সে। কয়েকটা বাসন, বড়ো একটা বাটিতে মাংস, এই সব সে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিলো পিছনে। বললে, খাবার।

মেয়েটা একটা লাল ফুল-ছাপানো ড্রেসিং গাউন পরেছে, বললে, তোমার ভাঁড়ার থেকে খাবার তো নিয়েই এসেছিলাম। এই দেখো, কত পাউরুটি, জ্যাম, জেলির শিশি। কুঁজো-ভর্তি জল তো রাখাই ছিলো। আর তোমার রান্না ওই মাংস নিয়ে যাও। খাবো না।

—কেন !

—কচ্ছপের মাংস আমি খাই না।

—কেন ?

—বাবা রে বাবা, অতো 'কেন'র উত্তর দিতে পারবো না।

জো বললে, ভালো মাংস। 'হক্স্বিল'-কচ্ছপের মাংস বিষ, সে মাংস ফেলে দেই। এ হচ্ছে ভালো জাতের কাছিমের মাংস। খাবে না ?

একটু হেসে মেয়েটি বললে, না। আমি হিন্দু, তা জানো? ভারতবর্ষে গুজরাট বলে একটা দেশ আছে, আমি সেই দেশের মেয়ে—বৈষ্ণব। আমাদের ওসব খেতে নেই।

হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো জো। ওর সব কথা সে বুঝতেই পারলো না। মেয়েটি বললে, বোসো না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি?

বলতে-না-বলতে—কী আশ্চর্য, মেয়েটি একেবারে ধরে ফেললো ওর হাত, একেবারে ডানহাতটা, যেটা দিয়ে ও কচ্ছপের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডগুলি বার করে আনে। তারপরে বসিয়ে দিলে চেয়ারের ওপরে। নিজে বসলো তার খাটে—বিছানার উপরে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, জানালাগুলি সব বন্ধ করে দিয়েছে নিজেই। কুলুঙ্গিতে জড়ো-করা অজস্র মোমবাতি, তার একটা জ্বালিয়ে দিয়েছে টেবিলের ওপরে।

মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসলো, বললে, ভাবছো, পিচেলাসের মেয়ে হয়ে আমি জানলাম কী করে? জেনেছি। আমারই এক পূর্বপুরুষকে জলদস্যুরা ধরে এনেছিলো এই দ্বীপে। তিনি বিয়ে করেছিলেন দ্বীপেরই এক মেয়েকে। সেই বংশেরই আমি মেয়ে, বংশ-পরম্পরায় আমরা শুনে আসছি আমরা কোথাকার। গুজরাট। বৈষ্ণব। হিংসে আমাদের করতে নেই!

—হিংসে!

—হ্যাঁ। মেয়েটি বললো, জীবজন্তু মারাটা আমাদের কাছে পাপ।

উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো জো, কিন্তু আমি তো গুজরাটের নই, আমার কাছে পাপ হবে কেন?

অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে মেয়েটি, বললে, কে বলেছে তোমার পাপ! আমি আমার কথা বলছি।

মোমবাতির স্বল্পালোকেই মনে হলো, মেয়েটির দুটি চোখ যেন স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে, নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে যেন বলতে শুরু করলো, ছোট থেকেই বাপ-মাকে হারিয়েছি। বাবার লেখা ডায়রিখানা ছাড়া পিতৃ-সম্পত্তি কিছুই নেই। মানুষ হয়েছি এক কনভেন্টের অনাথ-আশ্রমে। তা-ও বড়ো হয়ে একবার দুষ্টুমি করেছিলাম বলে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কী আর করি? লেখাপড়া তো হলো না—হোটেলে নাচবার কাজ নিলাম।

হ্যাঁ, অদ্ভুতভাবে ঠোঁট টিপে হাসলো মেয়েটি, খাটো পোশাক পরে নানা রকমের নাচ। তখন মাংস-টাংস সবই খেতাম। অমন চমকে উঠো না, চৈতন্য মানুষের একদিনেই আসে না। দিন যায়। একদিন বাক্স থেকে হঠাৎই বার

করলাম-বাবার লেখা ডায়েরিটা। পড়ে মনে হলো, করেছি কী আমি? ঠিক এই সময়েই বিশ্বের সঙ্গে আলাপ।

আমাদের বিশ্ব?

হ্যাঁ; তোমাদেরই বিশ্ব।—মেয়েটি বললে, ও বললে, ও ভারতীয়। আমাকে ভারতে নিয়ে যাবে। আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। ও বললে, চলো। আমিও বললাম, চলো।…এলাম। ওদের দলটাকে জানতাম। মেয়ে চুরি ওদের যে ব্যবসা, এটা হোটেলের নাচিয়ে মেয়ে হয়ে আমি আর জানবো না! অনেকের অনেক গোপন খবরই তো জানতাম!

দু হাতে মাথা চেপে বসেছিলো জো, হঠাৎই বলে উঠলো, বড্ড ভুল করেছো!

ভুল!—খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটি, না। করুক না আমাকে চুরি নিয়ে যাক না যেখানে হোক, আমি তো দেখতে চাই, কী আছে আমার জীবনের শেষে!

বলেই ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ মেয়েটি, তারপর বললে, তোমার কথাও শুনেছি বিশ্বের কাছে। আমারই মতো এক হোটেলের মেয়ের দিকে তুমি ঝুঁকেছিলে!

সোজা হয়ে বসে দুটি হিংস্র চোখে ওর দিকে তাকালো জো—আবেগে আর উত্তেজনায় কণ্ঠ ওর রুদ্ধ! কিন্তু সেদিকে ভালো করে লক্ষ না করেই বলে উঠলো মেয়েটি, ওই ব্যাপার নিয়ে হিংসেয় জ্বলে উঠে একটা মানুষকে তুমি মেরে ফেলেছিলে।

ধনুকের জ্যা-মুক্ত তীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো জো মেয়েটির ওপরে, ওর নরম পাখির মত গলাটা দুই হাতে টিপে ধরে বলতে লাগলো, আর একটি কথাও উচ্চারণ করবে না!

কয়েক মুহূর্ত ওই ভাবে কাটিয়ে দিয়ে, শান্তভাবে ওর হাত দুটি গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি বললে, খুব বীরত্ব! একটা মেয়ের গলা টিপে—আচ্ছা পুরুষ যা-হোক!

—তুমি চুপ করবে কিনা!

মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ফিক করে হেসে ফেললে,—বললে, অমন করে আচমকা ধরে! আমি তো শেষই হয়ে যেতাম। সেটা কী ভালো হতো!

—বেশ হতো। কে আমার কী করতো!

মেয়েটি বললে, কিছুই না। যেমন তোমার বন্ধুরা তোমাকে লুকিয়ে রেখেছে এখানে, তুমি আর যেমন ভয়ে ফিরতে পারছো না ভিক্টোরিয়ায়, তেমনি লুকিয়ে

থাকতে হতো কোথাও না কোথাও। তবে তোমার মনে-মনে খুব দুঃখ হতো। হতো না ?

অসহ্য ! মেয়েটা ওর মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিতে চায় ! তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার খিল খুলে ও বাইরে বেরিয়ে গেল। অশান্ত ঝড়ের দাপাদাপি বাইরে। একটা বুড়ো জামগাছ বুঝি উপড়েই পড়ে গেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে টুকরো পাথরও ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিক !

সারাটা দিন এমনি ভয়ঙ্কর ঝড়ের তাণ্ডব। ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল জো। মেয়েটি বাইরে এসেছিল কি না কে জানে। আর সেই জো ? বৃষ্টিতে ঘরের মধ্যে গিয়েছিল তো ? না গেছে তো বয়ে গেছে ! অত অভিমানের ধার ধারে না সে। এবারে কারুর কথা সে শুনবে না, বুড়োটাকে সে কাটবেই কাটবে।

এলো রাত। মেয়েটা ভয়-ডর পাবে না তো ? পাক না, ভয়ডর পেয়ে কেঁদে ওঠাই তো উচিত ! ও কাঁদবে, আর বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দে কিছুই শুনতে পাবে না জো, বেশ হবে !

রাতটাও কাটলো। সকালে সামান্য একটু ধরেছিল বৃষ্টিটা। বাইরে এলো জো ! মেয়েটার ঘরের দরজা খোলা। স্নান করতে গেল নাকি ? পাহাড়ী পুকুর, জল পেয়ে এখন কানায়-কানায় ভর্তি। পা পিছলে মেয়েটা যদি গিয়ে তাতে পড়ে ? সাঁতার জানে তো ?—না জানুক, বয়েই গেল ! ওরা আসবে—মেয়েটা কই ? জো বলবে, শেষ। তোমাদের হাত ফসকে পাখি পালিয়েছে—ওরা রেগে বলবে, চল্ তোকে ভিক্টোরিয়ায় নিয়ে যাই। ও যাবে না। এখানকার সব-কিছুর সঙ্গে তার মন মিশে গেছে, আর যাওয়া চলে না এ জায়গা ছেড়ে।

বৃষ্টিতে বহু ঝরনার সৃষ্টি হয়েছে, পাহাড়ে। ঝোপে ঝোপে এধারে ওধারে খুশি-হওয়া ঝরনার ঝর্‌ঝর্ ! যেন একটি নয়, বহু মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে সারা পাহাড়টা জুড়ে। তরতর করে নেমে এলো নিচে। বুড়ো জো ঘরে যায় নি, শক্ত খোলের নিচে নিজেকে লুকিয়ে রেখে পার করে দিয়েছে সব ঝড় বৃষ্টি বিপর্যয়।

শুনেছিস ?

অনড়, অটল একটা প্রস্তরখণ্ড। সাড়ার লক্ষণও নেই।

মেয়েটা আমার এই ডান হাতটা ধরেছিল, জানিস? কী রে? ও ঘুমোচ্ছিস বুঝি? আচ্ছা ঘুমো।

একটা ঝরনার জলে নিজেও স্নান সেরে নিলো জো, তারপর লম্বা প্যান্টটা আবার পরে নিয়ে কম্বল জড়িয়েই ওপরে উঠে এলো সে নিজের ঘরে। আশ্চর্য ঘটনা, তার নিজের খাটে বিছানার ওপরে লাল একটা শাড়ি পরে বসে আছে মেয়েটি।

বললে, কথা কইবো বলে বসে আছি।

জো বললে, পরশুই তো বিশ্ব আসছে।

—আসুক।

—চলেই তো যেতে হবে তোমাকে।

—যাবো,—বলেই মেয়েটি আবার হাসে, বলে, না-ও যেতে পারি।

—সে উপায় নেই। ওদের চেনো না?

মেয়েটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, দেখ, সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কোথাও যাবো না। এখানেই কাটিয়ে দেবো বাকী জীবন! এটাকেই বানিয়ে নেবো আমার স্বপ্নের গুজরাট!

—কেন?

মেয়েটি বললে, মানুষ তো অনেক দেখলাম। এবার নির্জনতাটাই ভাল করে অনুভব করে দেখি। থাকতে দেবে না আমাকে তুমি এখানে?

উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছে জো, বললে, কিন্তু ওরা দেবে কেন?

ওদের সামলানোর ভার আমার ওপর। ভেবো না, ওদের পোষ মানাতে হয় কী করে তা আমি জানি। জানি না তোমাকে। তুমি খাঁটি পুরুষ—মনের দিক থেকেও।

ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে জো। কনভেন্টে পড়া মেয়ে কত কথা জানে, যার মানেও বোঝা যায় না সব সময়।

মেয়েটি বললে, মানুষ দেখে দেখে আমি ক্লান্ত। থেকে যাই এখানে। তুমি যা বলবে করবো। তবে তোমার ঐ কাছিম মারা আর চলবে না। কাজ যখন করতেই হবে, নারকেল-পাড়ার কাজ ধরো। সারা বছরের রুটির পয়সা ওতেই চলে আসবে। তারপরে দুটি-একটি খোকা-খুকু যদি আসে—

দুটি হাতে দুটি কান চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে আসে জো সেই ঝর্‌ঝর্‌-ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টিধারার মধ্যে।

—এই জো, শুনছিস?

সে কিন্তু তেমনি অনড়, অবিচল। বাতাস টেনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুম্ভক করে ওভাবে ওরা থাকতে পারে।

—এখনও ঘুমোচ্ছিলস্? সর্বনাশ হলো যে এদিকে। মেয়েটি কী বলে জানিস?

বৃদ্ধ প্রাণীটি নির্বিকার। তার পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে ভিজতেই থাকে জো, বিড়বিড় করে বলতে থাকে; তোর বুক আর চিরে ফেলা হবে না। কারুরই বুক আর চিরতে পারবো না। আমাকে এবার নারকেল পাড়ার কাজ করতে হবে। তা আমি খুব পারি। কিন্তু জোনাথানরা যদি রাজী না হয়? রাজী না হয় তো ওদের শেষ করবো।...কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল জো। না-না হিংসে করতে নেই। ওই যে কাদের কথা বললো মেয়েটা, মাছমাংস খায় না, কাউকে হিংসেও করে না, সেই জাতের মতো হবে সে।

পরদিনও অমনি ঝড়। বুড়ো জোকে কোনক্রমে হটিয়ে-হটিয়ে তার ঘরে উঠিয়ে রেখে এলো জো। বললে, ঘরে থাক্। আমিও ঘরে থাকবো। মেয়েটা কী বলে জানিস? বলে, লোক তুমি ভালো। সঙ্গী নেই সাথী নেই একা একা থাকতে থাকতে তোমার মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁরে, তোরও তো জুড়ি নেই, তোর মাথাটা আবার খারাপ হয় নি তো!

বলতে-বলতে নিজেই হেসে উঠলো জো, বললে, মাথাইনেই, তার মাথা ব্যথা। মাথা কই তোর! আছে তো দুটো জলজলে চোখ! আমারও আছে। মেয়েটি বলেছে আমার চোখ দুটো নাকি সুন্দর!

পরদিন বিকেলের দিকে ধীরে ধীরে থেমে গেল ঝড়। কিন্তু কোথায় জোনাথান-জোহার আর বিশ্ব? জো আবার নিচে এলো, বুড়োর ঘরটা খুলে ওকে বাইরে ঠেলে দিয়ে বললে, থেমেছে বৃষ্টি। আর কেন। এবার একটু ঘুরে বেড়া।

বৃদ্ধ জো কোনক্রমে হাঁটতে হাঁটতে নিজের জায়গাটিতে এসে বসলো—মুখ বার করে বালি সরিয়ে।

মেয়েটা মরেছে জানিস! আমাকে ছাড়া থাকতে চাইছে না। বলছে, কোথাও আমি যাবো না। মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চায়। তা বিয়ে করে ফেলি, কী বলিস? ওই যে পাহাড়ের ওপরের লম্বা পাথরটা, ওর উপরে একটা পাথর চাপিয়ে 'ক্রস' তৈরি করেছি। মেয়েটিকে বলেছি, ওই আমাদের গির্জে। ওখানেই বিয়েটা হবে। ওই জায়গাটার নাম কী দেবো, জানিস? গুজরাট। কী, অমন করে চাইছিস কেন? কথাটা মনে ধরছে না? না-না, তোকেও দেখবো রে, সমান যত্ন করবো। মেয়েটাকেও পাঠাবো তোর কাছে। দু জনে মিলে যত্ন করবো।

কিন্তু এর পরদিনই এলো ওরা। যেই লক্ষ, সেই বার্থ। জো বললে, আমি আর কাছিম কাটবো না।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওরা।

বিশ্ব গিয়েছিল ওপরে, মেয়েটির কাছে। সে হাসতে হাসতে নেমে এলো ওদের কাছে, বললে, ওহে পাহাড়ের মাথায় চার্চ হয়েছে। মেয়েটা বিয়ে করছে জো-কে।

জোনাথান আর জোহায় হাসবে কি কাঁদবে, বুঝে পেলো না। জোনাথানের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বিশ্ব বললে, মেয়েটি আজীবন থাকবে এখানে জো-র কাছে।

এতক্ষণে কলরব করে উঠেলা ওরা, তা কী করে হবে?

হোক! বিশ্ব বললে, জো আমাদের অনেক করেছে। ওর জন্য এটুকু স্বার্থত্যাগ আমাদের করতেই হবে। জয় হোক জো-র।

অতি সহজেই মিটে গেল ব্যাপারটা। জো-কে বাদ দিয়ে ওরা নিজেরাই কাটতে লাগলো কাছিম। ওরা বললে, ওর বিয়ে দিয়ে তারপরে আমরা ফিরবো।

জোনাথান বললে, বিশু, বুড়ো কাছিমটাকে কাটতে হবে যে! ওর খোল না হলে তো বিয়ে হবে না। জানো না বুঝি? আমাদের সিসেলিয়ানদের এই নিয়ম। ওই খোলে কিছু মসলা আর শাকপাতা জল দিয়ে ঢেলে সিদ্ধ করতে হয় উনুনে। সেই জল না মুখে দিলে বিয়ে সিদ্ধ নয়। ছোট কাছিমের খোলে চলবে না, চাই একেবারে বুড়োটার মত 'টেসটিডো এলিফ্যানটিয়া'র খোল!

সারাটা দ্বীপে 'টেসটিডো এলিফ্যানটিয়া' আর একটিও নেই ওই বুড়ো জো ছাড়া! কথাটা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সে 'বৃদ্ধ'র কাছে। প্রথমে মনে হলো—না-না, ওকে সে কাটতে দেবে না। কিন্তু ওর ওই পোখরাজ মণির মতো চোখের বিদ্যুতের মধ্যে অদ্ভুত এক ব্যঙ্গের ঝিলিক লক্ষ করে যেন সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো জো। তার মনে হলো—এইবার ঠিক হয়েছে। দশ-দশটি বছর ধরে প্রতিটি সকাল আর বিকেল ও যেন ফাঁকি দিয়ে এসেছে তাকে। এতদিন এত জীব সে মেরেছে, এত জীবের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলা করেছে সে, এই বৃদ্ধ নিজের চোখে সব দেখেছে আর মিটিমিটি করে তাকিয়েছে তার দিকে, যেন বলেছে, আমাকে কাটতে আর যে-ই পারুক অন্তত তুমি পারবে না। কিন্তু এইবার উৎকট আনন্দে একেবারে চিৎকারই করে উঠেছে জো, বিয়েতে তোমাকে লাগবেই, আমাদের নিয়ম! নিয়মের বাইরে যেতে পারি না, কখনই পারি না! কিন্তু যাই-হোক নিয়ম, জো

কি সত্যি বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত এবং এই নির্জন দ্বীপে বাস করবে নাকি মেয়েটিকে নিয়ে? পাগল হয়ে যাবে, পাগল হয়ে যাবে মেয়েটি তার সঙ্গে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে! কিন্তু তবু লোভ! তবু ভীরু কল্পনা একটি ঘরের, একটি স্ত্রীর, আর সন্তানের! কিন্তু তারপর? তারা ফিরে যাবে একদিন ভিক্টোরিয়ায়, কিন্তু কী দেবে পিতৃ-পরিচয়? বলবে কী যে, জঘন্য অপরাধে অপরাধী এক ফেরারী পিতার পুত্র তারা? না-না, তা হয় না। তার চেয়ে, এই পশুর মতো কচ্ছপের হৃৎপিণ্ড চিরে বার করবার কাজ অনেক ভালো!

পাঁচ-ছ-টা দিন তারপর কেটে গেল নিষ্ক্রিয়ভাবে। মেয়েটাকে এড়িয়ে আপন মনে কী যেন ক্রমাগত ভাবছে সে। জোনাথান ঠাট্টা করে বলে, জোর চিন্তা কিন্তু অন্যদিকে। হবু-বর পালায় কোথায়?

যে মাংস কাটতে জো-র লাগতো একদিন, কি দুদিন, সে কাজে ওদের পাঁচ-ছ-দিনের বেশি লাগছে। দেখে দেখে হাত নিশপিশ করে ওঠে। অথচ ওতে হাত দিলে হয়তো ক্ষেপেই যাবে গুজরাটের মেয়ে।

অবশেষে একদিন সারারাত বিনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরবেলায় উঠে বসলো জো। ওরা সবাই উঠোনে ঘুমে আচ্ছন্ন, মেয়েটির ঘরের দরজাও বন্ধ। তাড়াতাড়ি ও নেমে এলো নিচে, বললে, শুনছিস? মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। নইলে আমাকে বিয়ে করতে চায়? না-না, আমি তা হতে দিতে পারি না। এখানে দিনের পর দিন একা থাকতে-থাকতে ও মরেই যাবে। আমি থাকি, আমার আর কোথাও স্থান নেই, তাই। কোথা থেকে এসেছিল আমার পূর্বপুরুষ, আরব, কি মিশর, তা-ও জানি না। ওর বাবার ডায়রি থেকে ও তো জেনেছে, ও কোথাকার মেয়ে! ও চলেই যাক সেখানে।

কথাটা ভাবতে-ভাবতে এতদিন পরে যেন মনে একটা মুক্তির হাওয়া এসে লাগে।

সে আগের মতো চকচকে দা দিয়ে আবার কাটতে আরম্ভ করে কাছিমগুলো, রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডগুলি বার করে আনতে থাকে দু-হাতে করে!

—এ কী করছো?

হলদে শাড়ি পরে তার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, বেদনার্ত দুটি চোখের দৃষ্টি—বললে, বারণ করেছিলাম না!

একমুহূর্ত নিস্পন্দের মতো ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তারপর হো-হো করে হেসে উঠলো জো, শুনবো কেন তোমার বারণ! তোমাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু এ আমি ছাড়তে পারবো না!

ক্ষোভে-দুঃখে আরক্ত দেখায় মেয়েটির মুখ, দুটি চোখ যেন জ্বলতে থাকে, বলে, এই তোমার মনের কথা ?

—হ্যাঁ।

দুরন্ত ক্রোধে এবং উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে মেয়েটির কণ্ঠ, সে বলে, উঠে এসো বলছি।

এবার আরেকটি হৃৎপিণ্ডে চকচকে ইস্পাতের আঘাত দেয় জো, গলগল করে বার-হওয়া রক্ত ধারায় আঙুলগুলি রাঙাতে রাঙাতে সে অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, না। তুমি যাও।

—উঠে এসো বলছি।

—না। তুমি যাও।

—না। দুর্দমনীয়-ক্রোধের আবেগে মেয়েটি তখনও কম্পমান, বলে—আচ্ছা বেশ, তাই হবে।

দ্রুত পায়ে চলে যায় মেয়েটি ওর কাছ থেকে। আরেকটি জীবকে অভ্যাস মতো কাছে টেনে নিয়ে আঘাত করতে গিয়ে চকচকে দা-টা তার হাত থেকে কিন্তু এবার পড়ে যায়। আর সে উঠিয়ে নেয় না সেই দা-টা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, নিচে নামে, এধারে-ওধারে উদাসীর মতো ঘুরে-ঘুরে কী যেন ভাবে, এক সময় অন্য ঘুর-পথে উঠে আসে সে পাহাড়ের মাথায়, তার গির্জের কাছে সে বসে থাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুটি চোখ আপনিই বুঝি ভরে আসে জলে!

কেটে যায় দুটি দিন এমনি করে। বিশ্বের সঙ্গে মেয়েটি একান্তে কী আলাপ করে কে জানে, জো থাকে ওদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে।

দুদিন পরে জোনাথানরা শুনতে পায় কথাটা। জো নয়, বিশ্ব মেয়েটিকে বিয়ে করছে। এখানেই, এই ভূমিখণ্ডেই। জো-র গির্জেতেই হবে বিয়ে। শুনে ওরা ঠাট্টা করে জো-কে, কী রে ফসকে গেল!

জো পশুর মতো আবার দা-টা হাতে তুলে নিয়ে বাকি কাছিমগুলিকে কাটতে শুরু করে। চিৎকার করে ওঠে থেকে থেকে, সেই আগেকার মতই বৃদ্ধ জোকে বলে, দেখছিস কী, এবার তোকেই কাটবো।

কথাটা সত্যিই হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। গির্জে থেকে বর-কনে নেমে এসে বসেছে ঘরে, জোনাথান-জোহাররা আমার গায়ে ফুল লাগিয়ে ঘোরাফেরা করছে। কে যেন হেঁকে বললে, কই, কোথায় সেই কাছিমের খোলটা? ওটা না হলে বিয়ে হবে কী করে? জোহার বোধহয় ওকেই ঠাট্টা করে কী যেন বলে উঠলো!

জোনাথান বললো, পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? খোলটা নিয়ে আয়! কাটতে মায়া হচ্ছে নাকি? জোহার হেসে বললো, মায়া! ওতো একটা কসাই! কাছিমের বুক চিরে চিরে বুড়ো হয়ে গেল, ওর আবার মায়া-মমতা! জোনাথান বললে, তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে? না কি শেষ পর্যন্ত হিংসে হচ্ছে বিশ্বের ওপর?

বলেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠলো সে। পাগলের মত ছুটে ওদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল জো। হাফপ্যান্টপরা খালি গা—হিংস্র জন্তুর মতই গুঁড়ি মেরে মেরে বুড়ো জো-র কাছে এসে বসলো চকচকে প্রকাণ্ড খাঁড়াটা নিয়ে। একটু দম নিয়ে তারপর বললে, সত্যিই তোকে দরকার। তোর খোলটা না হলে নাকি বিয়ে হবে না! দে, দে তোর খোলটা!

বলতে বলতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায় ওর কণ্ঠ। থরথর করে কাঁপতে থাকে সমস্ত দেহটা। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপরেই আস্বাভাবিক শক্তিতে পশুর মতো একটা হাঁক দিয়ে দু হাতে সজোরেই উল্টে ফেললো 'বুড়ো জো'-কে। তারপরে চকচকে ধারালো খাঁড়াটা দিয়ে ওর হৃৎপিণ্ডটা চিরতে গিয়ে অতর্কিত বিস্ময়ে থমকে থেমে গেল জো।

কাকে সে কাটবে? তাকে যে সে সত্যিই একদিন কাটতে পারবে, এটা দেখবার আগে বৃদ্ধ নিজেই চলে গেছে সব কাটা-ছেঁড়ার বাইরে। বোধহয় অভিমানে, এক নিদারুণ দুঃখে, অব্যক্ত অভিমানে।

হাতের খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় জো, জোনাথানকে উদ্দেশ্য করে কোন-ক্রমে বলে, নিয়ে যাও এই খোলটা, দাও গিয়ে বিয়ে।

সে নিজে আর দাঁড়ায় না, তরতর করে নেমে যায় নিচে, আরও নিচে। নিস্তরঙ্গ সরোবরটা ছাড়িয়ে ক্ষুব্ধ আর উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে।

ভিক্টোরিয়ায় জো-র একটা বিবর্ণ ছবি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে জো-র কাহিনী শেষ করলো বিশ্ব, বললো,—সেই থেকে জো-কে আর কেউ কখনো কোথাও দেখতে পায় নি।

আজও জনসমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের ওপরে এতক্ষণে উঠে দাঁড়ানো সেই লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল—সত্যি কথা, তাদের সচরাচর দেখাও যায় না।

ম্যাট

কবি কোলরিজের সেই বিখ্যাত কবিতা 'পুরানো নাবিকের কাহিনী' যাদের পড়া আছে, তাঁরা আমার গল্পের এই অদ্ভুত চরিত্রটিকে সহজেই বুঝতে পারবেন! আমার এই চরিত্রটিও নাবিক, এবং বহু পুরাতন নাবিক। সেই জীর্ণশীর্ণ জরাগ্রস্ত অথচ দীঘল চেহারা,—রাত্রের অন্ধকারে ভয়াবহ বলেই মনে হবে। কোলরিজের নাবিকের বর্ণনা দিয়ে এরও হুবহু বর্ণনা করা চলে। তফাৎ শুধু আমাকে নিয়ে। আমি কোলরিজের কবিতা অনুযায়ী কোনো বিবাহের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলাম না,—ছিলাম উমেদার। চাকরির উমেদার। একেবারে নির্মম বাস্তব। বাংলায় চাকরি নেই, তাই, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ঘুরে বেড়াচ্ছি এদেশ-ওদেশ কাজের চেষ্টায়। কীভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটা সবিস্তারে বলা চলে না, রেল কোম্পানীর কর্মীদের চোখে পড়লে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

হট্টমন্দিরে শয়নের কথাটা বুঝতে কষ্ট নেই, কিন্তু যত্রতত্র ভোজনের কথায় সন্দেহের অবকাশ আছে। এই 'যত্র-তত্র'-এর সঙ্গে যদি 'ছত্র' যোগ করা যায়, তাহলেই আমার ভোজনের ব্যাপারটা যথেষ্ট সরল ও সহজ হয়ে আসে। তিনদিন করে ছত্রে থাকছি। কারণ তিনদিনের বেশি ছত্রে থাকতে দেয় না। আর ঘুরে বেড়াচ্ছি দক্ষিণ ভারত, চষে বেড়াচ্ছি বললেও চলে। কিন্তু ফসল ফলছে না। এই রকম এক নিষ্ফল রাত্রেই লোকটির সঙ্গে দেখা। নাম করবো না ভারতের পশ্চিম উপকূলের একবারে প্রান্তবর্তী একটি শহর,—ছোটখাট বন্দরও বলা চলে। নারকোলের শাঁস আর লবণের আমদানী রপ্তানীর সমারোহই বেশি। দেশি পালতোলা ছোট জাহাজের সারি দাঁড়িয়ে, কিছুদূরে দু'একটি কলের জাহাজকেও দেখা যায় মাঝে মাঝে নোঙর ফেলে ব'সে থাকতে।

কিন্তু সেই দিনটা সকাল থেকেই ছিল ভয়াবহ। মেঘে ঢেকে আছে আকাশ। সোঁ-সোঁ বাতাস। সমুদ্রের বুক ফুলে উঠেছে। সেই স্ফীত বক্ষ থেকে মত্ত ব্রেকারগুলো শিকারলোভী শ্বাপদের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার মতো তীব্র শুভ্রতায় ঝল্‌সে উঠে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে!

বন্দরে সতর্কতার সীমা নেই। কলের জাহাজ দুটি নোঙর তুলে আরও দূরে সরে গেল। পালতোলা কাঠের জাহাজগুলো বারবার মুখ ঘুরিয়ে রাখছে বাতাসের

গতি বুঝে বাতাসের অভিমুখে। জাহাজের ছুঁচলো মুখ বাতাসের প্রতিকূলতা কাটিয়ে যাবার উপযোগী, কিন্তু সাবধান, বাতাস যেন জাহাজের গায়ে এসে ধাক্কা না মারে, তাহলে সহজেই উল্টে যাবার সম্ভাবনা।

চারিদিকেই একটা সতর্কতার ভাব, একটা 'সাবধান-সাবধান' রব, ডুবুরিরা মুক্তার খোঁজে যায়নি আজ, জেলেরাও বেরিয়ে পড়েনি তাদের নৌকা নিয়ে মাছের সন্ধানে। সবই দেখছি চোখের সামনে, কিন্তু আমি বাঙলাদেশের ছেলে, সমুদ্রের ঝড়-সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, সারাটা দিন ছত্রের মধ্যে আটক থেকে হাঁপিয়ে উঠলাম। সন্ধ্যা ঘন হ'তে না হ'তেই পড়লাম বেরিয়ে। তেমন বৃষ্টি নেই, বাধা কী বেরিয়ে পড়তে? ছত্রের দু'একজন অবশ্য বারণ করেছিল, কিন্তু কে শোনে ওদের কথা?

চারদিক একেবারে কালোয় কালো। আকাশ ঢাকা কালো মেঘে, সমুদ্রও অন্ধকারে কালো, শুধু সেই উত্তাল ঢেউয়ের ব্রেকারগুলো আরও দুর্নিবার বেগে এসে তীরভূমিতে ভাঙ্‌ছে! কী রুদ্ধ আক্রোশ!

বন্দর ছাড়িয়ে চলতে লাগলাম দূরে। বাতাসের বেগ তখন সাংঘাতিক, আমাকে শুদ্ধ না উড়িয়ে ফেলে! শেষে এমন হ'লো যেন পা ফেলতেও ভয় করছে! পা তুলছি, কিন্তু মনে হচ্ছে পা আর পড়বে না,—তার আগেই ছিন্ন পাতার-মতো উড়ে চলে যাবো!

বন্দর ছাড়িয়ে একটা টিলার মতন কিছুতে উঠেছি বোধহয়! কতকগুলো নারকেল গাছ প্রাণপণ যুদ্ধ করছে বাতাসের বিরুদ্ধে! নুয়ে পড়ছে অতবড়ো মাথা-উঁচু-করা গাছগুলো, আবার মাথা তুলছে, আবার নুয়ে পড়ছে! বাতাস যেন অতিকায় দৈত্যের মতো টুঁটি টিপে ধরেছে ওদের।

দূরে, বন্দরে, যেখান থেকে সার্চলাইটা ফেলছে মাঝে মাঝে, সেই ক্ষুদ্র সিগন্যাল্‌ অফিসের মাথায় জ্বলছে দুটো লাল আলো—বিপদসূচক সংকেত! আর চারদিক জুড়ে একটা তীব্র সোঁ-সোঁ শব্দ! যেন অতিকায় একটা কালো সাপ ফণা তুলে অনবরত ক্রুদ্ধ গর্জন করছে!

ঠিক এমনি মুহূর্তটিতেই লোকটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। যখন পা ফেলতে পারছি না ঠিক ক'রে, চোখ চাইতে পারছি না, বালির কণা বাতাসে উড়ে আসছে,—পাথরের ক্ষুদ্র টুকরোও দুটো-একটা উড়ছে বোধ হয়, গায়ে এসে বিঁধছে, গড়ানো আলগা কোন পাথরে পা দিয়ে গড়িয়ে না যাই,—এই রকম বিহ্বল অবস্থা—লোকটি এসে ধরলো আমার হাত। লোহার মতো শক্ত আর বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত। বললো, ভয় নেই, এসো আমার সঙ্গে।

বেশিক্ষণ হাঁটতে হয়নি, কিন্তু কোথায় এলাম তা' বুঝতে পারিনি। সবই ত গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। লোকটির পাশে যখন তারই নির্দেশ মতো বসলাম, তখন এইটুকু বুঝেছিলাম, যেখানেই এসে থাকি, মাথায় একটা ছাদ আছে। জানালা নেই, ছাঁট আসছে না! শুধু যেখানটা দিয়ে ঢুকেছি, সেটা আমাদেরই ঠিক সামনে এখন, দরজার আকার, কিন্তু কপাট নিশ্চয়ই নেই, থাকলে আমার সঙ্গী ঠিক সেটা ভেজিয়ে দিতো। যাই হোক, দরজাটা বাতাসের গতির বিপরীত মুখে ছিল, তাই বাতাসের কশাঘাত থেকে বেঁচেছিলাম। আর বেঁচেছিলাম বালির কণার হাত থেকে! ঝড়ের মুখে ওই বালির কণাই যে কী ভয়ানক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবেন না!

লোকটি বললে, জীবনের মায়া যে নেই তা'ত বুঝেছি, নইলে এই সর্বনাশের সামনে বেরোয় কে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই সে একটু ধমকের সুরে বললে,—থামো। কতো কী ঘটতে পারে আজ, তা জানো? সমুদ্র ক্ষেপে ছুটে আসতে পারে ভিতরে! গাছপালা-বাড়িঘর দোর সব তাসের মতো ভেঙে পড়তে পারে! এরকম ঝড় জীবনে কখনো দেখেছো?

—না।

—শোনো। শুনে যাও। কেন শোনাচ্ছি জানি না, কিন্তু বলতে আমাকে হ'বেই।

বললাম,—তুমি কে, জানতে পারি কী! আর, এ কোথায় আমরা ব'সেছি এসে?

লোকটি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। যেখানে আমরা এসেছি, এটা যে কারুর বাসগৃহ নয়, তা' বোঝা যায়; কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর ভ্যাপ্‌সা গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। একটা চামচিকে মাথার ওপর উড়ে উড়ে পোকা ধরছে!

নীরবতা ভঙ্গ করলো লোকটিই প্রথম। বললো,—তুমি নিশ্চয়ই এদেশের লোক?

বললাম, না। কেন?

লোকটির কণ্ঠস্বরে এবার বেশ আগ্রহ ও উত্তেজনার আভাষ পেলাম, বললে,—তুমি এদেশের নও? তবে কোথাকার?

—বাঙলা দেশের।

—ও! উত্তেজনার স্ফুলিঙ্গ ততক্ষণে নিভে গেছে, বললে,—ঐ একই কথা। তুমি ভারতবর্ষের লোক।

—হ্যাঁ। আমি ভারতবর্ষের! তুমি?

চুপ ক'রে গেল লোকটি। বাতাস বাইরে আগের মতোই হুঙ্কারে মত্ত। অন্ধকারে লোকটিকে মোটেই দেখতে পাচ্ছি না, অনুভবে বুঝতে হচ্ছে যে একটি লোকের পাশে বসে আছি।

বললে,—আমি বাইরের লোক। জাহাজী নাবিক! আজীবন জলে জলে কাটিয়েছি—সমুদ্রে সমুদ্রে। আমার কেউ কোথাও নেই, জলই আমার মা-বাপ, জলই আমার ঘর, জলই আমার সব। কিন্তু জলে ভেসেও যারা মাটির স্বপ্ন দেখে, তারা আমাকে শেষপর্যন্ত পাগল সাব্যস্ত ক'রে কলঘোতে ফেলে গিয়েছিল! আমি পালিয়ে এসেছি। বন্দর দেখলে বা জাহাজ দেখলে অন্তরটায় টান পড়ে, সব ভুলে কাছে এসে পড়ি, কিন্তু আমার কাপ্তেনের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে আবার পালিয়ে যাই। আমার কাপ্তেন বড়ো কড়া লোক। আমাকে ধরবার জন্য প্রত্যেকটি জাহাজে সে কাপ্তেন হ'য়ে বসে আছে! বুঝতে পারছো, কী ভয়ানক!

মনে মনে চমকে উঠলাম। এ যে দেখছি এসে পড়েছি এক বদ্ধ পাগলের পাল্লায়! কিন্তু এড়াবোই বা একে কীভাবে? বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব চ'লেছে, তার মধ্যে গিয়ে পড়বার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

—শুনছো তো?

ভয়ে-ভয়ে বললাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমি তোমাকে একটা গল্প বলবো এবার!

মনে-মনে বললাম, গল্প কেন, যা খুশি তোমার, তা-ই বলো। শুধু পাগলামীটা দৈহিক ক্রিয়ায় পর্যবসিত না হলেই হলো!

লোকটি বললো,—বহুদিন আগেকার কথা।

মনে মনে উত্তর দিলাম,—দেড়শো-দুশো বছর আগেকার কথা বললেই বা তোমায় ঠেকায় কে? বললো, ক্রুজে চ'লেছি এই ভারত মহাসাগরেই। নাবিকদের মধ্যে সবাই ইয়োরোপীয়ান্, শুধু একজন নিগ্রো। দাস-হিসাবে নেওয়া হয়েছিলো আফ্রিকার কোনো এক বন্দর থেকে।

—দাস হিসাবে! দাস-ব্যবসায় ত বহুদিন···

লোকটি ধমকে উঠলো,—তুমি থামো দেখি। বাধা দিও না। নিগ্রোটির নাম দিয়েছিলাম—জন্। খুব খাটিয়ে নিতাম জনকে। শুধুই কী খাটানো? রীতিমতো অত্যাচার চলতো ওর ওপর। অহেতুক নিষ্ঠুরতা। আমরা সেকেলে নাবিক, উদ্দাম আমাদের জীবন। সেই উদ্দামতা কখন যে মত্ততার মুখে চরমে উঠ্তো, তা' নিজেরাই জানতে পারতাম না! দিনের পর দিন—জল আর জল

—যে দিকে তাকাই বিস্তীর্ণ জলরাশি! মাটির তৃষ্ণায় আমাদের সব-কিছু যেন শুকিয়ে আসছে—প্রাণমন : তবু অস্থিরতায় ভরা, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটতো নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে। তার ওপর আমরা যেন ঐ কৃষ্ণবর্ণ দাসটিকে মানুষ ব'লেই গণ্য করতাম না! যেন একটি পালিত অথচ অবহেলিত পশু! মন ভালো না থাকলে তাকে কাছে ডেকে এনে আদরের বন্যা বইয়ে দিতাম, মন ভালো না থাকলে করতাম অত্যাচার। বর্ণনায় বাহুল্য কিছু এনে লাভ নেই, আমাদের অদ্ভুত মানসিকতা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝবে। কিন্তু যা বলছি' শোন,—সব রকম কাজ করানো হচ্ছিল তাকে দিয়ে—ষ্টিয়ারিং হুইল-চালনা থেকে পাল-তোলা পাল-গুটানো পর্যন্ত!

—সে কী! পালতোলা জাহাজ!

আবার ধমক :—তুমি থামবে কি না!

মনে মনে বললাম,—অচ্ছো বাবা, বন্ধ করলাম মুখ। এই ১৯৫৩ সালের ঝড়ের রাত্রিতে ব'সে তোমার অষ্টাদশ শতাব্দীর গল্পই শুনি। কল্পনা করা যাক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক সেটা। ওয়ারেন হেষ্টিংস মেজর ব্রাউনকে দিল্লীতে পাঠিয়েছে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে সাক্ষীগোপাল রেখে মোগল সাম্রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু ইংরেজের দখলে আনার জন্য। কিন্তু লাসওয়ারীর যুদ্ধ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি মোগল সম্রাটের 'ওয়াকিল-ই-মুতলাক মহাদজী সিন্ধিয়ার জন্য। সম্ভবত সেটা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ;—রোহিলা গোলাম কাদের মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে সিংহাসনচ্যুত করে, এবং সে নিজে শাহ্ আলমের বুকের ওপর ব'সে ছোরা দিয়ে তার একটি চোখের তারা উপড়িয়ে ফেলে।...

চমৎকার! নিজের চিন্তাধারায় নিজেই চমৎকৃত হলাম মনে মনে! ইতিহাসের এত খুঁটিনাটি মনে আছে আমার! এত স্পষ্ট হ'য়ে!...অদ্ভুত তো! এবং সে রাত্রিতে ঐ বিচিত্র লোকটির পাশে ব'সে বেছে বেছে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের কথাই বা আমার হঠাৎ এত উজ্জ্বল হয়ে মনে পড়েছিলো কেন, সেটা আজও একটা বিরাট বিস্ময় হ'য়ে আছে আমার জীবনে! কিন্তু থাক এসব ঐতিহাসিক চিন্তা, যা বলছিলাম......

নাবিক বললে,—ভারত মহাসাগরে কতো নাম-না-জানা অদ্ভুত অদ্ভুত দ্বীপ আছে! কতো জনহীন ছোট-ছোট দ্বীপ! সামুদ্রিক কচ্ছপ অথবা পাখীদের মেলা!

—তারপর?

থেমে গেলো। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললাম, বাধা দিও না। কুজে

চলেছি। জন্‌কে নিয়ে হুইলে আছি। ও হুইল ঘোরাচ্ছে, আমি পাশে দাঁড়িয়ে শেখাচ্ছি ওকে। ব্রীজ থেকে কাপ্তেন তার নির্দেশ জানাচ্ছে,—ডানদিকে এতটা ঘোরা—বাঁদিকে এতটা ঘোরাও! আমরা উত্তর দিচ্ছি। উত্তর আর কী, তারই আদেশের পুনরাবৃত্তি। এই-ই নিয়ম। উত্তর দিতে একটু দেরি হলেই সে খেঁকিয়ে উঠছে,—কী হে, মরে গেছ নাকি তোমরা দুজনে? কফিন তৈরি করবো? না, হাঙরের মুখে ফেলবো!…

বাতাস নেই, পালগুলি মাস্তুলের গায়ে জড়িয়ে আছে। কিন্তু ও পাগলটা অষ্টাদশ শতাব্দীর গল্প পেলো কোথা থেকে? গল্পের মধ্যে ত আবার নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে ব'সে আছে!…পাগলের খেয়াল,—অষ্টাদশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দী সব একাকার হ'য়ে গেছে ওর কাছে!

লোকটি শুরু করলো,—মরিসাসের এক বন্দর থেকে উত্তরে রওনা হয়েছি আমরা। জন্ এমনিতে খুব ফুর্তিবাজ লোক, খুব মিশুকে আর আমুদে, সঙ্গী ছাড়া সে থাকতে পারে না। প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এক শক্তিমান যুবক। হুইল ঘোরাচ্ছে আর বকবক ক'রে যাচ্ছে সাত-সতেরো রকম। আমার নিজের মনটাও হয়তো সেদিন ভালো ছিল, নইলে চড়-চাপড়-লাথিতে ওর বকবকানি অনেক আগেই বন্ধ ক'রে দিতাম। এক নিগার আমার সমকক্ষ হ'য়ে রসিকতা করছে, অন্যদের মতো আমিও তা' সহ্য করতে স্বভাবতই রাজী নই! কিন্তু, কিছুদিন থেকে কী হয়েছে, জন্‌কে খুব অসহ্য লাগছে না। নাবিকের বিচিত্র মন! তখন আমার মনে এই ধারণাটাই দৃঢ় হ'য়ে বসতে আরম্ভ করেছে, আমার কেউ নেই, সমুদ্রই আমার সব! সমুদ্রই আমার সর্বস্ব। আমার দেশ নেই, ঘর নেই, সমুদ্রেই আমার জন্ম, সমুদ্রেই আমার শেষ হবে! বিস্মিত হয়োনা, ক্রমাগত সমুদ্রে থেকে থেকে নাবিকদের এই ধরণেরই এক মানসিকতা গড়ে ওঠে এক-এক সময়ে।

ঠিক এমনি সময়েই হাতের কাছে পেলাম জন্‌কে। অম্লান বদনে ফাই-ফরমাস খাটে, আমি ওর প্রলাপ শুনে যাই দেখে, আমার বিশেষ অনুগত হয়ে পড়েছিলো ও। নতুন খৃষ্টান হয়েছে, বাইবেল আর বাইবেলের ঘটনা সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহ! আর একটা ধারণা ওর মনে-মনে জন্মাচ্ছে তখন,—দাসত্ব থেকে ও শীঘ্রই মুক্তি পাবে।

বলতে যাচ্ছিলাম, দাস-ফাস রেখে গল্পটা ব'লে যাও ত বাপু, ইতিহাসের জাবর কেটে দরকার নেই! কিন্তু ধমক খাবার ভয়ে চুপ করে গেলাম। নাবিক বলতে শুরু করলো,—জন্ সেদিন শুরু করেছে তার প্রণয়িণীর গল্প। আফ্রিকা-নিবাসী এক তরুণী। তাকে খৃষ্টান ক'রে ও তার নাম দেবে মার্থা। তোমাকে বলা কর্তব্য, এই মার্থাকে নিয়ে আমরা ওকে রীতিমত অস্থির ক'রে তুলতাম

খেলিয়েনা কখনো বলতাম,—ওহে জন্, তোমার মার্থা এখন কী করছে বলো তো?

মার্থা? একটু ভেবে জন্ বলতো,—এখন বেলা পড়ে এসেছে, মার্থা কুঁজো নিয়ে ইঁদারার চলেছে জল তুলতে!

—তোমাকে ভাবছে না?

—নিশ্চয়ই ভাবছে। ভাবছে, জন্ আসবে, আমার জন্য নিয়ে আসবে একটা মেয়েদের গাউন!

হো-হো করে হেসে উঠতো এবার নাবিকরা। বলতো,—গাউনের যে খুব শখ!

হাসির একটা কারণ ছিল। গাউনের কথা উঠলে এই জন্যই হাসির ঝড় জাগতো! জন্ একবার তার এক আলোকপ্রাপ্ত বন্ধুর স্ত্রীর গাউন চেয়ে নিয়ে এসে তার প্রণয়িণীকে পরিয়েছিল। আলোকপ্রাপ্ত বন্ধুর নির্দেশ মতোই মার্থাকে জড়িয়ে ধরে তার স্ফীত অধরপুটে দিতে গিয়েছিল নিবিড় চুম্বন! মার্থা তার উত্তরে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ওর হাত থেকে।...ব্যাপারটা বুঝলে নিশ্চয়ই, চুম্বনরীতি ওদের মধ্যে ছিল না। জন্ পাগল হয়ে গেছে এই ধারণায় মেয়েটি কেঁদে কেটে অনর্থ করেছে, ওঝা ডেকেছে!

ডাকলাম,—জন্?

উত্তর দিলো,—জী মঁসিয়ে, সাত ডিগ্রি দক্ষিণ...

বাধা দিয়ে বললাম,—জাহাজ সাত ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখায় এসেছে তা জানি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জন্ তার প্রণয়িণীর কত ডিগ্রি দক্ষিণে এসেছে?

জন্ হেসে ফেললো, বলল,—মঁসিয়ে..

—বলো, বলো লজ্জা কী?

—মঁসিয়ে, আমি মার্থাকে নিয়ে ঐ জঙ্গল থেকে পালিয়ে আসবো। এই সব নির্জন দ্বীপ, এর কোনো একটা বেছে নিয়ে দুজনে মিলে থাকবো। মনের মতন ব্যবসা।

—আর কেউ থাকবে না?

—না।

—কোনো শিশুর কলকণ্ঠ?

—জী মঁসিয়ে,—বহু শিশুর কলকণ্ঠ। একশো বছর পরে যখন তুমি জাহাজ নিয়ে যাবে এখান দিয়ে, সেই ছোট্ট দ্বীপ তোমায় অভ্যর্থনা করবে। জা ব্রাঁতো ফ্যামিলি। হ্যাঁ, জন্ নিজের নাম দিয়েছিল: জা ব্রাঁতো।

হেসে বলেছিলাম, রাজী হবে তোমার মার্থা?

—রাজী হবে মঁসিয়ে। ও আমার সব কথায় রাজী।

—বটে? আর ওঝা ডাকতে ছুটবে না তো?

সলজ্জ হেসে জন্ বললো,—না। ওঝার ভার ঘাড় থেকে নেমে গেছে। মঁসিয়ে, এমন বুদ্ধিমতী আর নম্র মেয়ে ও তল্লাটে আর নেই। আমি এবার গিয়ে ওকে লিখতে শেখাবো। কতো সুন্দর সুন্দর চিঠি ও আমাকে লিখবে, তুমি দেখো। ও ভারী ভাবুক আর মিষ্টি মেয়ে।

—জন্?

—জী মঁসিয়ে?

—নির্জন দ্বীপে ওকে নিয়ে তো উঠবে এসে। করবে কী?

জনের চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখালো,—আমি ক্ষেত করবো। চাষবাস আর পশু-পালন। খামার আমার চমৎকার লাগে মঁসিয়ে। মার্থারও ভালো লাগে। মাঠের ধারে ফলন্ত ফসলের কাছে কাছে বসে আমরা কতদিন এইসব স্বপ্নের কথা বলেছি।

নাবিক হঠাৎ এই সময় অভাবিতরূপে থেমে গেল, তারপর আমাকে জিজ্ঞাসু লক্ষ ক'রে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—'স্বপ্ন—স্বপ্ন—মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন, বলতে পারো?' জন ছিল অত্যধিক স্বপ্নিল! আমরা কথায় কথায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম, জনের আশাবাদে এক এক সময় মনে হতো মাথার স্বপ্নই কী ওর মধ্যে এভাবে এই দুরন্ত আশাবাদের সৃষ্টি ক'রেছে! কথাটা মনে হতেই কাঁটার মতো মনে এসে বিঁধতো একটা অব্যক্ত ঈর্ষা! এবং সে ঈর্ষা যে কী প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে, তা লক্ষ করলাম জাহাজ ডুবি হ'য়ে এক নির্জন দ্বীপের আশ্রয়ে এসে। বেঁচে ছিলাম আমরা পাঁচজন, তার মধ্যে জন্ একজন। আমরা দু'মাস ধ'রে সেই পরিত্যক্ত নির্জন ছোট্ট দ্বীপটিতে প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি, তখনো জনের অত্যুগ্র আশার সমাপ্তি নেই।

বললাম—তোমাদের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ—নাবিক বলল,—আমাদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ে ডুবে যায়। কাপ্তেন শুদ্ধ মারা পড়ে! বেঁচে থাকি জন্‌কে নিয়ে আমরা পাঁচজন। থার্ড মেট্ও বেঁচেছিল, তার পকেটে ছিল কম্পাস।

কী ভাবে যে দুমাস কাটিয়েছি ঐ নির্জন ছোট দ্বীপে, তা তোমাদের আজ বোঝাতে পারবো না! এই জন্‌ই কীভাবে যেন পাথর ঘষে অস্ত্র তৈরি করে তাই দিয়ে বড়ো বড়ো সামুদ্রিক কচ্ছপগুলো মেরে নিয়ে আসতো। ঐ জনই চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতো কচ্ছপের মাংস, তাই আমরা প্রাণে মরিনি।

পাথরের খাঁজ কেটে কেটে তাতে জমিয়ে রাখতে বৃষ্টির জল, তা-ই ছিল আমাদের পানীয়। অবশ্য, অজস্র ছিল নারকেল গাছ। নারকেল পাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি করে দিয়েছিল আমাদের ঘর, সে-ও ঐ জন্। এক একদিন কেউ কেউ আমাদের মধ্যে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে উঠতো। তখন ঐ জন্ই শোনাতো আমাদের আশ্বাস বাণী, বলতো,—ভয় ক'রো না মঁসিয়ে, শিগ্‌গিরই জাহাজ আসবে, নিয়ে যাবে আমাদের উঠিয়ে। বাস্তবিক, সাদা-কালোর প্রভেদ সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল সেই দ্বীপে,—জন্ আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল অকপট বন্ধু।

থার্ড মেট্ একদিন বললে,—জানো হে, কোথায় আমরা এসেছি? সাতডিগ্রি ছয় মিনিট দক্ষিণ অক্ষরেখা, এবং ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সতেরো মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমারেখা।

আমার নোটবুকটা পকেটেই থাকতো। থার্ড মেট্ আর আমি চার্ট দেখে একদিন হিসাব করছিলাম। পাঁচ মাইল লম্বা দেড় মাইল চওড়া দ্বীপটা হবে না? তাহলে ঠিকই মিলেছে। এর নাম কোয়েতিভি আইল্যাণ্ড, সিচেলাস্‌মাহে থেকে দেড়শো মাইল দূর। বসতি নেই, নির্জন দ্বীপ।

—সে' তো দেখতেই পাচ্ছি।

—১৭৭১ খৃষ্টাব্দে কেভালিথর ড্য কোয়েতিভি এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। তাঁরই নাম অনুসারে একে কোয়েতিভি দ্বীপ বলা হ'য়ে থাকে।

জন এই সময় ছুটতে ছুটতে এলো, মঁসিয়ে—মঁসিয়ে।

—কী ব্যাপার, জন?

—জাহাজ, একটা জাহাজ!

জাহাজ! পাগলের মতো ছুটলাম টিলাটার ওপরে। পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলাম। জাহাজটা সত্যিই আসছে কাছে। আনন্দে চিৎকার করতে করতে চোখে জল এসে গেল। থার্ড মেট্ তো জড়িয়ে ধরলো জন্‌কে। জন্ শুধু বলতে লাগলো,—আমি বলে'ছিলাম না মঁসিয়ে। আমি বলেছিলাম—জাহাজ আসবেই!

জাহাজটি একটু দূরে গিয়ে নোঙর করলো। জাহাজের একটা লাইফ্‌বোট্ ভেসে এলো আমাদের নিতে। জাহাজটা ছয়দিন ছিল দ্বীপের পাশে বেঁধে। কী আনন্দে কী সমারোহেই না কেটেছিল সেই ছ'টা দিন। জন্ পাড়তে লাগলো অজস্র নারকেল। কাপ্তেন জাহাজ বোঝাই করলেন নারকেল আর, জীবন্ত সামুদ্রিক কচ্ছপ দিয়ে। যতদূর মনে পড়ে, একান্নোটা অতিকায় কচ্ছপ ধরা হয়েছিল।

ভোরে জাহাজ ছাড়বে, রাত্রে বিরাট উৎসব জমেছে তীরভূমিতে। নৃত্যগীত আর পানীয়ের উৎসবে সবাই মত্ত! জন্ একাই তার অদ্ভুত আফ্রিকায় নৃত্যে

আসর মাত ক'রে দিলো। নৃত্যের শেষে বললাম,—জন্। এই দ্বীপটা পছন্দ হয়? মার্থাকে নিয়ে এসে বাসা বাঁধো না এই দ্বীপে!

জন্ সোৎসাহে ব'লে উঠলো,—ঠিক বলেছো মঁসিয়ে। আমি যে-রকম ক'রে হোক মার্থাকে নিয়ে আসবো! কী চমৎকারই না হবে! জঁ। ব্রাতোঁ পরিবার!

·

নাবিক আবার থেমে গেলো। ঝড় সমানে বইছে। বললাম, তারপর?

এবার ধমক খেথাম না, কানে এলো অদ্ভুত কান্নাভরা কণ্ঠস্বর,—জীবনে 'পাপ করেছো কখনো? পাপের তীব্র জ্বালা কাকে বলে জানো?

থেমে গেলো বাইরে ঝড়ের হুঙ্কার। ভিতরের চামচিকেটা পোকা ধরতে ধরতে আমার কানের পাশ দিয়ে একসময় স'রে গেল যেন! নাবিক বললো,— মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতম ব্যবহারই বোধহয় সব থেকে বড়ো পাপ? তোমরা আধুনিক মানুষ, তোমরা কী বলো?

—বর্বরতা সমানে চ'লেছে। রকমটা বদলেছে মাত্র।

—ঠিক বলেছো, এ বদ্লায় না! যীশুখৃস্টরা আসে, বুদ্ধরা আসে,—তবু এ বদলায় না! বর্বর পশুটা ফাঁক পেলেই মানুষের রূপ ধ'রে সামনে এসে মুখ ব্যাদান ক'রে দাঁড়ায়! ওঃ কী ভয়ানক।

—কি হ'লো নাবিক।

—ঈর্ষা ঈর্ষা! আমাদের ঘর নেই—ঘরণী নেই—শুধু জল আর জল! সেই আমাদেরই মধ্য থেকে এক সামান্য কাফ্রী 'স্লেভ্' কি না স্বপ্ন দেখছে ঘর বাঁধবার! দেখছে সুমধুর সফলতার স্বপ্ন। আমাদের অন্তর-কন্দরে জেগে উঠলো সেই ভয়াল হিংস্র পশুটা!···

একটু থেমে আবার সে ব'লে উঠলো,—জানো কী হ'লো? জাহাজ নোঙর তুলেছে, শেষ লাইফ বোট্‌টায় আমি, আর আরও তিনজন। জন্‌কে নারকেল পাড়বার ছল করে গাছে উঠিয়ে আমরা জাহাজে ফিরে আসতে লাগলাম্। জাহাজ ওকে ঐ নির্জন দ্বীপটিতে একা রেখে পৈশাচিক আনন্দে ফিরে চ'লে গেল!

—কী বলছো, তুমি!

—ঠিকই বলছি, বন্ধু। রাত বোধহয় শেষ হয়ে আসছে। আমাকে সব কথা খুলে ব'লে যেতে দাও, শান্তি পাচ্ছি না।

জন্ চিৎকার করতে লাগলো তীরে দাঁড়িয়ে! ভয়ার্ত চিৎকার। আমরা তখন নিষ্ঠুর বর্বর আনন্দে মত্ত। বললাম,—তোমার মার্থাকে ডাকো! জঁ। ব্রাতোঁ পরিবার! হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ!···

কেউ কেউ বললো—ড্যাম্ নিগার !

জাহাজে ফিরে এসে সবিস্তারে আমরা আমাদের নিষ্ঠুরতার গল্প করেছি—সকৌতুকে। সবাই সমান আনন্দে তা উপভোগ ক'রেছে ! শুধু কাপ্তেনের দুরবীনটা নিয়ে একবার আমি দেখেছিলাম,—জন্ পাথরের মূর্তির মতো টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে !...আজ তার ঐ ভঙ্গিটির কথা ভাবতে গেলে এই কথাই মনে হয়,—যে মানুষকে সে এতো ভালবাসতো,—সে সেদিন সেই মুহূর্তে সমস্ত বিশ্বাস আর ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছিল সেই মানুষেব ওপর থেকে।

মাহে-সিচেলসে এসে বেশ কেটে যেতে লাগলো দিন। শুধু হারিয়ে ফেললাম নাবিকেব জীবন। নাবিকরা যে কী ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন তা' বোধ হয় জানো না,—জাহাজডোবা নাবিক শুনে কেউ আর জাহাজে কাজ দিতে রাজী হয় না,—তাই সিচেলাসেই বসতি স্থাপন কবলাম বলা যায়। সে' আবেক কাহিনী। পুরো এক বছর কেটে গেল, কিন্তু কী যে হলো আমার, প্রতি মুহূর্তে মনে পডতে লাগলো জন্‌কে। সে কী করছে ঐ দ্বীপে? বেঁচে আছে ত? কেমন চলছে তার জীবনযাত্রা? মার্থাকে সে কী আজো ভাবছে —আজো সে কী তেমনি দুরাশা নিয়ে ব'সে আছে যে একদিন জাহাজ আসরে তাকে নিতে, তার মতো এক সামান্য নিগ্রোকে তুলে নিতে সাগ্রহে এগিযে আসবে জাহাজ? মনুষ্যত্বে কী সে এখনো বিশ্বাস হারায়নি ?

অনেক চেষ্টাব পর এক মাছধবা-জাহাজে কাজ যোগাড ক'রেছিলাম ! বেশি দূবে নয, কাছে-কাছে যায়, একবার ভারতেব উপকূলও ঘুরে গিয়েছিল। এই জাহাজ সেবার হঠাৎ গেল কোয়েতিভি দ্বীপে।

সাগ্রহে বললাম,—দেখা পেযেছিলে তার? বেঁচে ছিল ত?

—ছিল। টিলার ওপবে উঠে চিৎকাব করতে লাগলাম,—জন্—জন্!

প্রত্যুত্তবে শিলাবৃষ্টি হতে লাগলো পাথরের আডাল থেকে। কোনক্রমে আত্মরক্ষা ক'রে বলে উঠলাম,—জন্—আমি।

হাতে বুমেরাং‌য়ের মতো একটা পাথরেব অস্ত্র, জন্ এসে দাঁড়ালো সামনে, আবির্ভূত হলো বলাই বোধহয় সমীচীন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মুখে দাড়ি, লম্বা চুল—চোখ দুটি জ্বলছে ভাঁটার মতো। একেবারে পুরোপুরি, আফ্রিকার জংলী নিগ্রো। ভয়াবহ—ভীষণ সেই রূপ।

বললাম,—ক্ষমা করো জন্।

'ক্ষমা' শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে এলো। চোখে তার অপরিসীম ঘৃণা। বললাম,—চলো আমার সঙ্গে।

সে উত্তর দিলো না, সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করতে লাগলো আমাকে নীরবে। তবুও বললাম—জন্, তোমার মার্থাকে কী ভুলে গেছো? তাকে কী তোমার চাই না? চলো তার কাছে।

সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো জন্! শুধু মুহূর্তের জন্য চোখের একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম।...

হ্যাঁ বন্ধু, ফিরে আসতে হয়েছিল সেবার একাই। বুঝেছিলাম, মানুষের প্রীতি, ভালবাসা,—সব-কিছুতেই জন্ আস্থা হারিয়েছে। ওকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না!

বহু বছর কেটে গেল আমার সিসেল্সে বা সিচেলাসে। মানুষেব স্বার্থপরতা, অর্থগৃধ্নুতা, হিংসা আর মত্ততা দেখেছি, আর মনে পড়েছে জন্‌কে। ওকে কিছুতেই ভুলতে পারিনি। আমার মনের এই অবস্থাটা তোমরাও বুঝবে। যখন মনুষ্যত্বের দরজায় মাথা কুটে মরবে, প্রতি পদক্ষেপে মানুষ যখন তোমাকে হিংসা কববে, তীব্র মানসিক যাতনায় অস্থির ক'রে তুলে পৈশাচিক আনন্দে হাসির লহর তুলবে, তখন তোমাদেরও মনে পড়বে সভ্যতাদ্বেষী সেই আফ্রিকার নিগ্রো জন্‌কে।

—তুমি আর দেখেছিলে তাকে?

—আব একবার। কোয়েতিভি দ্বীপ। একটা গুহাব কাছে সে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। বহুদিন থেকেই শুয়ে আছে বোধ হয়। মাটি তাকে মায়ের মতো বাহুবেষ্টন ক'রে ধ'রে আছে। একবার ভেবেছিলাম, নিয়ে আসি বুকে ক'রে তুলে তার সেই শুভ্র অবশিষ্টাংশটুকুকে। কিন্তু কেন যেন মনে হলো,—একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য প্রসন্নতার ভঙ্গিতে সে শুয়ে আছে,—তার সে শান্তি ভঙ্গ করার অধিকার আমাদের কারুর নেই।

* * *

ভোর হয়ে গেছে কখন। ঝড় থেমে গেছে। আচ্ছন্নতা থেকে হঠাৎ জেগে উঠে দেখি ব'সে আছি একটা—জীর্ণ কবরের পাশে। গা'টা ছমছম ক'রে উঠলো। কে আমার পাশে ব'সে আমাকে গল্প বললো সারারাত?

পরে জেনেছিলাম—এ' এক নাম-না-জানা পুরোনো নাবিকের কবর।

কিন্তু গল্পটি যেই বলে থাকুক, তার কথামতো সত্যিই অত্যাচারিত নিগ্রোটিকে আজও ভুলতে পারছি না। এই ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা আর স্বার্থপরতর যুগে তাকে ভুলবো, সে অবকাশই বা কই?

সূর্যপুত্র সাবর্ণি

ছটফট করে কাটছে সারারাত, ঘুম আসছে না কিছুতেই। কখন ঘড়ির কাঁটাটা গিয়ে দাঁড়াবে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের ঘরে, সমস্ত তমসা দূর করে কখন উদিত হবেন তিনি! কত বিচিত্র রাতই তো কেটে গেছে এই সতেরো বছর ধরে, কত ভোরই তো হয়েছে। কিন্তু দূর উদয়চক্রে কখন আবির্ভূত হবে জবাকুসুমের মত এক অভিনব জ্যোতির্ময় বিন্দু, তার জন্য সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এভাবে প্রতীক্ষা করা—ঠিক এ অবস্থা আগে কখনও হয় নি প্রণবের।

ডেক্-এ কোয়ার্টার-মাস্টারের পোস্টের কাছে কালো বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা আছে—সূর্যোদয়ের সময়—পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। তার অর্থ হচ্ছে, ঘড়ির ছোট কাঁটাটা ঐ যে তিনটের ঘর ছুঁয়ে আছে, আর বড় কাঁটাটা ফুটোর, ওগুলো সরে সরে যাবে, ছোটটি যাবে পাঁচের ঘর ছাড়িয়ে আর বড়োটি ন-যে। আর সে তখন ঝকঝকে সাদা ইউনিফর্মে থাকবে ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে, হাতে তার বিউগ্‌ল্—সেটা সে বাজানো মাত্রই জাহাজের ফ্ল্যাগস্টাফে উঠে যাবে ত্রিবর্ণ পতাকা, আর যে-যেখানে থাকবে, ক্যাডেট্ থেকে অফিসার, সবাই অ্যাটেন্‌শনে দাঁড়িয়ে একযোগে করবে স্যালিউট। কোয়ার্টার-মাস্টার থেকে ছোট-বড়ো সব অফিসারের হুকুমের অধীনে সর্বক্ষণ থাকতে হয় যে ক্যাডেট্‌কে—সেই ক্যাডেটের হাতের বিউগ্‌ল্-এর নির্দেশ মানবে সবাই, এ কী কম আত্মপ্রসাদ। তাই, 'সানরাইজ-বয়' হবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নেভীর প্রতিটি ছেলের মধ্যেই তীব্র।

কালো বোর্ডটায় কম্যাণ্ডিং অফিসারের নামের নিচেই তার নাম খড়ি দিয়ে লেখা আছে—'সানরাইজ-বয়'—সি তিন হাজার অতো—প্রণব চ্যাটার্জি। বিছানা ছেড়ে আর সব ঘুমন্ত ছেলেদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ধীর পায়ে সেই কালো বোর্ডটার কাছে এসে দাঁড়ালো প্রণব। রাত্রের ডিউটিতে নিযুক্ত সেন্ট্রিটি ওকে দেখামাত্রই এগিয়ে এলো, বললে, কিঁউরে, অভী তক্ সোয়া নেহী?

যথারীতি স্যালিউট জানিয়ে উত্তর দিলো প্রণব, নহী সাব।

—তুমহারা চিঠ্‌ঠি মিলা?

—জী হাঁ।

আজই রাত্রে এসেছে তার চিঠি। তার নেভীর জীবনে বহু প্রতীক্ষিত এই প্রথম চিঠি। কিন্তু বোধ হয়, না এলেই ভালো ছিল।

স্নায়ু-শিথিল ঘুমন্ত শরীরে হৃৎপিণ্ডটা যেমন ধুকধুক করে চলতে চলতে জানিয়ে দেয় দেহটা নিষ্প্রাণ নয়, তেমনি বন্দর-লগ্ন গতি-শিথিল এই ছোট নয়কারী নৌবিভাগীয় জাহাজটিরও মৃদু কম্পন অনুভব করা যায় ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে! ইঞ্জিনরুমের ইঞ্জিনগুলি স্তব্ধ, বড় বয়লার দুটোও নির্বাপিত, শুধু বিদ্যুৎশক্তির প্রবাহকে অব্যাহত রাখবার জন্য ধুকধুক করে চলছে অক্সিলিয়ারী ছোট বয়লারটা।

সেন্ট্রির অনুমতি নিয়ে ডেকের ওপর লঘু পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াতে লাগলো প্রণব। বেস্ থেকে জাহাজের ডিউটিতে আসাও তার জীবনে এই প্রথম। ক্যালেণ্ডারের আজকের তারিখটি সে লাল পেন্সিল নিয়ে ভালো করে দাগ দিয়ে রেখে এসেছে। অনেকগুলি প্রথম ব্যাপার তার জীবনে ঘটলো বা ঘটতে যাচ্ছে আজ! লেফটেনান্ট চ্যাটার্জির ঠিক সরাসরি অধীন হযে কাজ করাও আজ তাব প্রথম। কালো বোর্ডে খড়ি দিয়ে তার নামের ওপরেই বড-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—কম্যাণ্ডিং অফিসার লেফটেনান্ট কে কে চ্যাটার্জি। আর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, জাহাজটির চার্জ নিয়ে তিনি সবে এখানে এসে পৌঁছলেন বোম্বে থেকে এই আজই। না না, রাত বারোটা পার হয়ে গেছে, ইংরাজী নিয়মে আর আজ বলা চলে না, বলতে হবে কাল! কাল বেলা প্রায় দশটা—তিনি এলেন। তারা সব তাঁরই প্রতীক্ষায় ডেকের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে! এক বছর পরে দেখা. তিনি কি চিনতে পারবেন প্রণব চ্যাটার্জিকে?

পারলেন কিন্তু! তার কাছে এসে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসলেন ঠোঁটের কোণে। আর তাই দেখে আনন্দে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন একবার ছলাৎ করে ঢেউ তুলে মিলিয়ে গেল বুকের মধ্যে! কে জানে, এই দীর্ঘ দু বছর নৌবিভাগীয় জীবনে যে সুযোগ সে কখনও পায় নি, সেই সানরাইজ-বয় হবার সৌভাগ্য সে লাভ করলো হয়তো তাঁরই দয়ায়! তা-ও বেস্-এর ডিউটিতে নয়, একেবারে জাহাজের ডিউটিতে! সেই যে সকালবেলা দেখা হয়েছিল, তারপরে দেখা হলো একেবারে রাত্রে, যখন তিনি রাউণ্ডে বেরিয়েছিলেন! কথাও বলেছিলেন! সে আর থাকতে পারে নি, বাঙালী প্রথায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলেছিল একেবারে। রাগ করেন নি, স্নেহমণ্ডিত সেই হাসিই ফুটে উঠেছিল মুখে, বলেছিলেন—এক বছর পরে দেখা। ভালো আছো প্রণব?

তারপরে বলেছিলেন, একটা চিঠি এসেছে তোমার। খামে। পেয়েছো তো?

—পেয়েছি স্যর।

একটু থেমে আরও একটু হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কার চিঠি?

—মায়ের।

একটু থেমে তারপরে আরও প্রশ্ন করলেন, তাহলে পাও মায়ের চিঠি ?

—এই প্রথম পেলাম স্যর।

—ও।

বলেই আর দাঁড়ালেন না, যেমন রাউণ্ডে ঘুরছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। তার সঙ্গে যে বিশেষভাবে কথা বললেন তা নয়, প্রত্যেকের সঙ্গেই এমনিভাবে কথা বললেন তিনি। কিন্তু তবু তিনি চলে যেতেই, ছেলেরা এসে ঘিরে ফেললো তাকে। জাহাজে যে-তিন-চারটি বাঙালী ছেলে ছিল, তাদের মধ্যে সমর দাস একজন। বললে—এই, চ্যাটার্জি-সাব তোকে চিনতো নাকি আগে থেকে ?

—হ্যাঁ। উনি যে এই বেস্-এ ছিলেন বছরখানেক আগে।

—তুই তো এই বেস্-এর। বল না ভাই, কেমন লোক উনি ?

—ভালো। খুব ভালো।

—ঈস!—মল্লিক বলে আরেকটি ছেলে এগিয়ে এলো—তুমি তো চাঁদ ওর অধীনে থাকো নি এর আগে, তাই জানো না। পান থেকে চুনটি পর্যন্ত খসবার উপায় নেই। কাজের একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কী, তো, ব্যস্।

সমসের বললে, এই কাল তুমি সানরাইজ-এ হচ্ছো, বিউগ্‌ল্-এর সুর তুলতে একটু ভুল করে দেখো না, কী হয় একবার।

আরেকজন বললে, ভুল তো দূরের কথা, গলাটা একটু কেঁপে যাক না, একেবারে বেত-মারার হুকুম দিয়ে বসবে হয়তো।

পূবের রেলিং বা বুলওয়ার্ক-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পূর্বদিগন্তের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো প্রণব বহুক্ষণ ধরে। বন্দরের মুখটিতে সমুদ্রের জল লাইট হাউসটা পেরিয়ে ঢুকে এসেছে ভিতরে, তিনটি শাখায় গেছে বিভক্ত হয়ে—তারই একটি শাখার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের জাহাজটা। এখানকার প্রাচীন লোকেরা বলে, এই শাখাটি আসলে পুরনো এক নদীর খাত—মেঘাদ্রি তার নাম। পূর্বঘাট-পর্বতমালার কোনও নিভৃত গুহা থেকে ঝরনার মতো বেরিয়ে এসে বিভিন্ন প্রান্তর, বিভিন্ন জনপদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে অবশেষে মিলেছে এসে সমুদ্রে। সঙ্গমের এই প্রসারতাকে আরও প্রসারিত করে সমুদ্রের লবণাক্ত নীল জল আরও ভিতরে প্রবাহিত হতে দিয়ে, ড্রেজারের সাহায্যে আরও গভীর করে নিয়ে গড়ে উঠেছে এখানে বিস্তৃত এই বন্দর।

দিগন্তে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে শুকতারাটি। এক সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা তা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ছিটকে পড়েছে জলে, জলের ওপর একটা আলোর রেখা টেনে পৌঁছেছে সেই জ্যোতি একেবারে তাদের জাহাজে, প্রায় তাকে এসে ছুঁয়েছে যেন!

আর বেশি দেরি নেই, তাকে প্রস্তুত হতে হবে। স্নান করতে হবে তাকে এখখুনি, ঝকঝকে ধোপদুরস্ত পোশাক পরতে হবে। শুদ্ধাচারে সেই প্রাচীন তপোবনের বিদ্যার্থীর মত সূর্য প্রণাম করতে হবে তাকে যেন। তার উপনয়নের সময় সেই যে মা তাকে তিনখণ্ড উপনিষদ্ উপহার দিয়েছিল—তা তার আজও সঙ্গে আছে—আজও সে পড়ে মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিছুই বোঝে না, তবু ভাল লাগে পড়তে। সংস্কৃত ঠিক মতো পড়তে পারে না, পড়ে বাংলায় ব্যাখ্যা করা অংশগুলি।

আজকের এই যে সূর্যপ্রণাম, এ সেই ছান্দোগ্য উপনিষদের আদিত্য-দৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব নামের উপাসনার মতো যেন। সাত অবয়ব না হোক, তিন অবয়ব তো বটে! "উদয়ের পূর্বে সূর্যের যে রূপ তাহাই হিঙ্কার।" পশুরা সূর্যের এই হিঙ্কার অবয়ব-এর ভজনা করে বলে তারা নাকি সূর্যোদয়ের পূর্বে "হিং" প্রভৃতি শব্দ করে থাকে। কে জানে সত্যিই করে কিনা, শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে সে তো থাকে নি কোনদিন।

"সূর্য প্রথম উদিত হইলে তাঁর যে রূপ হয, তাহাই প্রস্তাব।" এই প্রস্তাব-রূপের ভজনা করে মানুষ, তাই তারা, উপনিষদ বলছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশংসার জন্য লালায়িত। আর আশ্চয, যখন এই রূপ পরিগ্রহ করবেন সূর্যদেব, তখনই বাজবে আজ পাঁচটা পঁযতাল্লিশ, আর তাকে বাজাতে হবে তখখুনি তার ঝকঝকে বিউগ্‌ল্‌টা, পতাকা উঠে যাবে, সবাই করবে প্রণাম একযোগে। সেই উপনিষদের যুগ থেকে আজও পর্যন্ত মানুষ "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশংসার জন্য লালায়িত।"

এর পরের মুহূর্তটাকে বলা হয়েছে "সঙ্গববেলা"। সঙ্গববেলায় "সূর্যরশ্মি ইতস্ততঃ প্রসারিত হয"। সেই সময় তাঁর যে রূপ, তা-ই "আদি"। পাখিরা এই আদিরূপের "ভজনা করে বলিয়াই তাহারা কেবল আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিরাবলম্বভাবে গগনে বিচরণ করে।"

এই অংশটা ভালো করে দাগ দেওয়া আছে প্রণবের বইয়ে। সেই বেস্-এ থাকার সময়ই তার যখন সানরাইজ-বয় হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, অথচ শত চেষ্টাতেও সে সুযোগ সে পায়নি, তার বন্ধুরা একে-একে বেস্-এর সেই উঁচু ফ্লাগ-স্টাফের নিচে দাঁড়িয়ে বিউগ্‌ল্ বাজিয়েছে, আর সে সবার সঙ্গে একসারিতে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানিয়েছে শুধু—সেই তখনি তার একমাত্র 'ঐশ্বর্য' তার মায়ের দেওয়া উপনিষদের পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ সে পেয়ে যায় ছান্দোগ্য-র ঐ পৃষ্ঠাটা—ভাবার্থ না বুঝলেও কথাগুলো ভালো লেগে যায় তার, লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রাখে।

লেফটেনাণ্ট চ্যাটার্জি ছিলেন তখন এই বেস্-এ। তাঁর সঙ্গে অফিসের দিক থেকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, মাঝে মাঝে দু-একবার, ন্যাভিগেশনের ক্লাস নিতে আসতেন শুধু। বোর্ডে এঁকে এঁকে বুঝিয়ে দিতেন কাকে বলে, ধ্রুবতারা, কাকে বলে 'আলফা সেণ্টুরী'। কিন্তু প্রণব ছিল অঙ্কে কাঁচা, তাই এগিয়ে যেতে পারতো না সে। বোটে গিয়ে কোয়ার্টার মাস্টারদের অধীনে 'রোয়িং' শেখা, আর নিয়মিত 'প্যারেড-করা'—এছাড়া কী-ই বা শিখতে পেরেছে সে ভালো করে? 'গানারী'-বিভাগ বা কামান ছোঁড়ার ব্যাপারটা শিখে নিতেই তার সব থেকে বেশি আগ্রহ ছিল, কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষাতেই সে ফেল করলো।

লেঃ চ্যাটার্জির মেস-এ তাঁর ঘরে গিয়ে একেবারে কেঁদেই ফেলেছিল সে, মনে আছে।

বললেন, কী ব্যাপার প্রণব?

সমস্ত বেস-এ এই একটি লোকই ছিল যাকে সে প্রাণ খুলে সব-কিছু বলতে পারতো। সব-শুনে তিনি বললেন, অত বিচলিত হচ্ছো কেন? তোমাকে সিগন্যালিং কোর-এ দিয়েছে, এই তো। সিগন্যালিং-ই বা মন্দ কী, বেশ শেখবার জিনিস।

—কিন্তু 'গানারী'তে যেতে পারলাম না যে!

একটু থেমে, তারপরে একটু হেসে বলে উঠেছিলেন, অত বন্দুক কামান ছোঁড়ারই বা শখ কেন তোমার?

কথাটা শোনামাত্র বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছিল একবার! তার হৃদয়ের স্পন্দনটুকুও কি ইনি চিনে ফেলবেন নাকি? সে মারণাস্ত্র কিছু ছুঁড়ে দিচ্ছে নিজের হাতে, আর তার আঘাতে তার সামনে কোন কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, এ দেখবার একটা পৈশাচিক ক্ষুধা তার মধ্যে পশুর মতো হিংস্র ফুলে ফিরছে, এ সংবাদও কি গোচরে আসবে ওঁর?

নেভীতে এসে ঢুকেছিল বাড়ি থেকে পালিয়ে। না পালিয়ে উপায়ও ছিল না। বুড়োবয়সে তার দিদিমা নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছিল খুব, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তার পক্ষে আর কলকাতায় পড়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বলা চলে।

বড্ড রাগী আর জেদী তার মা, হাতের কাছে পড়ে থাকা সেই বড় লোহার তালাটাই ছুঁড়ে মেরেছিল প্রণবকে।

দরদর করে কপাল কেটে রক্ত পড়ছে, আর তাকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধা দিদিমার সেই চিৎকার—ও রে মেরে ফেললে রে, ছেলেটাকে খেয়ে ফেললে রে রাক্ষুসী!

মা-র কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে নির্বিকার চিত্তে তার সেই রঙিন হাতব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল নিজের বাড়ি। বলেছিল, একটি পয়সাও আর দেবো না, একটি পয়সাও আর খরচ করবো না হতভাগা ছেলেটার জন্য!

কপালে সেই কাটা দাগটা জলজল করছে। চ্যাটার্জি সাহেব একদিন বুঝি জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, তোমার কপালে ও কিসের দাগ, প্রণব?

—ও কিছু নয়, ছোট বেলায় একবার পড়ে গিয়েছিলাম স্যর।

অভিভাবকের সম্মতি ও স্বাক্ষর ছাড়া নেভীতে ঢোকা অসম্ভব। এই চ্যাটার্জি সাহেবের দয়াতেই অজ্ঞাতকুলশীল প্রণবের পক্ষে প্রবেশ লাভ সম্ভব হয়েছিল। সে যখন হতাশ হয়ে রিক্রুটিং অফিস থেকে ফিরে আসছিল, কে একজন বলেছিল, তুমি তো বাঙালী, এখানে একজন বাঙালী অফিসার আছেন—লেফটেনান্ট কে, কে, চ্যাটার্জি—তাঁকে গিয়ে ধরো, হয়েও যেতে পারে।

তা-ই হয়েছিল, বাঙালী বলে বাঙালীর প্রতি ছিল তাঁর টান, তিনি নিজে অভিভাবকের হয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। নিজে নাকি বিপত্নীক, নিঃসন্তানও।

সেকেণ্ড ক্লাসে সবে উঠেছে স্কুলে, এমন সময় হলো তার উপনয়ন। প্রতিবারেই পরীক্ষার ফল ভালো হয় তার, এবারেও হয়েছে। তবু মা এসে ধমক দিতে ছাড়ে নি—অঙ্কেতে কম পেলি কেন রে হতভাগা?

'হতভাগা' ছাড়া তাকে কথাই বলতো না তার মা, তবু অদ্ভুত তার টান ছিল মায়ের ওপর। মনে হতো, মায়ের এই যে তাকে প্রতিপদে হতভাগা বলা, এর মধ্যে মায়ের এক গভীর কান্না লুকিয়ে আছে। তাকে দিদিমার কাছে রেখে মা থাকে অন্য জায়গায়! মা চাকরিও করে যেন কোথায়, মায়ের মুখে পাউডারের ছোঁয়া, হাতে রঙিন হাতব্যাগ, এরও মধ্যে কী এক শোচনীয় দুঃখ যেন লুকিয়ে আছে।

চ্যাটার্জি সাহেবকে তার মায়ের কথা বলতে গিয়ে একদিন সে কেঁদে ফেলেছিল ঝরঝর করে। সবাই পায় মায়ের চিঠি, বাপের চিঠি, দিদির চিঠি, ভাইবোনদের চিঠি, তার আসে না কিছুই। ডাক নিয়ে কোয়ার্টার মাস্টার নিজে বিলি করে, কত প্রত্যাশা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকায় যে কতদিন! কিন্তু না, একটি আঁচড় কেটেও তার কুশল প্রশ্ন করে নি কেউ!

চ্যাটার্জি-সাহেব বোধহয় বুঝতেন তার মনের ব্যথা, বলতেন—তোমাকে কেউ চিঠি লেখে না?

—না।

—তোমার দিদিমা?

—সে লিখতে পারে না।

—তোমার মা তোমার ঠিকানা জানেন তো?

—হ্যাঁ। কত চিঠি দিয়েছি মাকে!

—তবু উত্তর নেই?

—না।

বেস্-এ ছেলেরা তাকে বড্ড খেপাতো। সে চুপচাপ থাকতো তার উপনিষদ্ নিয়ে, ছেলেরা সেটা সহ্য করতে পারতো না। কেউ তার বাবার গল্প করছে, কেউ মায়ের, কেউ দিদির বা ভাইয়ের, কিন্তু তার গল্প শোনবার ধৈর্য ছিল না কারুর! আর কী-ই বা গল্প করবে সে?

একমাত্র চ্যাটার্জি সাহেবই ছিলেন ওখানে তার ভরসাস্থল। মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন তিনি। কেন যেন অদ্ভুত স্নেহ করতেন তিনি ওকে। তাই একদিন আর পারে নি, সমস্ত কিছুই বলে ফেলেছিল তাঁকে।

তার উপনয়নের কিছুদিন পরেই ঘটে ঘটনাটা। প্রথমে যেন শেলের মতো বিঁধেছিল বুকে। কিছুই ভালো লাগতো না, পড়াশুনাও না। ঘুরেঘুরে বেড়াতো কলকাতার পথে পথে, উদ্দেশ্যবিহীন। স্কুলের বন্ধুরা করতো মর্মান্তিক ঠাট্টা। কেউ বলতো, তোর মা থিয়েটার করে, না?

আরেকজন বলতো, তোর নতুন বাবা লোকটা কেমন রে?

বৃশ্চিক যেন দংশন করেছে তার সর্বাঙ্গে। এক-একবার মনে হতো, এবার দিদিমার বাড়িতে মা এলে সে কথা বলবে না। কখনও মনে হতো, মায়ের সেই রঙিন হাতব্যাগটা টান মেরে সে ফেলে দেবে।

কিন্তু মা যখন আসতো দেখা করতে, তখন তার মুখখানার দিকে তাকিয়ে সমস্ত রাগ আর অভিমান কোথায় যেতো হারিয়ে! অদ্ভুত একটা মায়া আর মমতায় অকস্মাৎ ভরে উঠতো সারা মন।

মা-র ক্রোধের কিন্তু সীমা নেই—ইস্কুলে যাস না শুনলাম? কেন?

—আর যাবো না।

—আর যাবি না! কেন?

সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল প্রণব—ওখানে আর পড়বো না।

আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিয়েছিল মা, পড়বি না!

—না। অন্য স্কুলে ভর্তি হবো।

অনেক চেষ্টা করেছিল মা, অনেক বুঝিয়েছিল। সে কিন্তু তার সংকল্পে ছিল অটল! অবশেষে তা-ই হলো, ভর্তি হলো গিয়ে সে অন্য স্কুলে। ট্রান্সফার না নিয়েই। নিলেই নাম জেনে ফেলতো তারা!

নতুন স্কুলে রীতিমত পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশ করতে হলো।

—কী নাম?

মুখে এসে গিয়েছিল তার পুরনো নাম, প্রণব গাঙ্গুলী, কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল সে, প্রণব ঘোষ।

স্কুলের ফল খুব ভালো হলো সেবার। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে ওঠবার প্রাক্কালে আবার ঘটলো বিপর্যয়। আবার বেঁকে বসলো সে। না-না, আর সে পড়বে না। মা তার বই-পত্র বিশেষ ধরতো না, সেবার বই-খাতা-পত্রগুলি উল্টে তার নাম যেখানটায় লেখা থাকতো, সেটা পড়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলো, প্রণব ঘোষ কেন?

উত্তর দেয় নি সে।

মা বলেছিল, তোকে এসব করতে বলে কে? তোর আসল উপাধি গাঙ্গুলী। সেটা ব্যবহার করতে দোষটা কী হলো, শুনি?

কেমন করে এ-কথার উত্তর দেবে প্রণব? মায়ের পরিচিতি যদি হয়ে দাঁড়ায় মিসেস্ ঘোষ, তাহলে পুত্রের পরিচিতি গাঙ্গুলী, সেটা কত প্রশ্নের যে উদ্রেক করবে, মা কি তা বোঝে না? মায়ের সম্মান সে ছোট করবে কী করে?

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকবার পর মা বলে উঠেছিল, তাই বুঝি পুরনো স্কুল বদলানো হলো? ট্রান্সফারও নেওয়া হয়নি, পাছে পুরনো নাম ব্যবহার করতে হয়?

উঠে দাঁড়িয়ে যাবার মুখে মা আরও বলেছিল, এইভাবে বুঝি মায়ের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে! কিন্তু কার কাছে?

বলতে-বলতে চাপা একটা কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মায়ের কণ্ঠ, কিছু আর না বলতে পেরে, দ্রুত নেমে গিয়েছিল সিঁড়ি দিয়ে।

ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছিল সে খুব ভালো পরীক্ষা দিয়ে। কিন্তু আর পড়া হলো না। মায়ের প্রহার-চিহ্ন ললাটে ধারণ করে তাকে ছাড়তে হলো কলকাতা, চলে এলো এখানকার নৌ-বিভাগে।

—কী নাম?

ধীর, অকম্পিত কণ্ঠে এবার উত্তর দিয়েছিল সে—প্রণব চ্যাটার্জি।

সেই চ্যাটার্জি, যাকে নিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে তার মা, তাকে সে দেখেও ছিল সেদিন! কিন্তু নেভীর এই লেফটেনাণ্ট চ্যাট্যার্জির সঙ্গে তার তুলনাই হয় না! এঁর বয়স তাঁর থেকে হয়তো একটু বেশি, কিন্তু স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে, শারীরিক গঠনে, দেহের বর্ণে এঁর সঙ্গে তুলনাই হয় না।

সে নিজেও অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করতো এঁর প্রতি। নৌ-বিভাগীয় সেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতার দিনগুলি আজও মনে পড়ে! অঙ্কে তার বার

বার ভুল হতো, বার বার তিরস্কৃত হতো সে। তবু তার মন বসতো না পড়াশুনায়। বোটিং-এ যখন চলে যেত তারা সমুদ্রের মধ্যে, তখন কী আনন্দে যে ভরে যেত মন! ঢেউ লেগে অতর্কিতে লাফিয়ে উঠতো বোটটা, ছেলের দল আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতো, কিন্তু তার হতো অদ্ভুত উৎকট, এক আনন্দ।

সিগন্যালিং-ও ভালো লাগতো না। দুটি ফ্ল্যাগ দুটি হাতে নিয়ে এ-বি-সি-ডি করে সিগন্যালিং করে যাওয়া—সে-ও যেন ক্লান্তিকর। ভালো লাগতো কামান-ছোঁড়ায় শিক্ষা দানের সময়টা। তার নিজের পক্ষে শেখবার সুবিধা ছিল না, কিন্তু সে দূর থেকে সব নিরীক্ষণ করতো।

চ্যাটার্জি সাহেব ডেকে পাঠাতেন—কী হে প্রণব, কেমন লাগছে?

—ভালই স্তর।

একটু থেমে চ্যাটার্জি বলতেন, বড়ো ভাবপ্রবণ মানুষ তুমি। নৌ-সৈনিক তুমি, অত ভাবপ্রবণ হওয়া কী তোমার মানায়?

সামান্য কথা, কিন্তু তিরস্কারের তীর হয়ে এসে বিঁধে যেতো তার বুকে।

বলতেন, ছোট বেলায় আমিও তোমার মতো ছিলাম। বড় কষ্ট সয়েছি হে, বড় কষ্ট সয়েছি।

তারপরে হঠাৎ একদিন ট্রান্সফার হয়ে চলে গেলেন তিনি বম্বে। দিন যায়, কিন্তু অব্যক্ত একটা হাহাকারে ভরে থাকে মন। কিছুই ভাল লাগে না, কাউকে ভাল লাগে না, সব বিষাদ, সব বিষাদ।

—কেন আপনি চলে গেলেন স্তর!—নিজের মনেই একা একা জলের ধারে বসে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করে প্রণব। কবে আসবেন স্তর? আমার যে আর কেউ নেই! আমার বাবাকে আমি কোনদিন দেখি নি, জানেন স্তর? আমার মা? আমার মাকে যে যাই বলুক—ও কিন্তু বড় ভালো মেয়ে; আমাকে সে কোনদিন থিয়েটার দেখতে দিতো না। একদিন দেখেছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। ওই যেখানটায় কুন্তী এসে দাঁড়িয়েছেন কর্ণের কাছে গঙ্গার ধারে। হ্যাঁ স্তর, আমার মা-ই সেজেছিল কুন্তী। মাকে তখন যদি আপনি দেখতেন! কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুন্দর—সুন্দর—সুন্দর।

—এই চ্যাটার্জি, পাঁচ বাজ গিয়া, যাও, তৈয়ার হো যাও তুরন্ত্।

বুলওয়ার্কের কাছে তন্ময় হয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রণব। পিছন থেকে পেটি-র কণ্ঠস্বর শুনেই চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি চলে গেল ছুটে।

ছেলেরা উঠেছিল কেউ-কেউ—বললে,—গিয়েছিলি কোথায়? চান করে নে শিগ্‌গির।

স্নান সেরে আসতেই আরেকজন বললে, বিউগ্‌ল্ শক্ত হাতে ধরবি! কোনও ভুল যেন না হয়। প্র্যাক্টিস তো বহু করেছিস?

—তা করেছি।

—তবে আর কী। ভুল করে চ্যাটার্জি-সাহেবের চড়-চাপড় খেয়ো না।

প্রণব বললে, মারেন বুঝি?

মল্লিক বললে, ওর সঙ্গে একটা জাহাজে আমি ছিলাম। চড়-চাপড় লেগেই আছে। ভুলের মাত্রা বেশি হলেই বেত মারার হুকুম হয়ে যাবে। পাঁচ থেকে, চাই কী দশ ঘা।

পূর্ব দিগন্তে প্রথমেই একটা অস্ফুট আলোর ছটা দেখা দিলো। একটু হলদে, অল্প লাল। বিউগ্‌ল্ হাতে ঝকঝকে পোশাকে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে প্রণব। আদিত্যের এই বুঝি হিংকার রূপ! দেখতে দেখতে মনে জেগে উঠলো হঠাৎই সেই কর্ণ আর কুন্তীর কথা। কর্ণের মতো তারও যেন বলতে ইচ্ছা করলো, দিবাকর যদি আমার পিতা, তাহলে এ অবস্থা কেন আমার? বলো মাত, হীন সূতপুত্র বলে কেন ঘৃণা করে আমাকে সবাই?

কিসের আবেগে যেন কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল, চোখ দুটি হঠাৎ এলো জলে ভরে। কিন্তু ততক্ষণে ঘণ্টা বেজে গেছে, ততক্ষণে দূর উদয়চক্রে দেখা দিয়েছে তাঁর 'প্রস্তাব'রূপ, যে রূপ দেখলে মানুষ হয় "প্রশংসার জন্য লালায়িত।"—

কেঁপে গেল কণ্ঠ, স্বর ফুটলো না ভালো করে, বিউগ্‌ল্-এ সুর উঠলোই না স্পষ্ট হয়ে।

মল্লিক-সমসের—ওদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কী শাস্তি হয়, কে জানে।

সেন্ট্রি-পোস্টের কাছে বোর্ডের পাশে নীরব হয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে প্রণব বহুক্ষণ ধরে। তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে একে একে সবাই গেল ফিরে, সেন্ট্রিও চলে গেল। ডিউটির হলো পরিবর্তন, এক্ষুনি আসবে নতুন লোক। বোর্ডের লেখা এখুনি যাবে মুছে। ধারে-কাছে কেউ নেই, হঠাৎ ওপরের সিঁড়ি বেয়ে নিজেই নেমে এলেন চ্যাটার্জি। তীক্ষ্ণ, তীব্র কণ্ঠে ডাকলেন, প্রণব?

নমস্কার করলো প্রণব। বললো, স্যর?

—সূর্যপ্রণাম করতে পারলে না তো?

অধোমুখে নীরব রইলো প্রণব। ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালেন

চ্যাটার্জি। বললেন, জীবনে সানরাইজ-বয় হওয়া তোমার এই প্রথম। হেরে গেলে?

প্রণবের তখনও নতমুখ লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হারবার ছেলে তো তুমি নও! কী হয়েছিল তোমার?

বলতে বলতে হঠাৎই তাঁর চোখ পড়লো সেই কালো বোর্ডটার দিকে। তাঁরই নামের নিচে যেখানে লেখা ছিল—সানরাইজ বয়—সি তিন হাজার অভ —প্রণব চ্যাটার্জি, সেখানে চ্যাটার্জি শব্দটা কেটে দিয়ে খড়ি দিয়ে পরিবর্তে কে যেন লিখে রেখেছে, বসু। প্রণব বসু।

কী হলো কে জানে, কম্যাণ্ডিং অফিসার কোনো শাস্তির কথা উচ্চারণ না করে ছেলেটিকে হঠাৎই টেনে নিলেন বুকের মধ্যে, বলে উঠলেন, রাত্রে মায়ের যে চিঠিটা পেয়েছিলে, তাতে এই সংবাদই ছিল কী?

—হ্যাঁ।

———

বিষুবরেখা

গল্পটা যখন শেষ করলো বড়ুয়া, তখন সমস্ত আসরটা এক সুকঠিন নিস্তব্ধতার গাম্ভীর্যে থম্ থম্ করছে। সীম্যানদের জন্য নির্দিষ্ট নৌশিবিরের আড্ডাঘর।. ওঘরে পিংপংয়ের জোর প্রতিযোগিতা চ'লেছে, অন্য ঘরে ক্যারাম আর তাস। আর এঘরে আমরা সান্ধ্য আসর জমিয়েছি পরস্পরের অভিজ্ঞতা-লব্ধ মুখরোচক বিচিত্র কাহিনীর অবতারণা ক'রে। ঝড়-জলের জন্য রেডিওটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, বাইরে ঘন কালো আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে মুহুর্মুহু,—আর আমাদের সরস টিকা টিপ্পনী চলেছে কুৎসিৎ তীক্ষ্ণ হাস্যরোলের ঝড় তুলে।

ছোট্ট একটা নৌবহর চলেছিল শুভেচ্ছা মিশন নিয়ে ভারত মহাসাগরের এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে, ক্রমশঃ দ্বীপপুঞ্জ থেকে সুদূর প্রাচ্যের পথে। মাঝপথে ছোট্ট 'কনভয়'টি বিরাম নিতে এসেছে বিশাখাপত্তনের বন্দরে। দিন কয়েক থাকবে মাত্র। আমরা আপাততঃ নৌশিবিরের নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত আছি, যে'কোনদিন অবশ্য ডাক পড়তে পারে জাহাজে। কিন্তু নিহাল সিং, বড়ুয়া, এরা এখন জাহাজেরই লোক, বড়ুয়া একটা 'জে'-টাইপ গ্রুপের রাইটার অর্থাৎ কেরানী। প্রথম থেকে এসেই এক কোণে ব'সেছে গিয়ে কী একটা পত্রিকা হাতে তুলে নিয়ে। আমাদের উত্তাল হাসির ঢেউ যখন উঠছিল, ওর মুখেও ফুটছিল হাসির রেখা, কিন্তু দেখেই বোঝা যায়, সে শুধু সঙ্গ-রক্ষার ভদ্রতা মাত্র, নিবিড় সংযোগ নয়।

আদি রসাত্মক রসালো 'ফেনিল কাহিনীর রুদ্ধ মুখ বোধ হয় আমিই খুলেছিলাম প্রথম। অবশ্য নিহাল সিং-এর প্ররোচনা আমার এ' প্রগল্‌ভতার মূলে ছিল। প্রগল্‌ভতাই বা বলি কেন? জাহাজে, শিবিরে সর্বত্র কঠিন নিয়মানুবর্তিতার শৃঙ্খলে বাধা ঘড়ির কাঁটায় মাপা আমাদের নৌ-সৈনিকের জীবন, সন্ধ্যার অবসরে নির্দিষ্ট আড্ডাঘরে সমবয়সী সহকর্মী মিলে গল্পে-গল্পে যদি শালীনতার মাত্রা আমরা ছাড়িয়েই যাই, সেটা কি সত্যিই আপনাদের তীব্র কটাক্ষের কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়াবে? আমরা যে'কয়জন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অন্তরঙ্গভাবে এসে জুটেছি নৌবিভাগে, অন্ততঃ আমাদের কথা বলতে পারি, আমরা 'বাপে খেদানো মায়ে-তাড়ানো' গোছের ছেলে। ঘরে-বাইরে স্কুলে সর্বত্র 'কিছু হবে না'—'কিছু হবে না' শুনে একদিন জীবনে প্রায় বীতশ্রদ্ধ হ'য়েই ছুটে এসেছিলাম নাবিক হ'তে। কৈশোর থেকে এসেছি যৌবনের প্রায় মধ্য গগনে,

দেখলাম 'কিছু হবে না'—এটা ঠিক হলো না, কিছু একটা হয়েছে। অন্ততঃ দেশের জন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু কাজ আমরা শিখতে পেরেছি।—লেখাপড়াও যার যতটুকু দরকার, শিখতে হ'য়েছে। কেউ কেউ আবার দরকারের থেকে বেশি লেখাপড়া আজও করে। করে মনের আনন্দে, জ্ঞানের তৃষ্ণায়। শুধু পড়া নয়, দেখাও। ঐ যে নিহাল সিং হো হো ক'রে হাসছে আর টিকা টিপ্পনী কাটছে, এই কিছুদিন হ'লো ফিরেছে বিলেত থেকে নতুন-কেনা একটা ডেস্ট্রয়ার নিয়ে। এ অভিজ্ঞতার দামও কি কম?

হয়ত আমরা সবাই ঘর বাঁধতে পারি নি। প্রতি সন্ধ্যার নিরালা গ্রামের কুটিরে যে বউটি কণ্ঠদেশে আঁচল জড়িয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ রেখে প্রণাম জানায় প্রবাসী স্বামীর কল্যাণ কামনায়,—হয়ত উদগ্র মোহ আমাদের মনে স্বপ্নের তন্তুজাল সৃষ্টি ক'রে আছে কল্পনায় জেগে থাকা ঐ ধরণের কোনো সলাজনম্র গ্রাম্য বউকে ঘিরে,—হয়ত ছায়াসুনিবিড় শান্তির সেই নীড় আমাদের চিরদিনেরই কামনায় বস্ত হ'য়ে থাকবে, সমুদ্রে সমুদ্রে শিবিরে-শিবিরে নিয়মে-নিয়মে নিরত কুচ্‌কাওয়াজ ক'রে ক'রে তার নাগাল জীবনে কোন দিনই পাবো না।

কিন্তু থাক্ সে সব দীর্ঘশ্বাসের কাহিনী, যা' বলতে যাচ্ছিলাম, তাই বলি।

কথায় কথায় মুখার্জীর কথা যে কেমন ক'রে উঠে পড়লো তা' মনে নেই। নৌ-বিভাগের একজন নগণ্য সী-ম্যান, অথচ গল্পের জাল বুনতে গিয়ে দেখা গেল, আমরা অনেকেই সামুদ্রিক জীবনে তার সংগে সাময়িক ভাবে ঘর ক'রেছি। হৈ-হল্লোড়-করা খুব মিশুকে ছেলে, কিন্তু জাহাজে সেন্ট্রির ডিউটি পড়লে তার গাম্ভীর্যের আর সীমা থাকতো না। সেন্ট্রিরূপে তার এই অভাবিত গাম্ভীর্যই কৌতুকের সৃষ্টি করতো সহকর্মী মহলে। নৌ-সৈন্যদলে তার ক্রমবর্দ্ধমান খ্যাতিটা ছিল অবশ্য অন্য কারণে। বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনই যে তার নাম মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। বহু পল্লবিত রোমান্টিক কাহিনীর সে নায়ক। সে যে নৌ-সৈন্যমহলে কতখানি জনপ্রিয়, আজকের ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। আমাদের মধ্যে সে আজ উপস্থিত নেই, অথচ তার কথা উঠে পড়তে দেরি হ'লো না; এবং উঠে যখন পড়লই, তখন তার গল্প সহজেই থামতে চাইল না। নিহাল সিং হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে বললো, মুখার্জীর কথা বলছো? সৎ শ্রী অকাল! সে হচ্ছে আসল বিচ্ছু! মাছ গাঁথতেও যেমন, খেলাতেও তেমন! গেল কোথায় সে?

এমন রসিয়ে মৎস্য-কাহিনী বলতে লাগল সিং, যে হাসির গর্‌রা উঠল চারিদিকে থেকে,—কুৎসিৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ সে হাসি! কে একজন বললো,—মুখার্জী আজকাল জাহাজ ছেড়ে খুব কমই বেরোয় বাইরে।

সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,—শোন তবে মুখার্জীর কথা। তখন আমিও জাহাজে। আফ্রিকার মোম্বাসায় জাহাজ থেমে আছে। সারাদিন টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টির পর আকাশ ধ'রে এলে মুখার্জীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে। তোমরা ত অনেকে জানোই, শহরটা এমন কিছু বড়ো নয়। সহরের ঠিক মাঝখানে যেদিকে বড়ো বড়ো উঁচু উঁচু সব আধুনিক ধরণের বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, এস্‌প্লানেড্‌ না কী যেন নাম অঞ্চলটার, আমরা দুজনে ঘুরে ঘুরে পছন্দমতো একটা কাফে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি। যদিও দেশটা আফ্রিকা, কালো লোকদেরই দেশ, তবু সমস্তটা অঞ্চল জুড়ে কাফেগুলি শুধু সাদা মানুষের জন্য, 'ফর ইয়োরপীয়ান্স ওন্‌লি', কালোদের নাকি সেখানে প্রবেশ নিষেধ। যাই হোক, খুঁজে খুঁজে শেষে একটা গলির মধ্যে কালোদের জন্য নির্দিষ্ট একটা ছোট কাফে আবিষ্কার করা গেল। যে রকম চেয়েছিলাম, তেমন ভীড় ছিল না কাফেতে। ঢুকেই, কোন্‌ দিককার টেবিলে গিয়ে বসা যায়, দাঁড়িয়ে প'ড়ে সেই কথাই ভেবে নিচ্ছি, হঠাৎ দেখি মুখার্জী হন্‌হন্‌ ক'রে এগিয়ে গেল ডানদিককার কোণে। একা একটা টেবিলে ব'সে আছে একটি মেয়ে, একেবারে সোজা তার দিকে।

'মেয়ে' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হেসে উঠল সবাই একযোগে, নিহাল সিং বললে,—দি ডেভিল!

এই-ই ছিল আমাদের গল্পের ধরণ। গল্পের মধ্যে মনোমত রস পেলেই হলো,—হৈ হুল্লোড়ের আর সীমা পরিসীমা থাকতো না! গল্পের খেই কোথায় হারিয়ে যেতো কে জানে! মন্তব্য, হাসির ঢেউ, পিঠ চাপড়ানো,—সে এক কাণ্ডই হ'য়ে ওঠে।

—তারপর ভাই, তারপর?

—তারপর? একটু দম নিয়ে বললাম,—নাবিক হ'য়ে তারপরের কথাটা আর শুনতে চাও কেন?

—তা'হোক, তুই বল্‌না—কে যেন আমায় পিঠ চাপড়ে বলে উঠল। নিহাল সিং বলল, মুখার্জী-শালা এক নম্বরের শয়তান। শেষে আফ্রিকার···

বাধা দিয়ে বললাম,—'তা ব'লে কী জংলী জুলু মেয়ের কথা বলছি? তা'নয়। গাউন-পরা সভ্য-ভব্যই বটে। তবে আফ্রিকায় তুমি ডানাকাটা পরী পাচ্ছ কোথায়?

—বলিহারি তোদের টেষ্ট! —কে যেন ব'লে উঠল।

—খবরদার—ব'লে উঠলাম—আমাকে জড়িও না। এ একেবারে স্রেফ মুখার্জীর গল্প। বলবো কী ভাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভাব ক'রে ফেললো মেয়েটির সঙ্গে। আমাকে বললো, তুই বোস একটু। আমরা আসছি।··

ব'লেই বেরিয়ে গেল মেয়েটিকে নিয়ে।

আবার হাসি, আবার কুৎসিৎ মন্তব্য। একজন বললো,—কী বেপরোয়া ছেলে দেখেছ? আগু পিছু কিছু ভাবে না।

—ভাববে আবার কী! কোনো চুলোয় ওর আছে নাকি কেউ?

—নেই মানে? বউ না হয় নেই, মা-ভাই-বোন্ সব রয়েছে ত ক'লকাতায়।

—বুড়ো বাপ এখনো মাষ্টারী করছে। বড় ভাই চাকরি করে।

—মাষ্টারী নয়,—বড়ুয়ার গম্ভীর কণ্ঠস্বর এতক্ষণে শোনা গেল,—ওর বাপ প্রফেসার। ক'লকাতার এক কলেজে সংস্কৃত পড়ান।

—তুমি কোথা থেকে জানলে, বড়ুয়া?

—জেনেছি।

কে একজন মন্তব্য করল,—শালা তাহ'লে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ!

নিহাল সিং হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললো,—জাহাজে এসে একঘেয়ে জলে-জলে বেড়িয়ে সবাই প্রহ্লাদ হ'য়ে যায় রে ভাই—বিলকুল প্রহ্লাদ হ'য়ে যায়!

বড়ুয়া আমার দিকে তাকালো, বললো, 'মুখার্জীর যে গল্প তুমি বললে, এ কবেকার কথা ভাই?

ভেবে বললাম,—তা' বছর তিনেকের হবে।

বড়ুয়া সোজা হ'য়ে বসলো, বললো,—মুখার্জীর একটা গল্প আমি বলছি শোনো। এই কিছুদিন আগেকার ঘটনা।

আমরা আগ্রহান্বিত হ'য়ে বললাম,—বলো-বলো!...

নিহাল সিং টিপ্পনী কেটে বললো,—এই এতক্ষণে বড়ুয়া-ভাই আমাদের মুডে এলো। নইলে যে-রকম 'শুকদেব গোঁসাই' হ'য়ে এককোণে ব'সেছিলো, বাপস্!

হেসে উঠলাম আমরা সবাই। বড়ুয়া বলতে শুরু করলো—জাহাজ সেদিন বিষুবরেখা পার হ'চ্ছে। বিরাট উৎসব জাহাজে। স্পিরিটগাম, উইগ আর কাঁচি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। মেকআপ নিয়ে সবাই চলে যাচ্ছে মেন ডেক-এ। লেফটেনাণ্ট ভেদী নিজে সেজেছেন বরুণ দেবতা। বরুণদেবতার বিচারসভা ব'সেছে জাহাজে। জনকয়েক মিলে মুখার্জীকে মনোমত বিচিত্র সাজে সাজিয়ে চ্যাংদোলা ক'রে সভায় নিয়ে গেল। যথারীতি বরুণদেবতাকে সেলাম জানিয়ে বললো—মহারাজ। এই বীর পুঙ্গবটি ক'টি সুন্দরীর পাণিপীড়ন ক'রেছেন!

বটে!—বরুণদেবতা জলদ গম্ভীর স্বরে তাঁর নির্দেশ ঘোষণা করলেন,—আচ্ছা, একে বিশ হাজার সুন্দরীর পাণিপীড়ন করতে দেওয়া হোক!

জাহাজের সেই উৎসবের বর্ণনা করতে গিয়ে একটি কথা বললেই বোধ হয়

যথেষ্ট হবে যে—আনন্দের এ' স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির কোনো তুলনা হয় না! যে-যেভাবে পেরেছে, অংশ নিয়েছে এই বিনির্মল আনন্দ-স্রোতে! কঠিন নিয়মানুবর্তিতার এ যেন কয়েক মুহূর্তের অভাবনীয় শৈথিল্য! হাসি-গান আর নৃত্যে সী-ম্যান্‌দের মধ্যে যেন একটা তাণ্ডব জেগে উঠেছিল।

কোথায় কতদূরে কূল ছেড়ে এসে জাহাজ চ'লেছে জল কেটে কেটে গভীর মহাসাগরের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে। যেন গহন অন্ধকারে আমরা মহানন্দের মশাল জ্বালিয়ে কোনক্রমে পা ফেলছি পথ-চিহ্নের রেখা ধ'রে ধ'রে।

কিন্তু বিকাল হ'তে না-হ'তেই সে মশাল যেন হঠাৎ গেল দপ ক'রে নিভে। আকাশের সব থেকে বিপজ্জনক কোণটা গেল ভয়াল কালো মেঘে ছেয়ে, শান্ত সমুদ্রের ধ্যান ভাঙলো যেন মুহূর্তে! রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো ঢেউ, —অফিসার থেকে তুচ্ছ নাবিক,—প্রত্যেকেরই মুখ শুকিয়ে গেল! বিকাল ক্রমশঃ মিলিয়ে আসতে লাগলো সন্ধ্যায়—জাহাজের প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে ঘনিয়ে এলো দুর্দমনীয় ভীতি। প্রতি মুহূর্তেই আমরা আশঙ্কা করতে লাগলাম যে কোনো দৈব-দুর্বিপাক! জাহাজ দুলতে লাগলো দুরন্ত বন্যার বেগের মুখে মোচার খোলার মতো,—জাহাজের সে দুর্দান্ত 'লিষ্টিং' নিদারুণ ভয়াবহ। ডেকের ওপর দাঁড়াতে পারছি না, কাৎ হ'য়ে পড়ে যাচ্ছি। কেবিনের টেবিলে রাখা-বই-খাতাপত্র ছিটকে পড়তে লাগলো, এদিক-ওদিক!

কিন্তু এই বিপুল ঝঞ্ঝার কথা বলার আগে মুখার্জীর কথা বলা দরকার। সারাদিন হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে ওর যা অবস্থা হ'য়েছিল তা অবর্ণনীয়। 'পানীয়ের স্রোতে ভাসা' ব'লে একটা কথা আছে,—সেটা ওকে সেদিন দেখে বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। সী-ম্যানদের গ্যালির একটা কোণে পরিপূর্ণ মাতাল হ'য়ে অসম্বৃত পোষাকে গড়াগড়ি খাচ্ছে,—আর মুখে উঠছে অশ্লীল বাক্যাবলীর বুদ্‌বুদ! বিভিন্ন বন্দরে ওর দ্বারা অনুষ্ঠিত কুকীর্তিগুলি ওর এই অর্ধ-চেতন-মুহূর্তে ওর মুখে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে, সবারই কাছে ও হ'য়ে উঠছে কৌতুকের বস্তু, দেখে দেখে আর বিরক্তির সীমা ছিল না! জাহাজের ও-ই একমাত্র বাঙালী, ওকে নিয়ে জাহাজে নানারকম কানাকানি-হাসাহাসি উঠলেও আমার গায়ে তা' লাগতো না, কারণ্ আমি ত বাঙালী নই—আসামী। কিন্তু সেদিন যখন দু'একজন ওকে পা দিয়ে ঠেলা দিতে দিতে সরিয়ে দিচ্ছিল একপাশে ঘৃণাভরে, আর বলছিল, 'বাঙালী কুত্তা,'—সেদিন আসামী হ'লেও আমার শরীরে-মনে সমানে এসে বিঁধছিল সেই অপমান! যতই 'আসামী' ব'লে নিজেকে প্রচার ক'রে মুখার্জীর কুখ্যাতির ছোঁয়া থেকে বাঁচতে যাই, ততই বেশি ক'রে মনে পড়ে, তফাৎ কোথায় আসামী আর বাঙালীতে? সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোথায় আমরা পৃথক?

জ্বালা ত এইখানেই। ঘর থেকে যারা বাইরে এসেছে, তাদের জ্বালা বোধ হয় সব থেকে বেশি। অভিজ্ঞতা যার না আছে, তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না,—জ্বালাটা সংস্কৃতির জ্বালা। ইয়োরোপীয়দের সামনে বাঙালী অপমানিত হ'লে যেমন পাঞ্জাবী কিম্বা মাদ্রাজী রুখে দাঁড়ায়, তেমনি দূর কোনো প্রদেশবাসীর কাছ থেকে অসম্মান এলে বাঙালীর পাশে এসে দাঁড়ায় বিহারী কিম্বা আসামী। এটা অন্ততঃ আমাদের নৌ-সৈন্যদলে পরীক্ষিত সত্য।

সত্যি কথা বলতে কী, মুখার্জী জাহাজে আমার লজ্জার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে ওর হীন আচরণ লক্ষ্য ক'রে ওর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণেও দ্বিধা করতাম না। কলম্বো পোর্টের কথাই ধরা যাক না। রাত বারোটা প্রায় বাজে,—আমি ডেক্ আর গ্যালি—গ্যালি' আর ডেক্ করছি—মুখার্জীর তখনো শহর বেড়িয়ে ফেরবার নাম নেই। বারোটার ঘণ্টা পড়বার আগের মুহূর্তেও যদি না ফেরে তবে ওর ওপর নির্ঘাৎ নেমে আসবে নৌবিভাগের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার শাস্তি! মনে-মনে যতই অধৈর্য হচ্ছি, ততই রাগ বাড়ছে ওর ওপর। হতচ্ছাড়ার কী কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই!

বারোটার ঠিক আগে জনকয়েক সী-ম্যান মিলে ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এলো জাহাজে, চুপি চুপি ফেলে দিয়ে গেল গ্যালিতে। আকণ্ঠ সুরায় নিমজ্জিত হ'য়ে পথের পাশে পড়ে ছিল, 'এম-পি'-র নজরে আসবার আগেই ওকে তুলে নিয়ে এসেছে সহকর্মীরা। কী করা যায়? কম্যাণ্ডিং অফিসার টের পাবার আগেই ওকে মাথায় জল-টল ঢেলে নেবুর রস-টস খাইয়ে খানিকটা সুস্থ করে তুলবার চেষ্টা করলাম। অফিসারের 'রাউণ্ড' আসন্ন, এর মধ্যে যেন ধরা না পড়ে হতভাগা!

'রাউণ্ড' দিয়ে যথারীতি চ'লে গেলেন অফিসার, বেসামাল মুখার্জীকে কোন রকমে আমরা সামলে রেখেছিলাম অবশ্য। কিন্তু অফিসার চ'লে যেতেই শুরু হলো ওর প্রলাপ। ঘটনাচক্রে ওর পাশের বেডটাই আমার,—সুতরাং নিস্তার নেই ওর হাত থেকে! জড়িত কণ্ঠে আমাকে কয়েকবার ডাকলো, তারপর সাড়া পেয়ে বললো,—হ্যাঁরে, চ'লে গেল?

—কে চ'লে গেল?

—মেয়েটা?

ঘুম-ঘুম দেহ-মন, চটে বললাম,—জাহাজে আবার মেয়ে এলো কে রে রাস্কেল!

—জাহাজ!—যেন অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলো চারদিক, বললো,—জাহাজ নয়, আমি বলছিলাম পোর্টের কথা। কলম্বো।

—হ্যাঁ, কলম্বো। তা' কী?

—মেয়েটিকে আমি বললাম, তোমাকে বিয়ে করবো। মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো শুধু, আমার কথা যেন বিশ্বাসই করতে পারলো না।

মুখার্জী বললো,—কলম্বোর একটি মেয়ে। সীলোনিজ। বেশ মিষ্টি মিষ্টি মেয়েটি রে।

হেসে বললাম—তা তোর হঠাৎ ওরকম বিয়ে-করার সখ হ'লো কেন?

—কী জানি।—মুখার্জী বললো,—বড়ো মায়া হয় ওদের দেখলে। যে-পোর্টেই ওদের ঘরে যাই না কেন,—যাকে আমার ভালো লাগে, অমনি কেমন একটা মায়া জাগে। ভাবি, আহা রে! কী কষ্টেরই না জীবন ওদের! কিন্তু ভাই, যাকেই বিয়ে করতে চেয়েছি, সবাই কৌতুকে হেসেছে,—আমার কথা বিশ্বাস করেনি। কেন এমন হয়?

—কী ক'রে বলবো?

—ঠিক ব'লেছিস,—বললো,—বলা যায় না। কিন্তু মেয়েরা আমাকে দেখে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে আমার মাথায় পোকা আছে। একটা চিরকালের ভবঘুরে বাস করে আমার মধ্যে। অমি একটা ঘূর্ণি।

একটু হেসে বললাম,—মুখার্জী, ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্য ক'লকাতা ঘুরে আয়।

—টিকতে পারিনা ভাই। দু'তিন দিন পরেই ট্রাম-বাসের ছুটোছুটির মধ্যে মনটা হাঁস ফাঁস ক'রে ওঠে। অমনি ছিটকে বেরিয়ে আসি।

—বাড়িতে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করে না?

—করে না!—মুখার্জী বললো,—কিন্তু সত্যি বলছি, ও' বিয়ে-টিয়ে আমার দ্বারা হবে না ভাই। কোথাও বাঁধা পড়তে মন চায় না।

—তবে যে দেশবিদেশের পোর্টে 'প্রপোজ' ক'রে বেড়াস?

হেসে উঠলো মুখার্জী, বললো,—ক্ষণিকের মায়া। কিন্তু মেয়েরা তা বুঝতে পারে। রাজী হয় না। শুধু হাসে, আর, আমার পাগলামী উপভোগ করে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম,—আচ্ছা, মুখার্জী?

—কী?

—পানীয়ের অসক্তি কেন তোর অতো?

হেসে উঠলো, বললো,—কী জানি ভাই, বোধ হয় আনন্দ পাই।

—পাস আনন্দ?

—না। কী জানিস—বাইরে যতই হৈ হুল্লোড় করি, ভিতরে সর্বক্ষণ একটা অশান্তি গুমরে মরে। জীবনে কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না হলো, কিন্তু শান্তি কিছুতেই পাচ্ছি না! আজকাল কী মনে হয় জানিস?

—কী ?

মুখার্জী বললো,—সারা জীবন ধ'রে যা খুঁজে বেড়াচ্ছি অন্ধের মতো, তা' হয়ত একদিন হঠাৎ পেয়ে যাবো !

হেসে বললাম,—কী খুঁজছিস তুই ?

—তা-ও জানি না। আমি জীবনটাকে দেখতে বেরিয়েছিলাম,—নানান দেশে নানান লোক, সবাইকে জানবো, সবাইকে দেখবো। দেখে দেখে আশা আর মিটবে না। কিন্তু ভাই কিছুই দেখা হলো না, চোখের তৃষ্ণা আমার আজও মিটলো না, মনের তৃষ্ণায় যেন জ্ব'লে পুড়ে মরছি।

সব-কথা সেদিন বুঝিনি মুখার্জীর, মদের ঘোরে কত কী আবোল তাবোলই না লোকে বকে ! ধমকে বলেছিলাম,—নে হয়েছে, এবার ঘুমো। রাত দেড়টায়ও বকবকানি থামবার নাম নেই !

—থামার যে যো নেই !—মুখার্জী বললো,—বন্ধ ঘরটার মধ্যে কে যেন সর্বক্ষণই দরজাটা ঠেলছে। সেই ঠেলাই ত আমাকে পাগলা কুকুরের মতো ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ভাই !

মনে আছে, রীতিমত গালাগালি দিয়েই ওকে থামিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন, কিন্তু যাযাবরী নাবিকজীবনের সুপ্ত বীণার তারে ও যে চিন্তার ঝংকার সেদিন বাজিয়ে তুলেছিল,—সে কী সহজেই থেমে যাবার ? নিজের অশান্ত মনটাকে দিয়েই আজ বুঝি, মুখার্জীদের কী অত সহজেই চেনা যায় রে ভাই ?

সেই প্রবল সাইক্লোনের মধ্যে দেহে লাইফ বেল্ট-টা বাঁধতে বাঁধতে প্রথম যে কথাটা মনে জেগেছিল, সেটা হচ্ছে মুখার্জীর কথা। কিন্তু অ্যালিওয়ে দিয়ে হেঁটে যাওয়াই এমন কঠিন যে কারুর খোঁজ করতে পারাটাও দুঃসাধ্য। লেফটেনাণ্ট ভেদী পছন্দ করতো আমাকে, ছুটোছুটি করতে করতে একসময় আমাকে কাছে পেয়ে লিষ্টের একটা কপি আমার হাতে দিয়ে বললো,—রাইটার, কে কোথায় ডিউটিতে আছে, ভালো ক'রে সবাইকে 'চেক-আপ' করো ত আমার হ'য়ে। উইল ইউ ?

পায়ে পা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে বললাম,—ইয়েস স্যর।

প্রথমেই বন্ধ লোহার দরজাটা জোরে ঠেলে লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম ইঞ্জিনরুমে আর ষ্টোক হোল্ডে। স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার-অফিসার নিজে দাঁড়িয়ে সব কিছু তদারক করছেন।

—হোয়াটস আপ ?

যথারীতি সেলাম জানিয়ে বললাম,—চেক্ আপ্ অব্ দি ক্রু স্যর্ !

—অল রাইট্ !

ইঞ্জিন বিভাগের সমস্ত ক্রু'ই আজ জড়ো হয়েছে এখানে। বিপদের সময় 'ডিউটি'—'অফ্ ডিউটি' নেই,—একজনের যায়গায় দরকার বুঝে চারজন পর্যন্ত অক্সিলিয়ারী। সবারই চলাফেরায় ত্রস্ততা, সবারই কাজের মধ্য দিয়ে একটি মাত্র বাণী উচ্চারিত হ'চ্ছে, সেটি হচ্ছে 'প্রতিরোধ'! সমস্ত শক্তি একত্রিত, পুঞ্জীভূত, ক'রে প্রতিরোধ করতেই হবে এই আকস্মিক সমুদ্র-ঝড়ের!

ইঞ্জিনরুমের লৌহ-পাটাতন তুলে ফেলে ট্যাঙ্কের মুখগুলি ভালো ক'রে পরীক্ষা করছে কেউ কেউ,—ভালো ক'রে বল্টু এঁটে সিমেন্ট জমিয়ে সিকিওর করে রাখছে ট্যাঙ্কের ম্যানহোল্‌ডোরগুলি। যদি চোরা আঘাত কোনক্রমে লাগে জাহাজের তলদেশে, তখন ডবল বটম্ ট্যাঙ্কের এই দ্বিতীয় বটম্ বা তলদেশ রক্ষা করবে জাহাজকে নিমজ্জনের হাত থেকে। শব্দবাহী ফাঁপা নলের মাউথ পীসে মুখ রেখে ওপরের হেল্‌মস্‌ম্যানের সঙ্গে সংযোগ রাখছেন সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। থার্ড রয়েছেন ষ্টোকহোল্‌ডে তৈল চালিত 'ওয়াটার টিউবড' বয়লারের চার্জে—তার সঙ্গে খেটে খেটে হয়রান হ'চ্ছে ষ্টোক্-হোল্‌ডের খালাসীরা! প্রপেলারের গতি বাড়ছে ক্রমশই, ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার ফোনে কথা বলছে কমাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে। 'সাফট'এর কণ্ট্রোলে 'অ্যাহেড অ্যাস্‌টার্ণ-এর সামনের কাঁটাটা কাঁপতে স'রে যাচ্ছে অ্যাহেড এর দিকে। অ্যাহেড, অর্থাৎ এগিয়ে যাও! গুম গুম একটা গম্ভীর শব্দ হচ্ছে ইঞ্জিনরুমে,—কমাণ্ডিং অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসারের ফোন্-বিনিময়ের ফলস্বরূপ ইঞ্জিন চলতে লাগলো ফুলস্পীডে। যত জোরে চলতে পারে জাহাজ, তত জোরেই সে ছুটে চ'লেছে ঝড়ের ঠিক বিরুদ্ধ গতিপথে মুখ ক'রে। ইঞ্জিনরুমে প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু তবু যদি কোনো দুর্বিপাক ঘটে—যদি ওপর থেকে প্রবল বেগে জলস্রোত নেমে আসে ইঞ্জিনের দিকে,—এই প্রাণীগুলির সম্ভবত ছিটকে বেরুবার কেনো পথই থাকবে না! পিঞ্জরাবদ্ধ অসহায় পশুর মতো ছট ফট করবে এরা কয়েক মুহূর্ত,—তারপরই শান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু ওপরের জলস্রোতের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করছে,—এবার আমার দেখা দরকার তাদের! তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসে অ্যালিতে দাঁড়িয়েছি,—দেখি বাইরের ডেক থেকে আগাগোড়া ভিজে ক্লান্ত দেহে লোহার দরজা ঠেলে প্রবেশ করছেন লেফটেনাণ্ট ভেদী স্বয়ং, আর সংগে কিছু সী-ম্যান্। জনকয়েকে মিলে দরজাটা বন্ধ ক'রে এগিয়ে আসতেই আমি সেলাম ক'রে জানালাম ইঞ্জিনরুমের কথা।

ও-কে!—কোনক্রমে কথাটা ব'লে উনি ওপরে উঠে গেলেন সম্ভবতঃ কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে বাইরের অবস্থা ওঁকে জানাতে। সী-ম্যানরা যে-যার কাজে

ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। গ্যালি আর কেবিনের গোল-গোল জানালাগুলি ভালো ক'রে বল্ট্ এঁটে দেওয়া সত্ত্বেও জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে কোনো কোনো যায়গা থেকে! ওরা সেই সব যায়গায় যথোপযুক্ত 'লাইনিং' দেওয়াতে ব্যস্ত র'য়েছে, মুখ ফিরিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলারও সময় নেই। আমি মুখ চিনে-চিনে নীরবেই শেষ পর্যন্ত 'চেক আপের' কাজ ক'রে চললাম। মুহুর্মুহু চেক-আপ। ডেক ডিপার্ট-মেণ্টের কাজ হ'য়ে গেলে আবার যাবো 'ইঞ্জিন' বিভাগে। চেক-আপ্ অব্ দি পারসোনেল-এর এই-ই নিয়ম। ঘন ঘন জন-গণনা না করলে কার কী দুর্ঘটনা ঘটলো,—ডেকের ওপর প্রবহমান ঢেউয়ে কেউ ভেসে গেল কিনা, এসব তৎক্ষণাৎই ধরা পড়বে না।

ওপরে গেলাম হুইল হাউসে। একজন অফিসার নিজে হেলমসম্যানদের নিয়ে ব্যস্ত। অন্য সময়ে ডিউটিতে থাকে মাত্র একজন হেলমসম্যান। ওপরে কমাণ্ডিং অফিসারের ব্রীজ থেকে নেমে-আসা ফাঁপা শব্দবাহী নলটার মাউথ পীসে মুখ রেখে অফিসারের কম্যাণ্ডের উত্তর দেয়, আর নির্দেশ মতো হুইল চালায়। হুইলের আবর্তন হিসাবে নিচে ইঞ্জিনরুমে হালের সাফটা নড়ে যায়।—সাফটের আবর্তনে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরে জাহাজের হাল, হাল অনুসারে তার গতি-মুখ পরিবর্তিত করে সমগ্র জাহাজটা।

আজ এই হাল-বিবর্তন হাতে নিয়েছেন একজন অফিসার। দুজন হেলমসম্যান দু'দিক থেকে হুইলটা ধ'রে আছে, পিছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কয়েকজন নাবিক, এরা শ্রান্ত হলে ওরা হাত দেবে। আজ জাহাজের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশই হচ্ছে এই হুইল। সামান্য ভুলত্রুটিতে বিপুল বিপর্যয় ঘটতে পারে। জলের গতিপথকে ঠিক বিরুদ্ধে রেখে তীরের মতো জল কেটে বেরিয়ে যেতে হবে জাহাজকে, নইলে প্রচণ্ড ঢেউয়ের বেয়াড়া আঘাত থেকে জাহাজকে বাঁচানো অসম্ভব, ফলে জাহাজডুবি হয়ে যেতে পারে অতি সহজেই।

হুইলের অফিসারকে সেলাম জানিয়ে গেলাম রেডিওর ঘরে। কানে হেডফোন লাগিয়ে জন দুই নাবিককে সহকারী ক'রে ভয়ানক ব্যস্ত আজ রেডিও অপারেটর। সমগ্র নৌবহরের 'ফ্ল্যাগসীপ' থেকে সুপ্রীম কমাণ্ডের নির্দেশ গ্রহণ করছে সে, আর সঙ্গে সঙ্গে মেসেঞ্জার দিয়ে 'মেসেজ-স্লিপ' পাঠিয়ে দিচ্ছে ব্রীজ-এ, কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে। কমাণ্ডিং অফিসারের বক্তব্য আবার অনুরূপ-ভাবেই বেতারের মাধ্যমে নিবেদিত হচ্ছে সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কাছে। ক্যারামের ঘুটির মতো রেডিওর ঘর আর ব্রীজের মধ্যে ক্রমাগত ছুটাছুটি করছে মেসেঞ্জাররা। এ ত গেল আমাদের জাহাজের খবর। 'ফ্ল্যাগ সীপ' অর্থাৎ যে জাহাজটা আমাদের মধ্যে থেকে সমগ্র 'বহর'কে পরিচালিত করছে, সেখানে ছুটোছুটি এবং ব্যস্ততার মাত্রা নিশ্চয়ই বেশি।

সুপ্রীম কম্যাণ্ড হয়ত আবার যোগাযোগ করছেন দিল্লী অথবা বোম্বের সঙ্গে। এ এ'ক অপূর্ব-প্রতিরোধের কাহিনী।

ব্রীজে উঠে দেখি কম্যাণ্ডিং অফিসার ঢেউয়ের জলের ছাঁটে রীতিমত ভিজে গেছেন, তবু ব্রীজের এদিক থেকে ওদিকে তাঁর ছুটোছুটির বিরাম নেই। লেফটেনাণ্ট ভেদীও এখন ব্রীজে। শুধু বেতার নয়, আলোর সংকেত ফেলেও সিগন্যালাররা সংযোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করছে বহরের অন্য জাহাজ অথবা ফ্ল্যাগসীপের সংগে, যেটা যখন এ জাহাজের সব থেকে নিকটবর্তী হচ্ছে। সিগন্যালিং পোষ্টে বিপদসূচক দুটো লাল আলো জ্বলছে মাথার ওপরে, সারা আকাশ কালোয় কালো, সমুদ্রের দিকে তাকালে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে ওঠে নিদারুণ ভয়ে! ঢেউয়ের তালে তালে জাহাজটা উঠছে-নামছে, শির্‌শির্‌ ক'রে উঠছে পায়ের নিচটা, ছোটবেলায়-চড়া নাগর-দোলার অভিজ্ঞতা মুহূর্তের জন্য দোলা দিয়ে যাচ্ছে মনে! শুনলাম, সমুদ্রের ভয়াবহ রূপ দেখে একজন সেন্ট্রি মুচ্ছিত হয়ে পড়েছে।

সেন্ট্রির কথা মনে হ'তেই চকিতে স্মরণে এলো মুখার্জির কথা। এতক্ষণের 'চেক-আপে' একবারও ত নজরে পড়েনি মুখার্জিকে! তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। আবার নতুন করে শুরু করলাম 'চেকআপ।' এগিয়ে গেলাম ফার্ষ্ট-এডের কেবিনের দিকে। 'এস-বি-এ' ট্যাণ্ডন যাকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই মূর্ছিত সী-ম্যানটি অন্যলোক, আমাদের মুখার্জি নয়।

একটি মেসেঞ্জার নিচের ইঞ্জিন রুম থেকে একটা মেসেজস্লিপ নিয়ে ওপরে উঠে আসতে আসতে অ্যালির মুখে দাঁড়িয়ে একজন ব্যস্ত সমস্ত সী-ম্যানের সঙ্গে কী যেন কথা বলেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওপরে। ওদের এই এক মুহূর্তের আলাপের একটি মাত্র শব্দ আমার কানে এলো, নৌ-সৈনিকদের কাছে সেই ইংরেজি শব্দটা মোটামুটি পরিচিত। শব্দটা হচ্ছে Equinox যার ভারতীয় পরিভাষা আমাদের শেখানো হ'য়েছে "বিষুব"। 'বিষুব' নির্দেশ করে এমন একটা সময়, যখন সূর্য বিষুব রেখা পার হ'য়ে যায়, এবং সে সময়টা দিন আর রাত্রি হ'য়ে যায় ঠিক সমান সমান। হয়তো 'Equinox' বা বিষুব নিয়ে একটা 'সময়' এর হিসাব করতে চান কমাণ্ডিং অফিসার, কে জানে। কী জন্য এই 'বিষুব' কাল তাঁর দরকার হয়ে পড়লো তিনিই জানেন, হয়ত স্মারক লিপি হিসাবে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা দরকার। জাহাজ ডুবুক আর বাঁচুক, নিয়মের দিক থেকে কোনো ত্রুটি হ'লে চলবে না; হয়ত 'দিল্লী' বা 'বোম্বে' চেয়ে পাঠিয়েছে, এও হ'তে পারে। ধরা প'ড়েছে সে নির্দেশ জাহাজের বেতার-যন্ত্রে।

কিন্তু 'বিষুব' কথাটা আমার মনটাকে নাড়া দিলো অদ্ভুতভাবে। আজকে

সকালেই মুখার্জীর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ব্যাপারটা ও বোঝেনি ভালো রকম। প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেবার পর ও' বলেছিল,—বেশ কথা, দিন আর রাত্রি সমান। আমাদেরও কি এমন একটা মুহূর্ত আসতে পারে জীবনে, যখন আমাদের কাছে দিবা-রাত্রি সমান, বাস্তব আর স্বপ্ন এক হ'য়ে যাবে। জীবনভোর সমস্ত খোঁজা-খুঁজির পালা শেষ ক'রে ঘটে গেছে আমাদের জীবনে চরম প্রাপ্তি! অবাক হ'য়ে চেয়েছিলাম ওর দিকে, আমি ওকে ভূগোলের তত্ত্বই বোঝাতে পারি, কিন্তু এ'অনুভূতির রাজ্য যে আমার সম্পূর্ণ অজানা!

একটি মেসেঞ্জার আমাকে খুঁজে বার করলো ইঞ্জিন রুমে। আমি তখন মনে-মনে মুখার্জীকেই খুঁজছি। ইঞ্জিন রুমে ওকে পাবো কেমন ক'রে? তবু ইঞ্জিনের খালাসীদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বোধহয় মুখার্জীকেই খুঁজছিলাম। ডিউটি-লিষ্টে ওর নাম ছিল না। 'অফ ডিউটি'র লিষ্টে ছিল ওর নাম। আমারই হাতের লেখা। লেফ্‌টেনাণ্ট ভেদী শুধু নামের পাশে পাশে খুব সংক্ষিপ্তভাবে কাকে কী ডিউটিতে রাখা হ'লো, তার উল্লেখ ক'রে গেছেন। মুখার্জীর নামের পাশে অন্য অনেকের মতো 'আর' লেখা, অর্থাৎ 'রিজার্ভড' বা 'সংরক্ষিত': যে কোনো কাজের জন্য যখন-তখন ডাক পড়তে পারে, অবশ্য ডেক-ডিপার্টমেণ্টের কাজে।

মেসেঞ্জার জানালো, ডাকছে লেফটেনাণ্ট সাহেব।

ছুটে গেলাম ব্রীজে। ভেদী বললে, একটা নতুন ডিউটিলিষ্ট তৈরি করো রাইটার, এখুনি। এই নাও আমার হাতের আসল লিষ্ট্‌টা। সব নোট ক'রে দিয়েছি। মেসেঞ্জারকে দিয়ে এখ্‌খুনি পাঠিয়ে দাও, কুইক্।

যথারীতি সেলাম জানিয়ে নিজের অফিসে এসে কাজে লাগলাম। লিষ্ট তৈরি করতে করতে লক্ষ্য করলাম অদল-বদলটা। 'মূর্চ্ছিত সেন্ট্রি'র বদলে 'সেন্ট্রি'র ডিউটি প'ড়েছে আমাদের মুখার্জীর। যাক্ এতক্ষণে হদিস্ পাওয়া গেল মুখার্জীর।

'লিষ্ট্'টা মেসেঞ্জারের হাতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আবার 'চেক-আপের' কাজে লাগলাম। প্রথমেই খুঁজে বার করতে গেলাম মুখার্জীকে। 'গ্যালি' খুঁজলাম, খুজলাম 'অ্যালি'পথ। কিন্তু কোথায় মুখার্জী? সেন্ট্রি পোষ্টে বন্দুক শক্ত ক'রে রাধা, কিন্তু 'সেন্ট্রি' নেই। তবে কী অফিসার ওকে বাইরে 'ডেকে' পাঠিয়েছেন বাইরের সব-কিছুর ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্য? কথাটা মনে হতেই প্রচণ্ড ভীতির একটা শীতল শিহরণ খেলে গেল সারা দেহে, সমুদ্রের ভয়াল মূর্ত্তি দেখে মূর্চ্ছা যায় যেখানে লোক, সেখানে কেমন ক'রে ও' গিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছে বাইরে? 'ডেকে' অবস্থিতির কথা ত ভাবাই যায় না—সেখানে প্রবল বেগে ভেঙে পড়ছে ঢেউ, এদিকের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ অন্যদিক দিয়ে ব'য়ে চ'লেছে! সেই স্রোতের মুখে পড়লে তৃণের মতো ভেসে যাবার সম্ভাবনা। আর যদি দেহের ওপর ভেঙে

পড়ে ঢেউ, স্ত, দেহের অস্থি যাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে !···কী আর হবে জাহাজে ? প্রতিরোধ সংগ্রাম চল্‌বে সমানেই, শুধু ডিউটি-লিষ্টে মুখার্জীর নামের ওপর পড়বে একটা লম্বা লাল কালির সমান্তরাল ঋজু রেখা !

প্রাণপণে লোহার দরজাটা ঠেলে কব্জা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে বাইরে এলাম প্রাণেরই তাগিদে। হতভাগাটা আমার লজ্জার কারণ হ'য়েছিল, এবার কি আশঙ্কার কারণ হ'য়ে দাঁড়ালো ? চেঁচিয়ে ডাকলাম,—মু-খা-র্জী।

সমুদ্রের দুরন্ত গর্জনের কাছে আমার সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আর কতটুকু শব্দের তরঙ্গ বিস্তার করতে পারবে ! কোনক্রমে মিড সীপের গা-লাগানো খাঁজটা ধ'রে ধ'রে এগিয়ে যেতে লাগলাম সামনের 'ডেক'-এর দিকে। সমুদ্রের দিকে তাকানো যায় না। প্রচণ্ড ঢেউয়ের তালে তালে উঠ্‌ছে-নামছে জাহাজটা, নাগর দোলা ক'রে ওপর থেকে নিচে নামার সেই শিহরণ যেন দ্বিগুণিত হ'য়ে স্নায়ুতে স্নায়ুতে কাঁপছে ! আর, পাহাড়ের মতো বিরাট বিরাট ঢেউগুলি দৈত্যের মতো জাহাজটাকে একবার মাথার ওপরে ওঠাচ্ছে, একবার নামাচ্ছে। ঠিক রেলিংয়ের পাশেই। হাতির গায়ের রঙ-এর মতো রঙ,—সেই উন্মত্ত ঢেউগুলো আক্রোশে ফুঁস্‌ছে ! মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—আর, আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে সমুদ্রের সেই রুদ্র রূপ ! দেখে দেখে ঠিক অজ্ঞান হ'য়ে না পড়লেও দাঁতে দাঁত লেগে কাঁপতে লাগলাম সাংঘাতিক রকম। একবার বিদ্যুতের আলোয় মনে হ'লো, ঠিক সামনেই ডেকের দিকে বাইরের রেলিং ধ'রে প্রস্তরের মতো দাঁড়িয়ে আছে মুখার্জী ! আমি দুর্দমনীয় ভীতির আশ্লেষে যেতেও-পারছি-না-এগোতেও পারছি-না, একভাবে এক যায়গাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্‌-ঠক্‌ ক'রে কাঁপছি ! মুখার্জীকে ডাকবো, এমন স্বরটুকুও ফুটছে না কণ্ঠে ! অবশেষে যেন আধা-মূর্চ্ছিত-আধা-চেতনা-গ্রস্ত মুহ্যমান অবস্থায় একরকম ঝাঁপিয়েই গিয়ে পড়লাম মুখার্জীর ওপরে ! ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের সামনে একটা বিশাল পাহাড়ের মতো ঢেউ জেগে উঠেছে ; ঢেউয়ের সেই রূপ আমি বর্ণনা করতে অক্ষম ! বিরাট কালো ঢেউ, অনেকটা যেন ত্রিকোণাকৃতি, আমাদের দৃষ্টিকে রুদ্ধ ক'রে একেবারে সামনেই যেন দাঁড়িয়ে ! অন্ধকার কালো রাত্রির বুকে-জাগা এই সুবিশাল কালো ঢেউ, মনে হলো ঢেউয়ের ঠিক মধ্যে একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধ আলো ! সে আমার মুহূর্তের দেখা, কিন্তু আজও ভুলিনি সেই তরঙ্গ-সম্রাটের মহিমময় রূপ ! আমার শরীরের আকস্মিক ধাক্কা পেয়ে যেন হঠাৎ চেতনা ফিরে এলো সমাহিত মুখার্জীর দেহে, অবাক্‌ হ'য়ে তার আবেগ-মথিত কণ্ঠস্বর শুনতে লাগলাম। চোখে-মুখে তার অদ্ভুত এক আলোর প্রতিফলন, চোখের কোণে তার অশ্রুর কণা, মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে বলে চলেছে—হে দেব, তোমার দেহে দেবতাবৃন্দ, প্রাণীসংঘ, ঋষি ও সর্পকুল, এবং সেই দেবাদির ঈশ্বর কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখতে পাচ্ছি ! পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে······

বড়ুয়া চুপ করলো। কক্ষে সূচীপতনের শব্দও বোধহয় শোনা যাবে।